গৃহস্থবধূর ডায়েরী

বাসবদত্তা

ভারতী বুকস্টল
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

গৃহস্থ বধুর ডায়েরী

জানুয়ারী ১৯৬০

উৎসর্গ

ভাবীকালের বধূদের উদ্দেশে

সাত টাকা

ভারতী বুকস্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅশোক
কুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও রূপলেখা প্রেস, ২৮এ কালীদাস সিংহ
লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত ।

আর পারা যায় না, এ ভাবে আর বেঁচে থাকতে পারা যায় না। নিত্যি নতুন ঝামেলা আর কত সামলাবো? অবিশ্যি আমার এই নাকে-কান্না শোনবার মতো অবসর কারই বা আছে! কিন্তু, ভগবান তুমিও কি শুনবে না? তোমাকেই শোনাতে চাই—নালিশটা যে তোমারই কাছে—আর সে নালিশের আসামী, হ্যাঁ তুমিই আসামী ভগবান। কেন আমার সব আনন্দ, সব সুখ একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছ বলো ত! আমি ত তোমার কোনো ক্ষতি করি নি, তোমার ওপর বিশ্বাস রেখে চলেছি এখনো—তবে কেন এ আক্রোশ? দোহাই তোমার, একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শোনো—তারপর ইচ্ছামতো তোমার অনন্ত মহিমার দামী বিশেষণগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে নিখিল বিশ্বে ছোটাছুটি কর।

কি বললে? তোমার সময় হবে না, এত ছোট ব্যাপারে মাথা ঘামাবার! কিন্তু ও কথা বললে ত চলবে না—তোমাকে শুনতেই হবে। তুমি ছাড়া আর কে শুনবে বলো? আমার স্বামী! সে বেচারীর ওপর আর অত্যাচার করতে ইচ্ছে হয় না। আসলে ওঁরই জন্যে তোমার কাছে দরবার করতে চাই।

জানো ভগবান, উনি সরকারী চাকরি করেন। মানুষ হিসেবে বেচারা নেহাত মন্দ ছিলেন না, আমাকে ভালোও বাসতেন। এখনো বাসেন—কিন্তু—। না, থাক, সে-সব কথা আজ নয়, কেননা আজ ওঁর জন্যেই ডাকছি ভগবান—ওঁর ক্ষতি হয় এমন কথা তোমার

কানে না তোলাই ভালো। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—শোনো ভগবান, আমার স্বামীকে তুমি চেনো। সেই যে-বার দেশ কেটে দু-ভাগ করা হলো, সেই বছর যিনি আমার বাবার কন্যাদায় উদ্ধার করেছিলেন। তুমি ত সাক্ষী ছিলে সে বিয়েতে!

তবু চিনতে পারছো না? কি বললে? সব কেরানীই দেখতে এক রকম! ছিঃ, এভাবে হেনস্থা কর না—মনে বড় লাগে। তুমি দয়াময়, তোমার কাছে এ রকম ব্যবহার আশা করি নি। আমার স্বামী ক্ষুদে কেরানী নয়—অফিসার। আর দেখতে শুনতেও এককালে সুন্দর না-হোক স্বাস্থ্যবান ছিলেন। এখন অবশ্য সংসারের চাপে একটু টস্‌কে গেছেন। তা হোক! তবু ওঁর পাশে, আমাকে এখন মানায় না। চারটে ছেলেমেয়ের ধকলে দেহের সেই বাঁধুনী কি আর থাকে? আগে আমি সত্যিই দেখতে ভালো ছিলাম। বিশ্বাস না করো, ছাখো না ওই ত দেওয়ালে আমার ছবি টাঙানো রয়েছে।

ক্ষমা চাইছি, ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি ত্রিকালজ্ঞ, সব জানো তুমি। ইস্ আমার কি মরণ ছাখো—তোমার কাছে রূপের বড়াই করতে গিয়ে আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছি। ওঁর জন্মে তোমার কাছে আর্জি। কিন্তু কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা বলি! মাইনে বাড়াবার কথা ত হামেশাই বলি—তা সে কথা কানে তোলো বলে মনে হচ্ছে না। অফিসার! অফিসারের স্ত্রী আমি—ওঃ, এ কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। চারদিক থেকে দেহি-দেহি। ওদিকে ননদের নিত্যি অভাব, ইদিকে আবার আমার বড়দির দিন চলে না। আমার নিজেরই বা কি এমন সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা! দুই মেয়ে পড়ে কমলাবালা বালিকা বিদ্যালয়ে, আর ছেলে দুটো অবিশ্যি পাড়ার পাঠশালাতেই আছে। ওদের মিশনারীস্কুলে দিলে মানুষ হত, কিন্তু কি করে দিই বলো! বাড়িভাড়া লাগে একশ টাকা। কোয়ার্টার কপালে নেই—বদলির চাকরি ত!

মাইনে বাড়ানোর কথা কতোবার বলেছি, তা ত সেদিকে তোমার

গরজ নেই। আশা হয়েছিল যে, একটা কিছু হবে বুঝি! তা তোমার ওই পে কমিশন ত সেদিক দিয়েই হাঁটল না—উল্টে ছুটি-ছাটা ছেঁটে দিল। শনিবারের আরামটুকুও পোড়ারমুখোদের সহ্য হলো না। কি রকম আক্কেল বলো, ছিল তেইশ দিন ছুটি—হলো ষোল। কি বিচার? এবার রবিবারটাও ঘুচিয়ে দাও, ওটা আর কেন দয়া করে রেখেছ! স্বাধীনতা মানে বুঝি সারা জীবনের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আপিসের কলম-পেষা! ঘর-সংসার চুলোয় দেবার জন্যেই বোধহয় এঁরা সব নাকে-মুখে দুটি গুঁজে আপিসে ছোটেন!

রাগ করলে ভগবান! না, জানি তুমি আমার দুঃখ কিছুটা বুঝবে তাই এরকম বেপরোয়া যা মনে আসছে তাই বলে যাচ্ছি। তুমি ছাড়া আর একজন আমার দুঃখ কিছুটা বুঝতেন, কিন্তু তাঁর ত এখন এতটুকু অবসর নেই। রবিবারটা হাট-বাজার বসে বাড়িতে—এ পাড়া, বেপাড়া থেকে ওঁর সব বন্ধু-বান্ধব আসেন, আমার সুবাদেও যে কেউ কেউ না আসে এমন নয়। হাতে ছিল এই শনিবারের বিকেলটুকু। কোনো দিন বা সিনেমাতে যেতাম, কোনো দিন মার্কেটিং-এ যাওয়া হত! ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা সবাই মিলে একটু আয়েস করতে পেতাম এই একটি দিনই। সেটা কেড়ে নিয়ে দেশের কোন্ মহা উন্নতি হবে তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে নেই।

উনি সেদিন বলছিলেন যে, আগে, মানে দেশ যখন বিদেশীদের হাতে ছিল তখন ছুটি-ছাটা শনি-রবি ছাড়া গোটা ছেচল্লিশ দিন ছিল কিন্তু বছরের শেষে সরকারী আপিসের বকেয়া কাজ বড় একটা পড়ে থাকতো না। পুরনো বছরের জেরটানা কাজ হাতে গোনা যেত। বিদেশী মনিবরা দস্তুরমতো বরাদ্দ ছুটি নেওয়াতো জোর করে! বল্‌ত, ছুটি নাও, বিশ্রাম করো, তারপর আবার তাজা হয়ে কাজ করবে!

তারপর আমাদের স্বাধীনতা হাতে আসার পর-পর বছরের শতকরা ষাটভাগ কাজ হাসিল হতো বছরের ভেতরে। এখন কাজের লোক অনেক বেশী বেড়ে গেছে, ছুটি-ছাটাও গেছে কমে—কিন্তু বকেয়া কাজ

নাকি প্রায় ষাটভাগই জমে থাকছে! পার্কিনসন্ না কোন এক সাহেব মজাদার একখানা বই লিখেছেন—তাতে তিনিও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কাজের লোক যত বাড়ছে, তাদের কাজের সময় যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই নাকি মানুষের যোগ্যতা কমে যাচ্ছে!

আমি গেরস্থ ঘরের বৌ, ওসব বড় বড় কথা বুঝি না। আমার ছোট সংসারের গণ্ডীঘেরা জীবনে, সত্যি বলছি এমন একটা তিক্ততা এসেছে যে, এখন মানুষের ক্ষমতার ওপরই অবিশ্বাস এসে পড়ছে। শুধু শনি-রবি ছুটির কথাই নয়-- বাজারে জিনিসপত্রের দাম, ছেলেমেয়েকে মনের মতো মানুষ করার চেষ্টায় হাল্লাক হয়ে যাওয়া, সামাজিক লৌকিকতা বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে না-পারার দুঃখ, আর ন্যায়-ধর্ম বাঁচিয়ে চলার ভাবনা--সব মিলিয়েই আমার মাথাটা ঘুলিয়ে উঠেছে।

তাই অনেক দেখেশুনে শেষে ঠিক করেছি যে, মানুষের কাছে আর আমার মনের কথা বলব না—কারণ নিজের দুঃখ এক কড়া বলতে গেলে পরের দুঃখ সাতখানা শুনতে হবে। কাজ কি, তার চেয়ে তোমার কাছেই জানাবো, যখনই ফুরসত পাবো তখনই তোমাকে চিঠি লিখব। জানি না আমার এ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবে কি না, তবু লিখে যাই—যদি কোনো দিন অবসর হয় দেখো।

আমার জন্যে না হলেও দুনিয়াতে আর যতো ঘরণী-গিন্নী আছে তাদের জন্যে তুমি সেই দূর ভবিষ্যতেও যদি কিছু পারো ত করো। আমি তাতেই খুসি। কেননা আর সকলের দুঃখভার কমলে আমারটাও কমবে, আর সবার ছেলেমেয়ে ভালোভাবে মানুষ হলে আমার ছেলেমেয়েও হবে, আর সবাই খেয়েপরে বাঁচলে আমরাও বাঁচব, আর সবাই সুখে থাকলে শুধু আমার জন্যেই বা দুঃখের পসরা ভরা হবে কেন! আমি এটুকু বুঝতে পারি ভগবান, আমি একা নই—আমার একার সমস্যা এসব নয়, দেশজোড়া সবাই আমরা কী একটা বেকায়দায় পড়ে ভুগছি। তবু বেঁচে আছি, আমরা বাঁচতে চাই বলে

দুঃখ-কষ্টের ধাক্কা হজম করছি। কাজেই আমার এ চিঠি তুমি মাত্র একজন স্ত্রীলোকের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, নোনাপানি বলে উড়িয়ে দিলে খুব ভুল করবে ভগবান।

তুমি তিন-তিনটি ভুবনের দপ্তরের মালিকই হও আর যা-ই হও-না-কেন—আমি আর ভয় করি নে তোমাকে। পৃথিবীকে নিয়ে ছেলেখেলার তামাশা যারা করছে তাদের সামলাও, তাদের ঘটে সুবুদ্ধি দাও—নইলে মানুষের জীবনের সব স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। আমার বুদ্ধিকে মেয়েলী বুদ্ধি বলে খাটো করে দেখছ নাকি ঈশ্বর! বেশ, তাহলে একে একে নমুনাগুলোর ওপর নজর দাও—তাহলেই বুঝতে পারবে, তোমাকে মায়া-ছলনায় ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করা আমার মতলব নয়।

আজ মঙ্গলবার জানুয়ারী মাসের বারো তারিখ—এখন বিকেল পাঁচটা বাজে। আমাকে বাজারে বেরুতে হবে এখনই—আগামী কাল পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন আমাদের কৌলিক লক্ষ্মী-পূজো। সকালে ত বেরুতে পারি নে, হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে হিম্‌সিম্ খেতে-খেতে ওঁর আপিসের ভাত দিতে-না-দিতে ছেলেদের স্কুলের সময় হয়ে যায়—। এদের পালা চুকলো ত মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরল।······রবিঠাকুর 'যখন রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা' লিখেছিলেন তখন কুলবধূদের বাজারে যাওয়ার পর্বটা জন্মায় নি। এখনকার কোনো কবি কি ছাই এটা দেখতে পায় না? ওদের লেখাতে সেই 'মেয়ে ছুটো কাজেতে যায় আপিসের ঠিকানা বলে না' গোছের মেয়েকেই দেখতে পাই! ওরা কোন্ রাজ্যে বাস করে জানি না। আমাকে কেন, বাজারে যেতে হয় অনেক মেয়েকেই—সে জন্যে দুঃখ করি নে, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা এখন দাঁড়িয়েছে এই রকম: কূলবধূ, গৃহলক্ষ্মী, বাজার-সরকার, জায়া-জননী-প্রিয়া।

আর ওঁদের, মানে, স্বামীদের: সকালে খবরের কাগজ পড়া

(অবশ্য সময় পেলে দৈনিক বাজারটা, মুদির দোকানের টুকিটাকি কেনা-কাটা করতে চান, করেনও, তবে নজরের নবাবিয়ানার জন্যে এত বেহিসেবী খরচা করে বসেন যে, সেটুকুও ওঁর হাতে আজকাল ছেড়ে দিতে ভরসা পাই না। কেন-না মাসের শেষে টান পড়লে তখন আমাকেই মুশকিলে পড়তে হয়।) তারপর স্নানাহারান্তে বেরুনো। সন্ধ্যের পর প্রায় বেশির ভাগ পথটাই হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ফেরেন। এর মধ্যে বারতিনেক ভিড়ের মধ্যে ট্রামে ওঁর পকেটমার হয়ে গিয়েছিল কিনা !

সারা দিনের পর বেচারী এসে ছেলেমেয়েদের নালিশ শোনেন, বিচার করেন, এরই মধ্যে আবার উট্‌কো লোক এসে হাজির হয়। কেউ কেউ আপিসের কাজেই আসে হয়তো। কিন্তু বাড়িতে কেন আসে ওরা ? যাই হোক—ওঁর ভরসায় বসে থাকলে লক্ষ্মীপূজোর বাজার শিকেয় উঠবে। চট করে শ্যামবাজার থেকে ঘুরে আসি !···

চট করে বাজারে পৌঁছলেও বাজারটা চারবার চরকির মতো পাক খেতে খেতে দেরী যা হবার হলোই। কি করি সবই ত আগুন—মা-লক্ষ্মীর কপালে কি ভোগ জুটবে! কড়াইশুঁটি এগারো আনা সের, শাঁখআলু দশ আনা, নতুন গুড়ের পাটালি এক টাকা, এক জোড়া নারকেল বারো আনা, টোম্যাটো (এ বছরে এই প্র .ম কিনলাম। শখ করেই বলতে হবে) চৌদ্দ আনা সের! এটা-ওটা কিনতে কিনতে যখন ফেরবার গাড়ি ভাড়ার পয়সাটাও খরচ করে ফেলছি তখন মনে পড়ল যে উনি আর বাড়তি একটি পয়সাও দেবেন না, পুরোহিতের দক্ষিণান্তের বরাদ্দও এই টাকাতেই চুকোবার চুক্তি ছিল ওঁর সঙ্গে! —আর নয়, এবার বাড়ি ফিরে এক পত্তন বকুনি হজম করে চাল-ডাল বাটতে বসবো !

আজ কতো কাজ! গোকুল-পিঠে করবার জন্যে ছেলেমেয়েরা আঠার মতো ধরেছে, 'মা কতোদিন গোকুল-পিঠে খাই নি!' ওদেরই বা দোষ কি, রুটি আর চিঁড়ে-মুড়ি ছাড়া আর কী-ই বা কপালে জোটে।

ইচ্ছে ত করে, হরেক রকম করি, কিন্তু পেরে উঠি নে। উল্টে ওদের আবদার শুনে রেগে গিয়ে মারধর করি। এই আজ সকালেই নণ্টু পিঠের বায়না ধরেছিল বলে একটা চড় খেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। আহা! ওর কতোই বা বয়েস! সাধ-শখ থাকাটা কি এমনই অপরাধ!

...রাত বোধহয় এখন বারোটা বাজছে। দুচোখ ঘুমের চাপে জ্বলছে। এইবারে পিঠেগুলো রসে ডুবিয়ে শুতে যাবো। এ বছর আমাকে একা হাতেই দশভূজা হতে হয়েছে। অন্যান্য বারে ননদ আসে, ও এ-বাড়ির মেয়ে, এখানকার আচার-বিচার আমার চেয়ে ভালো জানে। আগে আমি কী আনাড়িই ছিলাম! ভাবলেও হাসি পায়। ননদের শ্বশুর-বাড়িতে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজো হয়--কাজেই পৌষলক্ষ্মীর দিন ও এখানে এসে আলপনা দেওয়া, আনাজ-কোটা, টুকিটাকি অনেক কাজই করত। এবার ওর মেয়ের বাড়াবাড়ি অসুখ—আসতে পারবে না। আমি একা।

অবিশ্যি আমার দিদিকে বললেই উনি আসতেন, আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কত কাজ করতেন। কিন্তু ওঁকে বললে ওঁর গোটা সংসারকেই নিমন্ত্রণ করতে হয়—আর, নিজের মায়ের পেটের বোন বলে মুখ ফুটে 'যাও' বলতে পারব না ত! দিদি আমার একবার হাত-পা মেলে বসলে মাসখানেকের দায়ে নিশ্চিন্দি—কে বা জানে পৌষ মাস, কে বা মানে সংক্রান্তি।...আমার একাই ভালো।...আবার ভোর থাকতে উঠতে হবে, লক্ষ্মী পাততে হবে। সূর্য ওঠার আগে একটু চা খেয়ে নেবো—নইলে সেই তিনপ'র বেলায় পূজো চুকলে পরে কপালে কিছু জুটবে। এমন বিশ্রী অভ্যেস ছিল না, কিন্তু এখন সকালে চা না-খেলে মাথা ধরে, মাথা ঘোরে---হাত-পা অবশ হয়ে আসে।

বড় মেয়েটার চোখে যেন যমের ঘুম, কিছুতেই উঠতে চায় না। ও ঘুরে ঘুরে পাশ ফিরে শুচ্ছে—অথচ ওকে না তুললে শাঁখ বাজাবে কে!

তাও ত আমি যখন উঠেছি তখন ডাকি নি। উঠে চান করে, এখন রেশমী কাপড় পরেছি—এবার লক্ষ্মী পাতা হবে।

উনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ওঁর এ-সব নাকি ভালো লাগে না।

বলেন, 'তোমাদের এ-পূজো যেন লক্ষ্মীঠাকরুণকে ঠাট্টা করা। হ্যাঁ, পূজো হত আমাদের ছেলেবেলাতে। মা-ঠাকুমা, পাড়ার পিসি-খুড়ি-জ্যেঠি-দিদি সবাই সেই ভোর রাত থেকে হাঁক-ডাকের চোটে শীত ছুটিয়ে দিতেন। পূজোর দশদিন আগে থেকে ধুম পড়ে যেত—চাল গুঁড়ো করা, ডাল ভাজা—কতো রকমের পিঠে-পুলির বন্দোবস্ত হত! লক্ষ্মী পূজোর আগের রাতে আমাদের চোখে ঘুমই আসতে চাইত না। পাটের ওপর সাজানো হত—হাঁড়ি থেকে বেরুতো কতো কড়ি, কাঠের প্যাঁচা আরো কতো কী! ঠাকুরঘরের দোরগোড়ায় বসে বসে আমরা দেখতাম অবাক হয়ে। আঃ ধূপ-ধূনোর সে-গন্ধ এখনো যেন নাকে লেগে রয়েছে।'

এখনো সবই হয়, তবে যেন নিয়ম বজায় রাখার মতো। একখানা আস্ত ঘর ঠাকুরের জন্যে পাই কোথায়! আর লোকজন—আমার বিয়ের পর যাদের পূজোর দিনে প্রসাদ পেতে বলা হত, তাদের সবাইকে ত এখন বলতে পারি না। মা লক্ষ্মীর যেমন ইচ্ছে, তিনি যেমন দিচ্ছেন, তেমনিই পূজো হচ্ছে তাঁর। সেই পিঠেও হয়, পায়েস খিচুড়ি ভাজা তরকারি চাটনি সবই ত করি—কিন্তু আগে যেখানে পাঁচরকম ভাজা হত, এখন সেখানে হয় দুরকম। মুগছাউনী, ভাজা-পুলি, ভাবা-পুলি, পাটি-সাপ্টা, এ-সব করা যায় না—করবার মধ্যে ওই গোকুল পিঠে করি, আর পায়েস। কার জন্যে সতেরো রকম করব? ছেলেমেয়ে অবিশ্যি পেলেই খায়। কিন্তু উনি মুখে লম্বা-চওড়া বাক্যি বকলেও, খাবার বেলায় ত পক্ষীর আহার! তাছাড়া অতো অবসরই বা পাবো কোথায় —খরচের ভাবনাই কি কম!

শাঁখ বাজল। মা-লক্ষ্মী পাটে বসলেন। আমার চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। আপনা-আপনিই যেন চোখে জল ভরে এল।

হঠাৎ বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল—আমিই এই বংশের **'কুল-লক্ষ্মী'** **—এ-কথা** আদর করে যিনি বলেছিলেন, যিনি আজকের **এই গৃহস্থ** বধূকে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন, তিনি আমার শাশুড়ী। হয়তো তিনি আজ খুব কাছাকাছি অলক্ষ্যে থেকে সব দেখছেন! তাঁর কথার মর্যাদা রাখতে পারলাম কই! দিন-দিনই এ-সংসার থেকে শ্রী যেন বিদায় নিচ্ছে। কেন আমি শ্রী বজায় রাখতে পারছি না!

বড় মেয়ে শাঁখ থামিয়ে বলল, 'মা, তুমি কাঁদছ?'

আঁচলে চোখ মুছে, মনে মনে লক্ষ্মী-ঠাকরুণকে বললাম—অপরাধ নিয়ো না মা! তোমার দয়ায় আমার দুঃখু থাকবে না জানি।

২

মাঘের এই কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যেতে নণ্টুবাবু পাঁক মেখে ভূত সেজে বাড়ি ফিরল—'মা, মা, ও-মা ছাখো!'

দেখবার মতোই হয়েছে বটে, একটা পায়ের হাঁটু অবধি থক্‌থকে পাঁক, প্যাণ্ট আর শার্টের যা দশা হয়েছে সে আর কহতব্য নয়। এই বিকেলে ধোয়া জামা-প্যাণ্ট পরিয়ে দিয়েছি। দেখলে কার মাথার ঠিক থাকে! আবার হতভাগা ছেলে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হাসছে—'হি-হি।' নিজের অজান্তেই হাত উঠেছিল।

ছেলেটা আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল, দু-চোখ ভয়ে কেমন বড়-বড় করে ও বলল —'মেরো-না, মেরো-না মা!'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন মায়া হল, সত্যিই ও ভয় পেয়েছে খুব।

হাত নামিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে ভারি গলায় বললাম, 'না, মারবে না! ওকে পূজো করবে। বলি, তুই ভদ্দরলোকের ছেলে না কি। পাঁকে বোঝাই রাস্তায় বেরুতে পৈ-পৈ বারণ করলুম—তা কে কার কথা শোনে।'

এই ভর-সন্ধ্যেতে ওকে এখন কা না কন্‌কনে জলে আগা-পাশ-তলা ধোয়ালে ত কালই জ্বরে পড়বে। এখন গরম জল করো, চান করাও– মাগ্‌গি-গণ্ডার কয়লা, ইস্‌!

অবিশ্যি ওকেই বা মিছেমিছি দোষ দিয়ে কি হবে। ফি বছর এই জানুয়ারি মাসের শেষে আমাদের এ পাড়ার এমনি হাল হয়

—কর্পোরেশনের লোকেরা দু-তিনদিন ধরে হাঙুরে-নর্দমার পাঁক তুলে পথের ওপর ঢেলে দিয়ে সরে পড়ে—তারপর মরো তোমরা। আগে আগে যখন 'কেলপ্ত' খালি জমি পড়ে ছিল, তখন মাঠের মাটি কেটে আল বানিয়ে, পথের ওপর খানিকটা-খানিকটা জায়গা ঘিরে তার মধ্যে ওরা পাঁক ফেলত। রোদ পেয়ে দইয়ের মতো থক্-থাক পাঁকগুলো একটু শুকনো ঝুর-ঝুরে হলে পরে কর্পোরেশনের লরী এসে তুলে নিয়ে যেত। অবিশ্যি তারও আগে নর্দমার ওপারের বস্তির বাসিন্দেরা পাঁক-শুকনো মাটি কোদাল দিয়ে চেঁছে ঝুড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে উঠোন ভরাট করত, ঘুঁটে, গুল দেবার কাজে লাগাত। আর এখন -- এখন আমাদের এপারে ত ফাঁকা জমি এক ছটাক নেই। কর্পোরেশনের লোকেরা মাটি পায় না, আলও বানায় না। নর্দমার জলে-পাঁকে মিশে পথঘাট নৈরেকার! তার ওপর দিয়ে ইস্কুলের বাস, মালের লরী, ট্যাক্সী, মোটর, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি চলে চলে পথের এমন হাল করে তোলে যে কাপড় অকলঙ্ক রেখে হাঁটাই যায় না। ওপারের বস্তির বাসিন্দেরা ওরই মধ্যে কয়লা ভাঙছে, কল থেকে জল তুলছে— সবই করছে। ওদের ক্ষমতা আছে বটে।

ওদেরই বা বলি কেন, আমরাও ত এরই মধ্যে রয়েছি। আমাদের পাড়া এখন 'পাঁক-পাড়া।'

গরম জল নিয়ে নন্টুকে যখন চান করাতে ঢুকলাম তখন ও বলল, 'মা, একটা কথা বলব?'

—বলো।

'ভাগ্যে তুমি আমাকে মারো নি।'

—কেন, মারলে কি হত শুনি!

'ভগবান তোমাকে পাপ দিত।'

—কেন?

'সত্যি আমি ত কোনো দোষ করি নি। ওই যে জগনা আছে না —জগনা ঢিল মেরে মেরে কুল পাড়ছিল। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি, কুল

চাই নি ওর কাছে—সত্যি সত্যি বলছি মা! আমি একবারও চাই নি, আচ্ছা সরস্বতী পূজোর আগে বুঝি কুল খেতে আছে? শেষে মা সরস্বতী বিদ্যে দেবেন না যে'

ওকে না মেরে ভালোই করেছি তা হলে!

বেচারী কুল চায় নি, জগনাকে বারণ করেছিল কুল পাড়তে। বস্তির ছেলের মুখ খারাপ। সে দাঁত খিঁচিয়ে বলেছে, 'বেশ করব খাবো। হ্যাংলা-প্যাংলা ছোঁড়া, পালা বলছি নইলে মারব।...'

এই সব বলেছে। আরও সব খারাপ কথা বলেছে, নন্টু সেসব কথা কিছুতেই উচ্চারণ করতে রাজী নয়। ও জানে সে কথাগুলো খারাপ। এর আগে অবিশ্যি সেই সব কথা হরদম ওর মুখে মুখে লেগে থাকত—একটু রেগে গেলেই বলত। একদিন খুব পেটান দিয়ে বারণ করেছি তারপর থেকে আর ও বলে না। ছেলেটা ভালো। আমার বাকী কটি যদি এমনি হত—তা-ই বা কেন, ওরাও ত ছোটবেলাতে মা-বাবাকে ভালোবাসতো, এখন যত বড় হচ্ছে তত যেন কেমন-কেমন হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, বুঝতে পাচ্ছি না।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। নন্টুর কান্নায় চমকে উঠে বললাম—কি হল গোপাল। কাঁদছ কেন?

'আচ্ছা মা, জগনার ওপর যে মা সরস্বতী রাগ করলেন, বিদ্যে যদি না দ্যান ওকে—তা হলে, ওকে ত বস্তির ছেলের মতো না খেয়ে থাকতে হবে! ওকে আমি বললুম, তা ও আমাকে মারতে এল। আমি পালাতে গিয়ে গ্যাঁক করে পাঁকে—জানো মা!'

ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলি—তা অতো কাঁদছিস কেন?

'ওই জগনাকে—'

ওর কথা শেষ হবার আগেই উনি আপিস থেকে ফিরলেন। ওঁর গলা পেয়ে নন্টু, তার বাপের কাছে 'জগনা'র জন্যে দরবার করলে, উনি 'হো-হো' করে হেসে উঠলেন। তারপরে চলল ওঁর লেকচার। উনি ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষ থাকতে দিতে চান না। দেখেছি, সব

ব্যাপারেই এই রকম। উনি সাফ-সাফ বলে দিলেন, 'আসলে কাঁচা কুল খেলে অসুখ করে, সেইজন্যে সরস্বতীর দোহাই দিয়ে খেতে মানা, বুঝলে বাপী।'

আপাততঃ নন্টু তাতেই খুশী হয়ে উঠল। কিন্তু আমার এটা খারাপ লাগে। হয়তো ওঁর কথাগুলোই ঠিক, কিন্তু ছোটরা অসুখ-বিসুখের ভয়কে তেমন গ্রাহ্য করে না, ঠাকুর-দেবতার দোহাইকে যেমনটি করে—ওদের কাছে ওই বিশ্বাসটুকুর দাম অনেক। আর এতে ত ক্ষতি কিছুই নেই। বড় হলে, বুদ্ধি হলে, তখন নন্টু ওঁর মতো বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিজে থেকেই বুঝতে পারতো! তা নয়, এখনই ছেলেকে উনি জ্ঞান গুলে খাওয়াবেন।

দোহাই ভগবান, গুরুজনের নিন্দে করছি বলে মনে কিছু কর না। আমি ওঁর নিন্দে করলে সে ত আমারই গায়ে এসে লাগবে। আসলে নিন্দে করাটা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই যে ছেলের কাছে উনি আমাকে ছোট করলেন, এতে কার কি লাভ হল? নন্টু ত বুঝল যে, মায়ের কথা ঠিক নয়। এর পর কি ও আমার ওপর আগের মতো আস্থা রাখতে পারবে!

আজ মাসের বাইশ তারিখ—এর মধ্যেই চোখে-কানে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ ওঁর মেজাজ যা হয়ে আছে তাতে টাকার কথা মুখে উচ্চারণ করতে ভরসা হচ্ছে না। এ মাসে মেয়েদের স্কুলের মাইনে এখনো দিয়ে উঠতে পারি নি, মুদির দোকানেও ধার হয়ে পড়ল।

কী যে করি!

আজ অন্ততঃ স্কুলের টাকাটা দিতে হবে, নইলে জরিমানা আরো বেড়ে যাবে। এখন দিলে তবু আট আনা করে এক টাকা জরিমানা দুজনের জন্যে লাগবে। এর পর ফি হপ্তায় চার, আট আনা করে বেড়েই চলবে। অনেক ভেবে-চিন্তে, গলাটা যতোখানি পরি

মোলায়েম করে ওঁকে বললাম—হ্যাঁ গো, তুমি যে বলেছিলে পনের টাকা দেবে তা সেটা আজ—

গম্ভীরভাবে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে উনি বললেন, 'টাকা এখন কোথা থেকে আসবে শুনি ! মাসটা শেষ হতে দাও –'

বেশ মানুষ, উনি যে মাসের পুরো টাকা দেন নি সেকথা ভুলে বসে আছেন। তখন বললেন, 'এখন এই নাও, পরে বাকী পনের টাকা পুষিয়ে দেবো।' এ রকম ত মাঝে মাঝেই হয়। হয়তো কাউকে ধার দিয়েছেন !

অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম—এ মাসে খরচ অনেক বেশি। লক্ষ্মী পূজো গেল, চিনির দাম বেড়ে গেছে। বাসের ভাড়া বাড়ল, মেয়েদের ত সেটা দিতে হবে। কোথায় কিছু বেশি দেবে তুমি-- তা নয় ছেড়েই দিলাম, অন্ততঃ পুরো টাকাটা দেবে ত ! মেয়েদের মাইনে দিতে হবে ফাইন লাগবে—

'কেন ফাইন কিসের জন্যে।'

—আজকাল নিয়ম হয়েছে, পনের তারিখের মধ্যে না দিলে এক আনা করে ডেলি ফাইন।

'তা হবে বইকি ! ওদিকে গভর্নমেণ্ট আইন করল, মফঃস্বলে ক্লাস এইট পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেবে—আর কলকাতার গার্জেনদের বেলা উল্টো শাল- -। ফাইন-টাইন দেওয়া হবে না।'

রায় ত হয়ে গেল, ফাইন দেওয়া চলবে না। কিন্তু স্কুলের কর্তাদের সঙ্গে লড়াই করা কি আমার কাজ ! ওঁরা সব গার্জেনরা মিলে যদি এ নিয়ে একটু প্রতিবাদ করেন তাহলে ব্যাপারটা মিটে যায়। তা কে বলে !

আপিসে যখন বেরুবেন তখন টাকার কথা আর একবার না বলে পারলাম না। টাকা যে চাই-ই—!

পকেট থেকে একখানা রঙচঙে কার্ড বার করে দিয়ে বললেন, 'এটা নাও, কাউকে বেচে দিলে গোটা পঞ্চাশ টাকা পেয়ে যাবে। হল ত—'

—কি এটা ?

'এটা একটা টিকেট। ক্রিকেট টেস্ট খেলার টিকেট। গরীবের শখ সয় না !'

নিমেষে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হিম হয়ে গেল। চোখ ফেটে জল এল। কান্নার দমকে গলা বুজে এসেছে, বেশ বুঝতে পারছি আর একটু ধাক্কা খেলে কেঁদে ফেলব।

বললাম—আমি কি তাই বলেছি ! তোমার কাছেও যদি অভাব-অভিযোগের কথা না বলতে পারি ত কাকে বলব ? তা বলে তুমি আমাকে এইভাবে অপমান করবে ! আমি কি জানতাম যে ওই টাকা দিয়ে তুমি টেস্টের টিকিট কিনেছ ?

'না, টাকা দিয়ে টেস্টের টিকিট কেনার মতো মতিচ্ছন্ন আমার হয় নি। এটা ঘুষ—'

—ঘুষ ? তুমি ঘুষ নাও !

'না, এমনি ঘুষ নিই নে। তবে এটা বেচে সেই টাকা সংসারে দিলেই ত ঘুষ হয়ে যাবে।'

—ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝি নে—

ঠোঁট উল্টে বাঁকা হাসিটি ওঁর ঠিক আগের মতোই আছে। সেই বিয়ের পর পর যেমনটি ছিল, এত ঝড়ঝাপট গিয়েছে, বয়সও গড়িয়ে পড়েছে—তবু সেই ধারালো হাসিটি বদলায় নি। বাঁকা হাসি হেসে উনি বললেন, 'আজকের দিনে ঘুষ না নেয় কে বলো। সবাই নেয়। তবে যাদের চক্ষুলজ্জা আছে, তারা সরাসরি টাকায় ঘুষ দিতে পারে না, নিতেও পারে না,—তারা দেয় ভেট ! ভেট নেওয়াতেও দোষ নেই। ফুটবলের ফাইনালে, ক্রিকেটের টেস্টে, কিংবা নাচ, থিয়েটার, গানের টিকিট দেওয়া আজকাল কালচারাল ভেট। আমাদেরও একটু-আধটু শখের সুড়সুড়ি মেটে। তা সে যাক—তুমি যেভাবে ছিনে জোঁকের মতো ধরেছ তাতে, ভেট বেচে ঘুষ করে না নিয়ে আমার কি উপায়—!'

টিকিটখানা ওঁর পকেটে গুঁজে দিয়ে বললাম—আমি ছিনে জোঁক হয়েছি কেন সেটা যদি একটু ভেবে দেখতে তাহলে তোমার দয়া হত করুণা হত। কিন্তু তা একবারও বুঝতে চেষ্টা করলে না—

'আহা রাগ করছ কেন। বেশ বাবা আমার অন্যায় হয়েছে, মাপ চাইছি। আজ রাত্রে তুমি টাকা পাবে—'

—আমার মাথা খাও টিকিট বিক্রি করতে পাবে না, তাতে যদি সংসার না চলে, চলবে না না হয়—!

'আচ্ছা, আচ্ছা! ধারই করব গো—!'

ধার! ধার ছাড়া উপায়ই বা কী! আজ বাদে কাল একটা বৌভাতের নেমন্তন্ন আছে। মেয়েদের স্কুলের মাইনে যে কবে দিতে পারব জানি নে।

দিন দিন ওঁর সঙ্গে সম্পর্কটা কিরকম বিশ্রী দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। এর জন্যে কাকে দোষ দেবো? ওঁর জন্যে দুঃখ হয়। বেচারী সংসারের চাপে পড়ে কেমন কাঠ-কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আমি কি কেবলি টাকা চাই, টাকাতে আমার কি দরকার। দুটো মিষ্টি কথা পেলেই আমার মন ভরে ওঠে। টাকা ত সংসারের জন্যে—সে সংসার আমার একার নয়। অথচ উনি অনায়াসে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন।···আমি যদি রোজগার করতে পারতাম তাহলে হয়তো খানিকটা বোঝা হালকা হত। কিন্তু কি ভাবে টাকা রোজগার করতে হয়, তা ত শিখিনি। ছি, ছি, কী লজ্জার কথা—উনি বললেন ঘুষের কথা! আমি কি তাই বলেছি! আমাদের চেয়ে যারা গরীব, যারা রাস্তার ওপারে থাকে, তাদের তুলনায় আমাদের অবস্থা ত কতো ভালো—তবে কেন এমন অশান্তি হয়, কেন হয় ভগবান?

ভোরবেলা প্রভাত-ফেরীর শব্দে ঘুম ভাঙলো, আজ তেইশে জানুয়ারি, আজ সুভাষবাবুর জন্মদিন। সুভাষবাবু নেতাজী, আমাদের দেশের

স্বাধীনতার জন্যে বড় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, আন্দোলন করে বন্দী হয়ে যক্ষ্মায় ভুগেছেন, তারপর এ-পি করা একখানা ফুসফুসের ওপরই ভরসা করে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে মগের মুল্লুকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। নেতাজী কোথায় গেলেন কেউ তা বলতে পারে না, তবে তাঁকে দেশের লোক সবাই ভালোবাসে। আমিও বাসি বই কি! নণ্টুদের ক্লাবের ছেলেরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে পাঁক মাড়িয়ে চলল – বোল্টু ড্রাম বাজাচ্ছে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি বেচারীর চলতে কষ্ট হচ্ছে। আগে আগে চলেছে নণ্টু ফ্ল্যাগ নিয়ে। ওরা তুই ভাই খুব খুশী। এদিকে উনি সাত-সকালে ছাঁদা বেঁধে ছুটেছেন খেলার মাঠে।

আজ আকাশে বাতাসে উৎসবের সুর। ভোরবেলা পাড়ার ফুল-ওয়ালা ছেলেটা জিপ্‌সি আর মর্ণিং গ্লোরি নিয়ে এল—'মা!' হ্যাঁ, মা—আমি অনেকের মা। উনি ত ঠাট্টা করে বলেন, 'তোমার ডালওয়ালা ছেলে, মাছওয়ালা ছেলে, ধূপওয়ালী মেয়ে, ঘুঁটেওয়ালা ছেলে।' ওরা আমার ছেলে নয়, তবু আমি ওদের মা! কিনেছি ছ আনার ফুল। এটা বাজে খরচ। তা হোক, এটুকু ওঁর জন্যে আমি করতে বাধ্য। উনি যে ফুল বড় ভালোবাসেন! তা ছাড়া ছেলেটা সকালবেলা আশা নিয়ে এল, ওকে ফেরাই কি বলে। আমি জানি, ওর মা হাসপাতালে পড়ে আছে। কেন? ছেলেপুলে হবে বলে—! দিন চলে না বলে কি ছেলেপুলে হবে না! হওয়া উচিত নয়, কিন্তু হচ্ছে যখন, যখন হয়ে পড়েছে তখন আর তাকে না মেনে নিয়ে উপায় কী!

মনটা সত্যি অনেকদিন পর বেশ ঝরঝরে লাগছে। ছেলে, মেয়ে, উনি সবারই আনন্দ আজ। আর আমি? আমার আনন্দ ওদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এইটুকু যেন বজায় থাকে—আমার আর কিছু চাই না। টাকা? টাকা উনি এনে দিয়েছেন, হ্যাঁ ধার করে একশ টাকা। তবে সেটা কো-অপারেটিভ থেকে—আস্তে আস্তে শোধ দিলেই চলবে।

৩

আচ্ছা ভগবান এমন কেন হয়! কিছুদিন আগেও ত পূজোর নামে মন নেচে উঠত। আর সরস্বতী পূজোটা আমার এতো ভালো লাগত যে, দুর্গা পূজোর পর থেকে মনে মনে দিন গুণতাম, কবে সরস্বতী পূজো আসবে? কবে আসবে! কিন্তু এখন পূজো যত কাছে আসে মনে তত ভয় বাড়ে—কি করে পূজোর পালা চুকবে! বিশেষ করে এবার যেমন বুকের ভেতর গুর্-গুর্ করছে এমনটা আগে কখনো হয় নি। দিন দিন মনটা এতো ছোটো হয়ে যাচ্ছে যে, নিজেরই ভয় হয়, বুঝি বা তোমাকে আমি ভক্তি করছি না, এই বুঝি তোমার ওপর অবিশ্বাসের আঁচ লাগল। নিজেকে দোষ দিতে গিয়েও পুরোপুরি দায়ী করতে পারছি না। কেন জানো? চাঁদা। হিসেবটা একবার ধরো: দুই মেয়ের স্কুলের চাঁদা দুই আর দেড়, যোগ করলে সাড়ে তিন টাকা। দুই ছেলের পাঠশালায় পূজো হয়, ওদের ছাত্রছাত্রী ত বেশি নয়, কাজেই অল্পজনে বেশী চাঁদা না দিলে পূজো হবে না—তাদের জনে জনে দুটাকা। তাহলে হল চার, আর সাড়ে তিন, যোগ করো: সাড়ে সাত হল ত! এ দিকে পাড়ার বুলেট, ব্যায়াম সমিতি, সংঘ, ডিফেন্স পার্টি—গড়ে এক টাকা করে হলেও এদিকে আট-ন টাকা গচ্চা যাবে। এর ওপর, আজ সকালে যখন হাঁড়ি-হেঁসেলে লড়াই করছি, মিনিটে সাতখানা ট্রেন ফেল হবার দাখিল, তখন এসে হাজির হল কে জানো? এককালে পাশের বাড়ি ভাড়া থাকতেন যাঁরা, তাঁদের ছেলে! একগাল হেসে 'মাসিমা' বলে দাঁড়াল। তখন দেখলাম, বাঃ ছেলেটা বেশ মাথা-চাড়া দিয়েছে ত!

ওরই মধ্যে ওর মা-বাবা ভাই-বোনের খবর জেনে নিয়ে বললাম—তা এমন সময়ে পড়াশুনো ছেড়ে কি জন্যে রে?

মাথা নামিয়ে ছেলেটা বলল—'আমি ত আর পড়ছি না! মামার আপিসে কাজ শিখছি! রোজগার—!' তারপর ঢোক গিলে চাঁদার খাতা বের করলো ওর পকেট থেকে।—'মাসিমা, কতো লিখব? দু টাকা?'

মনে মনে বললাম, হায় মা সরস্বতী! রাগ হল ছেলেটার ওপর, ভাবলাম মা সরস্বতী যতোই রাগ করুক, বলে দিই—যে ছেলে পড়াশুনো ছেড়ে দেয় তার আবার সরস্বতী পূজো কি জন্যে? কিন্তু পারি নি, ওর মায়ের মুখখানা মনে পড়ল। যদি তিনি শোনেন একথা তাহলে দুঃখ পাবেন। নিজের মন দিয়ে তাঁর মনটা বুঝতে পারি ত! গেল একটা টাকা।

উনি সেদিন একশ টাকা ধার করে এনেছিলেন তাই কোনরকমে মানমর্যাদা বাঁচছে। রবিবারে বৌভাতের নেমন্তন্ন রক্ষা হল, চাঁদার আবদার সামলানো গেল। এর ওপর আবার চিনির দাম চড়তে চড়তে রসগোল্লার দরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। পাড়ার মুদিখানা থেকে এর আগে দু টাকা চার আনায় আড়াই সের চিনি আনতাম, কদিন আগে যখন সাড়ে তিন টাকায় আড়াই সের চিনি এসেছে তখনও আন্দাজ করতে পারি নি, আজ চার টাকা ছ আনাতে আড়াই সের কিনতে হবে। শুনলাম বটে সরকারী বন্দোবস্ত হচ্ছে যাতে এক টাকা দশ নয়া পয়সা সের দরে চিনি পাওয়া যায়। দেখা যাক। চালের দর ত আবার বাড়ছে। কয়লার বাজারে যা কদিন টানাটানি গেল তাতে ভয় হয়েছিল, বুঝি বা উনুনে আগুন পড়বে না। তেলেরও দাম নাকি বাড়ছে শীগ্গির। সবই চড়তির মুখে, অথচ আয় ত এক কড়াও বাড়ছে না। এ মাসের মতো যদি ফি মাসেই এরকম ধার করতে হয়, তবে চালাই কি করে! উনি কেবল বলেন, 'একটু হিসেব করে চলো!'

৬-৮-১৪

আমিও যে চেষ্টা কিছু কম করি তা নয়—তবু দিনের দিন খরচ বেড়েই চলেছে!

রাত দুপুরে তলপেটে লাথি খেয়ে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। কি যে ব্যাপার বুঝতে পারছি না। নন্টু পা ছুঁড়ছে, হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসছে। ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুললাম—কি রে, অমন করছিস কেন? কি হয়েছে!

আমার কথা ওর কানেই যায় নি, 'আউট আউট' করে আরও জোরে যখন চেঁচিয়ে উঠল তখন পা-দুটো চেপে ধরলাম। এখনো কন্‌কন্ করছে—ওইটুকু ক্ষুদে পায়ে জোর ত কম নয়।

ওই যে ঘুম ভেঙে গেল, তারপর আর কিছুতেই চোখ দুটো বুজে থেকেও ঘুম এল না। মাথার মধ্যে এলোমেলো, ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনার টুকরো খাপছাড়া হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রথমে ত কিছুক্ষণ ক্রিকেট ঃ কি যে মাথামুণ্ডু বুঝি নে আমি। আমার কর্তা ত মেতেই ছিলেন কদিন।

রাতে যখন মুখখানা,শুকিয়ে এইটুকু, কালিমেড়ে নিয়ে আসেন তখন মনে হয় বুঝি আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির চেয়েও মেহনত বেশি করেছেন। রাতে যদি বলি, ওগো মেয়ে দুটোর ইংরিজিটা একটু দেখিয়ে দাও না, পরীক্ষা ত এসে পড়েছে, এখন কেবল মাস্টারের ওপর ভরসা করে থাকা চলে না!

ব্যস, হাই তুলে বললেন—'দয়া মায়া কি একটুও নেই তোমার শরীরে!' আমার যতটুকু ক্ষমতা, করছি। ছেলে দুটোকে ত আমিই পড়াই। যদি তেমন লেখাপড়া জানতাম, তাহলে কি ওঁর মুখ চেয়ে থাকতাম!

যাক গে। হুজুগ আর কাকে বলে, মেয়ে, ছেলে সবাই রীলে শুনবে, মুখুয্যেদের বাড়ি গিয়ে। দুপুরে কেউ বইয়ের পাতা উল্টোয় না। জগন্নার মায়ের কথা মনে পড়ছে কেন? বেচারীকে পরশু হাসপাতালে দিয়ে এসেছে! কি হল কে জানে! রাস্তার ওপারে

ডুমুরতলায় খোলার ঘরে ওর স্বামী আর ছেলেমেয়েগুলোর কি হাল হচ্ছে? জগ্‌নার বাবা ঘরামীর কাজ করে। রাতে মদ খাওয়ার পয়সা কি করে যে জোটে—এক-একদিন ভারি গোলমাল করে লোকটা। রাত কটা বাজল? বীটের পুলিস টহল দিয়ে চলে গেল। আচ্ছা ভগবান, তুমি দুনিয়ার সব খবর রাখো? আচ্ছা বলতে পারো, পাশাপাশি ভগীরথের বৌটার নাজেহাল অবস্থা দেখেও কেন জগ্‌নার মা সাবধান হতে পারে নি—কেন দেড় বছরের মাথায় আবার ওর ছেলে হতে চলেছে? কি বললে? ভগীরথের বৌয়ের কথা কিছু শোনো নি! ওমা! ভগীরথের বৌটা নিজে ত খেতে পায়ই না, কাঁখের-কোলের নিয়ে ছটিকে আধমুঠো করেও খাওয়াতে পারে না—শেষে এখন ত পাগল হয়ে গেছে। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কেবল হাসে। হঠাৎ পথের মধ্যে লোককে দাঁড় করিয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে বলে - 'সব্বাই নিমতলায় গেল, আমি কেন গেলুম না! তোর পায়ে পড়ি আমাকে পাঠিয়ে দে।'

ওর মেয়েরা এ-বাড়ি ও-বাড়ি মেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে মরে বেঁচে আছে। ভগীরথ মাঝে মাঝে জেল থেকে ফেরে, আবার একদিন পুলিশে ওকে ধরে নিয়ে যায়।

পথের ওপারের সঙ্গে এপারের কতো তফাৎ। ওদের দিকে তাকালে, ওদের কথা ভাবলে চোখে জল আসে। ওপারে গঙ্গার মায়ের মতো মানুষ কি করে যে থাকেন! ওঁকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন সধবা ছিলেন। স্বামীর টি. বি., ঘরে বিয়ের যুগ্যি সোমত্ত মেয়ে, আর কোল্‌মোছা ছেলে। তখন উনি আসতেন আর কাঁদতেন আমার রান্নাঘরের সামনে বসে। ইচ্ছে, ওঁকে যদি রাঁধুনী রাখি তাহলে—! আমার হাতের কাজ টেনে নিয়ে করে দিয়ে যান। আমার সাধ্যমতো দু-একটা টাকা দিতাম। এই কবছরে উনি বিধবা হয়েছেন, মেয়েটার বিয়েও হয়েছে, ছোট ছেলেটা লেখাপড়া করে না। গঙ্গার মায়ের আগের মতো ভদ্র চেহারা নেই, আগে কখনো মুখফুটে কিছু চাইতেন

না, এখন আমার হাতে ত সব দিন পয়সা থাকে না। দিতে না পারলে বিরক্ত হন, বলেন—'খুব মুশকিলে পড়েছি মা, নইলে কি আর আপনার কাছে এভাবে চাইতে আসি।'

তারপর শুরু করেন ওঁর বাপের বাড়ি, মামাবাড়ি, শ্বশুরবাড়ির গল্প। যেন স্বপ্নরাজ্যে চলে যান, রূপকথার গল্প যেন! ওঁর ওপর আমার আর তেমন মায়া হয় না। না, তা নয়, চিরদিন কি পরের বোঝা বইতে পারে কেউ! আর আমার ত এই অবস্থা। জগ্‌নার মাকে যে দশ টাকা দিয়েছি সেটা কোনোদিন ফেরত চাইতে পারব না—সেও দিতে পারবে না, কিন্তু আমার আপদে-বিপদে বৌটা খেটে খুটে দিয়ে যাবে। আর দু-এক টাকা করে অন্তত কিছু শোধ করবেই। এইখানেই গঙ্গার মায়ের সঙ্গে জগ্‌নার মায়ের তফাৎ। সত্যি বলছি ভগবান, আমাদের মতো ভদ্রঘরের বৌ, যারা তেমন লেখাপড়া শেখে না তাদের মনটা কেমন যেন জড় হয়ে যায়। অথচ গরীব মূর্খদের মধ্যে এখনো অনেক-খানি জ্যান্ত মন বেঁচে আছে।...ওদের কথা এত কেন বলছি জানো? যখন নিজের অভাব-অনটনের চিন্তায় আমি ভেঙে পড়ি তখন ওদের অবস্থাটা বেশি করে ভাবি, তাতে খানিকটা সামলানো যায়।

পাড়ায় মহা হাঙ্গামা বেধেছে। উনি মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেলেন। আজ শনিবার। মাসের শেষ শনিবারটা নতুন নিয়মে ওঁর পুরো ছুটি। শনি, রবি, সোম—পর পর একসঙ্গে তিনদিন ছুটি। কাজেই পাড়ার দিকে, ঘরের দিকে নজর দেবার একটু ফুরসত পেয়ে বেচারী যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছেন। ছেলেরা আবদার ধরেছে—এবার বাড়িতে ঠাকুর এনে পূজো করবে। মেয়েরাও মুখ টিপে হাসছে। আসলে ওরাই এই ষড়যন্ত্রের পিছনে আছে। ওরা জানে যে, ওদের কথায় আমি আমল দেবো না, তাই ভাইদের নাচিয়ে দিয়ে মজা দেখছে। উনি বেরিয়ে যেতে আমি মেয়েদের একটু বক্‌লাম। এই যে ছেলেমানুষদের নাচানো এটা ভালো নয়। মিছিমিছি দুঃখ

পাবে ওরা। পূজো ত আর মুখের কথা নয়। আমাদের বাপের কালে বাড়িতে প্রতিমা পূজো দেখি নি। হ্যাঁ, পূজো হত—ঘটে আর বইতে। আমরা সবাই পাটে বই দিতাম। পুরোহিত আসতেন—পূজো হত। বাসন্তী রঙে ছোপানো কোরা কাপড় পরে, অঞ্জলি দিতাম বাড়িতে। তারপর স্কুলে যেতে হত। সেখানে প্রসাদের খুব জুৎ ছিল—লুচি, আলুর দম, হালুয়া। এই ছিল আমাদের পূজো। আমের মুকুল, যবের শিষ যোগাড় করার নামে মাঠে-ঘাটে ঘুরতাম। ফুল-চুরি ছিল পূজোর দিনের ভোরের পবিত্র কাজ।

সব শুনল মেয়েরা, তারপর বলল—'আমরা ত পূজোর কথা বলি নি, বোণ্টু নণ্টুই কুমোরবাড়ি গিয়ে ঠাকুর দেখে বায়না ধরল। তাই বলেছি, বেশ ত বাবাকে বল তোমরা!'

ওঁর মনের তল পাওয়া ভার। এমনি ত ঠাকুরদেবতার নামে নাক কুঁচকে ওঠেন। কিন্তু ছোটদের আমোদ-আহ্লাদের খাতিরে পূজোতে মত দিয়ে ফেলা ওঁর পক্ষে সম্ভব।

বেরিয়েছিলেন হাসতে হাসতে কিন্তু ফিরলেন মুখভার করে।

কি ব্যাপার? ডিফেন্স পার্টি আর মিলনীতে ঝগড়া বেধেছে। তেঁতুলতলার পূজোটা এখন ডিফেন্স পার্টির এক্তারে পড়েছে! ওরা ফি বছর তিন মাথার মোড়ে 'বাণী অর্চনা'র সাইন-বোর্ড লট্‌কায়। এবার, পুকুরপারের ছেলেদের নতুন ক্লাব 'মিলনী' 'বাগ্‌দেবীর আবাহন' ফেস্টুন ঝুলিয়ে দিয়েছিল কদিন আগে। ডিফেন্স পার্টি ফেস্টুন আজ টাঙিয়েছে এমনভাবে যাতে মিলনীরটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এই নিয়ে দুদলে ঝগড়া বেধেছে। এরা বলে, 'এ জায়গায় আমরা এস্তক-লাগাৎ ফেস্টুন দিচ্ছি এটা আমাদের জায়গা,— ওরা বলে, 'ওসব আমরা জানি না, আগে আমাদের কাপড় টাঙানো হয়েছে, জায়গা ত আর কারো কেনা নয়। আকাশ-বাতাস কি কেউ ইজেরা নিতে পারে!'

কোথাও কিছু নেই, উড়ো ঝগড়া!

আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম—তা শেষ পর্যন্ত কি হল?

'কি আর হবে! কেউ কারো গোঁ একরত্তি ছাড়তে রাজী নয়। এই ত হয়েছে আজকালকার দস্তুর। পূজোর নামে হৈ হৈ। কোন এক বড় সাহিত্যিক বলেছিলেন, সরস্বতী পূজো ত নয়, ইলেকট্রিক পূজো। মাইক, আলোর মেলা, আমোদ-প্রমোদ—এইসবই হবে। তা হোক, কিন্তু এখন হয়েছে আত্মপ্রচারের ধুমধাড়াক্কা। ওরা আত্মপ্রচার করবে আর তোমরা চাঁদার নামে ট্যাক্সো দাও! ধুত্তোর—!'

বোল্টু এমনি মিচকে যে, এক সময়ে বাপের কাছে আর্জি করে পূজোর পক্ষে রায় আদায় করে নিয়েছে। আমি আগে টের পাই নি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ওরা যখন বেরুচ্ছে তখন জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, পাড়াতে এক ঘর কুমোর এসে এতদিন ধরে এতগুলো ঠাকুর বানিয়েছে—ওদের সাপোর্ট করা দরকার। নইলে শিল্পী জাতটাই মরে যাবে কোনদিন।

কথাটা ওঁর। উনি পূজো করবার পক্ষে শিল্পীর দিক দ্যাখেন, আমি পূজো করি ভক্তির বশে, আর কেউ কেউ আমোদ-প্রমোদের জন্যে পূজোয় মাতে। গোলেমার্লে পূজোটা ঘটেই যাচ্ছে। ভগবান এ সবই কি তোমার লীলা—ঠিক করে বলো তো?

সত্যিই যদি আমাদের বাড়ি মূর্তি এনে পূজো করা হয় তবে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশী হবো। খরচ, খাটুনি সবই হিসেব ছাড়িয়ে যাবে বটে। এর পর শরীরও খারাপ হবে, তা জানি, তবু আমি চাই মা সরস্বতী আসুন আমাদের ঘরে।...এই সময়ে জগ্‌নার মা যদি ভালো থাকত তাহলে ওকে দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যেত।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মনে মনে হিসেব করতে লাগলাম—কি ভাবে কি করা যায়! পুরোহিত মশাইকে খবর দিতে হবে। ঘরকন্নার জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। খই ভাজবো, না, কেনা হবে। ননদের কাছে ওঁকে একবার পাঠানো চাই—আসুক না-আসুক, আমাদের দিক থেকে ত্রুটি যেন না থাকে।

হাতের সেলাইটা রেখে দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছি ওঁরা কখন

ফেরেন। কাজ ত একটা নয়। উনি মানুষটি মজাদার—এখন ওদের সঙ্গে নিজেও নাচছেন, কিন্তু পরে যত খুঁৎ-ভুল সব কিছুর জন্যে আমাকেই দায়ী করবেন।

ভগবান তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই—ওঁর আগের মনটা ফিরিয়ে দাও আর একটু সচ্ছলভাবে যাতে আমাদের চলে তার ব্যবস্থা করে দাও! এইটুকু পেলেই তোমার কাছে আর কিছু চাইব না। দাও-দাও, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, ওরা যেন যশ পায়, ওদের যেন তোমাতে মতি থাকে, ওরা যেন মানুষের মতো মানুষ হয়—এই—ব্যাস—এইটুকুই চাই। আর বেশিকিছু চেয়ে তোমার কাছে নিজেকে খেলো হ্যাংলা করব না।

এ কদিন আর তোমাকে চিঠি লিখতে সময় পাবো না ভগবান, আবার সরস্বতী পূজোর পর—! সরস্বতী পূজোর কাজ, আর উনিও বাড়িতে থাকবেন—কখন সময় পাবো বলো! তুমি ত বোঝো সবই।

৪

কটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পাই নি—নিজে আছি কি নেই সেটুকু পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে তোমার কথা মনে করি এমন ফুরসুত কোথায় বলো ভগবান। আজ অবিশ্যি সকাল থেকেই হাতের কাজ অনেক হাল্কা, তার সঙ্গে মাথার অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। পর পর কটা দিন ছেলেমেয়েদের ছুটি গেল, সেই সঙ্গে ওঁরও তিনদিনের ছুটি —কাজেই আমার ত ছুটোছুটি, দোড়-ঝাঁপ বাড়বেই। না, তার জন্যে আমি একটুও বেজার নই, খাটতে আমার ভালোই লাগে—সবাই আসুক, আনন্দ করুক, এ ত আমিও চাই। আমি নিজের গতর দিয়ে খেটেখুটে সবার মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই বেশ ভালো থাকি। সত্যি, ছিলামও তাই—! আর এই যে আজ—যে-যার কাজে ব্যস্ত, আমার হাত ফাঁকা—অমনি রাজ্যের আজে-বাজে ভাবনা এসে জুটল, আর সে সবের হাত থেকেই রেহাই পাওয়ার জন্যে ভগবান তোমাকে ডাকাডাকি করছি।

হাসছ তুমি? আজে-বাজে চিন্তা, দুঃখ-দুর্বিপাক, এসব ফ্যাসাদে না পড়লে তোমাকেও মনে পড়ে না—তাই ভাবছো!

শোনো, শোনো একটা কথা। তাহলে শুরু করি সরস্বতী পূজোর দিন থেকেই—আমাদের এ শহর থেকে তুমি নাকি পালিয়ে গিয়েছ! সরস্বতী পূজোর দিন সন্ধ্যেবেলা ওঁর সঙ্গে একটু বেরিয়েছিলাম। ছেলে-মেয়েগুলোর কিছুতে কি ক্লান্তি আছে? সারাদিন বাড়িতে, পাড়ায়, স্কুলে, ক্লাবে হৈ-হৈ করেছে—এর পরও সহরময় ঠাকুর দেখার হুজুগ তুলল। তাই উনি বললেন, 'তুমিও চলো না!'

বাইরে বেরিয়ে মাথা খারাপ হবার দাখিল। থৈ-থৈ করছে লোকে লোকে পথঘাট, বাসে ওঠার উপায় নেই, রাস্তার দু-ধারে মাইকের মচ্ছিমলম, ঢাক ঢোল, কাঁসরঘন্টার উৎকট আওয়াজে কান ঝালাপালা। কোথায় পালাই কোথায় পালাই—বুকের ভেতরে কেমন আনচান করছে। ওঁকে অগত্যা বললাম হ্যাঁগো, সব জায়গাই এই রকম নাকি ?

'তা, কতকটা তাই।'

--তবে আমি বাড়ি যাই, তোমরা ঠাকুর ছাখো গে--

নন্টু অমনি আঁচল চেপে ধরল, 'না, না, সে হবে না। তুমি না গেলে আমার একটুও ভালো লাগে না। চলো না মা। কতো সুন্দর সুন্দর সরস্বতী দেখবে।'

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললাম—তুমি ত জানো বাবা, আমার পায়ে ব্যথা। বেশি হাঁটলেই কাল বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। আর তুমি দেখে এসে গল্প করো তাহলেই আমারও দেখা হয়ে যাবে। কেমন, সোনা ছেলে—যাও—এঁ্যা !

একেবারে ওঁর স্বভাব পেয়েছে এই ছেলেটা, একবার যেটা গোঁ ধরবে সেটা কিছুতেই ছাড়বে না! বেঁকে বসল। শেষে আমি বললাম--বেশ তাহলে চলো, যাচ্চি।

তিন-পা গিয়ে হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠল নন্টু। --কি ? কি হল রে! অমন করে কাঁদছিস কেন ?

'না, না, আমি যাবো না ত! ওমা আমি যাবো না, তোমার পা ব্যথা করবে।'

শেষে উনি বিরক্ত হয়ে ছেলেটাকে পথের মধ্যে মারধর করবেন, এই ভয়ে নন্টুকে চোখের ইশারায় চুপ করতে বললাম। চোখ মুছল নন্টু। দুই মেয়ে সব আগে, ওদের পরেই বোল্টু ওঁর হাত ধরে বকতে বকতে যাচ্ছিল। নন্টুর কান্নায় বোল্টু নাক কুঁচকে বলল—'রাস্তায় বেরিয়ে ছোট ছেলের মতো কাঁদছিস নন্টু! এ-মা -'

আমার পায়ের ব্যথা বাড়বে অতএব নন্টু আর এক-পাও গেল না।

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা দুজনে বাড়ি-ফেরা সাব্যস্ত করলাম। উনি হতাশভাবে বললেন—'তাহলে এক কাজ করো। অমিয়দের বাড়িতেই থাকো। ওখানে আজ গানটান হবে। আমরা বরং ফেরার পথে ডেকে নেবো তোমাকে।'

ওঁর বন্ধু অমিয়বাবু, আর বেলা আমার—অমিয়র স্ত্রী হবার অনেক আগে থেকেই বেলার সঙ্গে আলাপ আমার।

ওরা থাকে বেলগাছিয়াতে। গানবাজনার আসর কোথায়! বেলা যখন মুখ ভার করে দরজা খুলল তখন অতোটা বুঝি নি—পরে টের পেলাম ওর মেজাজ খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অমিয়র আজ স্পেশ্যাল ডিউটি পড়েছে। হঠাৎ! আগে থেকে বলা-কওয়া নেই, কাল রাতে তলব এল—কী! না, রুশ-প্রেসিডেন্ট ভরোশিলফ আসার দরুন অমিয়কে ছুটির দিনও হাজ্‌রে দিতে হবে।

বেলার মেয়ে রিনির সঙ্গে নন্টুর খুব ভাব। রিনিকে ও এ্যায়সা আদর করে যে মেয়েটা চটে গিয়ে কামড় দেয়, চড় মারে, তবু নন্টু কিছু বলে না। রিনি বয়সে ছোট ত কাজেই নন্টু হেসে উড়িয়ে দেয়। আজ রিনি ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে নন্টু উস্‌খুস্‌ করছিল। বেলা বলল—'মেয়েটারও শরীর খারাপ করেছে। ঠাকুরপোটাও হয়েছে ছেলেমানুষের হদ্দ। সেই সকাল নটা থেকে বেলা বারোটা অবধি ঠায় রোদে ওকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রোদ লেগেছে!'

বেলাদের বাড়ি যশোর রোডের ওপর, এখান দিয়েই আজ সকালে রুশ-প্রেসিডেন্টের যাবার কথা ছিল। বেলা নটা থেকে দশ হাত অন্তর খাকী-পোশাক, হাতে বেঁটে-বেঁটে লাঠি নিয়ে পল্টন খাড়া দাঁড়িয়েছিল। ওদের এই এক সুবিধে কলকাতায় কেউকেটা কেউ এলে ওদের দিব্যি দেখা হয়ে যায়।

নন্টু বলল—'কেমন দেখতে গো মাসিমা?'

'কে? ও, ভরোশিলফ!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! সায়েবদের মতো?'

'হ্যাঁ রে পাগল ! সাহেবই ত।'

'কি বলল !'

'তোর সঙ্গে বকুনিতে পাল্লা দেওয়া আমার কম্মো নয়। সে পারে রিনি।'

'রিনি দেখেচে ?'

'হ্যাঁ, রিনি ত দেখেচেই, ওর মেয়ে মনাও দেখেচে।'

রিনির একটা চমৎকার ডল পুতুল আছে। ওর মুখে-ভাতের সময় কে যেন দিয়েছিল। পুতুলটার নাম মনা। মনা কখনো বেলুন চায়, কখনও বা সন্দেশের জন্যে মনা বায়না ধরে। রিনির যা-যা ইচ্ছে মনার মনে তাই ঝোঁক হয়ে দেখা দেয়। আজ রুশী অতিথিদের দেখার দরকার হয়েছিল মনার। কাকার কোলে চড়ে রিনি, আর রিনির কোলে মনা—দুজনে খুব হাত নেড়ে অতিথিদের আদর দেখিয়েছে। সিনেমার ছবি-তোলা লোকেরা গাড়ি থেকে ওদের ছবি তুলে নিয়েছে আর খুব হেসেছে। বেলার মুখে গল্প শুনে ভাবলাম, সেই সময় যদি আমার নণ্টু এখানে থাকত ওরও ছবি উঠিয়ে নিত ত !

বেলার গল্প আর ফুরোয় না—'জানো ভাই, আজ দেখি আমাদের এই পথে ভোরবেলা ব্লিচিং পাউডার ছড়াচ্ছে। অন্যদিন ভুলেও কেউ ওসব করে না। বেলা এগারটা নাগাদ কতগুলো গরু রাস্তায় ছুটোছুটি শুরু করল, পুলিসের গাড়ি থেকে হোমরা-চোমরা কেউ হবেন তিনি খুব বকাবকি করছেন, গরুগুলিকে গলিতে ঢুকিয়ে দাও ! ভেটেরিনারির সামনে একটা মরকুটে বাছুর বাঁধা ছিল সেটা জুল্ জুল্ করে দেখছিল। ও তো এরকম কাণ্ড বাপের জন্মে দ্যাখে নি।'

—তা লোকজন কেমন হয়েছিল ?

'বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়তে লাগল। তবে সেবারের মতো মানে সেই যে বুলগানিন যখন এসেছিল, তখনকার সিকির-সিকিও হয় নি। সেবার গাছের ডালে ডালে, পাঁচিলে সারবন্দী, মাথায় মাথায় গিজ্‌গিজ্‌—! আচ্ছা দিদি, বুল্‌গানিনের কি হলো ?'

এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান বেলার চেয়ে বেশি নয়। তাই বললাম, —তোদের খেতে-দেতে বেশ বেলা হল ত ?

'হ্যাঁ! আজ আবার আমার বোনকে নিয়ে বাবার আসার কথা ছিল। বেলা একটার সময় ওঁর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে খবর দিয়ে গেল যে, বাবা মাঝ-পথ থেকে ফিরে গিয়েছেন। গাড়ি বন্ধ বলে! পথে কোথা থেকে ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিতে বলেছেন। এই হয়েছে ফ্যাচাং, বড়লোকের দেশ ত এটা। কেউ এলেই গরীবের চলাফেরা বন্ধ!'

বেলার কথার মধ্যেই উনি এসে হাজির. বললেন—'আর কোনো একটা পূজো-পার্বণ হলে গরীব-বড়লোক সবারই অবস্থা অচল।'

ওঁরা মাঝ-পথ থেকে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। কোনরকমে হাতীবাগান পর্যন্ত গিয়ে আর এগোতে পারেন নি। ওখানকার পথে পা-বাড়াবার ঠাঁই নেই। ঠাকুরপূজো আশে-পাশে চলছে। আর পূজোর ভিড়ের মধ্যে চ্যাংড়া ছোকরার দল নির্লজ্জভাবে নাকি বেছে বেছে মেয়েদের গায়ের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ছে। আর যা করছে তা মুখে উচ্চারণ করতেও আটকালো ওঁর। যে কথা মুখে বলতে আটকায় সেই কাজ স্বচ্ছন্দে যারা করছে তারা আমাদেরই কারুর ছেলে অথবা ভাই কিংবা অমনি কিছু হবে ত! ভগবান তুমি কি সত্যিই আছো? পূজোর মণ্ডপে যদি এইসব চলে তবে কি বুঝব? তুমি এদের ভয়ে পালিয়েছ। তুমি না হয় পালালে, কিন্তু মানুষ—একটা মানুষও সেখানে ছিল না, নাকি!

আমার স্বামীও পালিয়ে এসেছেন—কেন? না, ভদ্দরলোক! কোনো ভদ্দরলোকেরই নাকি এ-সব ইতরামির ভেতরে থাকা উচিত নয়, তাই উনি ব্যাপার-স্যাপার দেখে সরে পড়েছেন।

রাগে আমার মাথা গরম। মুখে কিছুই বলতে পারি নি, কেননা সেই সময়ে বেলা বলল—'কাল দিদি তোমার বাড়ি যাবো শেতলষষ্ঠী করতে। আমাদের ত গোটাসেদ্ধ হয় না।'

ওর কথার জবাব দিলাম—এবার ত ষষ্ঠী হল বুধবারে! সরস্বতী পূজোর পরের পরদিন। তুই তাহলে পরশু আসিস, কেমন।

বেলা অবাক হয়ে গেল। ওসব কিছু খবর রাখে না। ওর বাড়িতে পূজো হয় না, পূজোর দিনে গান-বাজনা হয়। ষষ্ঠীর দিনে ও আমার বাড়ি ছোটে লক্ষণটুকু বজায় রাখতে। ওই বা কেন, এমনিই ত আজকাল শহর-বাজারে ঘরে ঘরে হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবু কি এদের একটু হুঁশবুদ্ধি দিতে ইচ্ছে করে না তোমার, হায় ভগবান!

কাল সরস্বতী পূজোর ভাসান গেল—গোটাসেদ্ধ করলাম। উনি মাইনের টাকা নিয়ে ট্যাক্সি করে ফিরলেন, বেশ রাত হয়েছিল। আমি একটু চিন্তায়ই পড়েছিলাম। মাইনের দিন উনি একটু তাড়াতাড়িই ফেরেন কিনা। এলেন যখন মুখখানা জাহাজডুবি হওয়ার মতো থমথমে। খেতে-বসে বললেন যে, বদ্‌লি করে দেবে বলে তলে-তলে ব্যবস্থা হচ্ছিল, বড়কর্তার সঙ্গে এই নিয়ে বচসা হল একচোট।

আজ সকালে উনি আমায় ডাকলেন। 'ছাখো-ছাখো রাশিয়ার মেয়েরা কি বলছেন।'

—কি বলছেন?

'এই ছাখো, কাল ওঁদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে তোমরা, মানে, আমাদের দেশের মেয়েরা বলেছেন যে, রাশিয়া আর ভারতের মধ্যে হাজার-হাজার মাইল ব্যবধান থাকলেও কিস্যু এসে যায় না, নারীত্বের বন্ধনের দিক দিয়ে সবাই সমান।'

—এ কথার মানেটা কী?

'মানে? সেটা বুঝতে হলে মাদাম ফুৎসেবার কথাটা শুনে নাও। উনি বলছেন: সোবিয়েতে মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৫২ জনই মেয়ে। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শতকরা ৮২ জনই হচ্ছে মেয়ে।'

ওঁর এক-একটা কথা এই রকম হেঁয়ালি! শুনে হাড়-পিত্তি জ্বলে

যায়। আচ্ছা, আমাদের সমাজের মেয়েরা যে ঘরগেরস্থালির কাজ নিয়ে থাকে—এজন্যে কি শুধুই মেয়েরা দায়ী? সুযোগ পেলে আমরাও সব কাজ পারি। এই যে আরতি সাহা, যাক গে ওঁর সঙ্গে বসে তর্ক করলে আমার চলবে না বলেই জবাব না-দিয়ে রান্নাঘরে রওনা দিলাম।

আজ একটুও ঘুমোতে পারছি না। ঘুম আমার আর হবে না। যতদিন বাঁচব ততদিন এই উনিশশো ষাট সালের সাতই ফেব্রুয়ারি তারিখটার কথা ভুলতে পারব না। আর বোধ হয় তোমাকেও ক্ষমা করতে পারব না ভগবান। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন বলতে পারো?

এখনো 'গঙ্গাজল'-এর বুকফাটা কান্না দশ মাইল দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। আমি যে মা! মায়ের বুকের ব্যথা তুমি কি বোঝো না? যদি বোঝো তবে কেন চোদ্দ বছরের ছেলেটাকে এমন করে কেড়ে নিলে! কি লাভ হল তোমার? গঙ্গাজল এখন কি নিয়ে বাঁচবে, বলতে পারো? বাপ-মায়ের কত্তো স্বপ্ন—এক টানে উপ্‌ড়ে ছিঁড়ে নিলে।

জীবনে চোখের ওপর মৃত্যু দেখেছি দু-বার। দুজনেই গুরুজন। কষ্ট পেয়েছি, কেঁদেছি—কিন্তু এমন আতঙ্ক আমার জীবনে এই প্রথম। আমি ত জানি গঙ্গাজল ওই ছেলেকে কী কষ্টে তিন-তিনবার যমের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল। তখন ও ছোট ছিল—যদি নেবেই তোমার মনে ছিল তবে কেন তখন নাও নি! ওরা বাবা-মা দুজনে সব শখ-সাধ ভুলে, কেবল ছেলেকে মানুষ করছিল। আর ছেলেও ছিল হীরের টুকরো—যেমন লেখা-পড়ায়, তেমনি কথাবার্তায়। এমন মিষ্টি ছেলে কজনের হয়! আহা-হা।

এই বোধ হয় শুরু হল শোক পাওয়া। কে জানে, কখন হঠাৎ কাকে তুমি কেড়ে নেবে। গঙ্গাজলের না হয়ে যে-কোনো মায়ের কপালেই ত এই বাজ পড়তে পারে।

চোখের সামনে আজকের সন্ধ্যেবেলার সবকিছু ভেসে উঠছে।

গঙ্গাজল আছড়ে-আছড়ে পড়ছে, ওকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না। নিজের বুকের ভেতরে কান্না তালগোল পাকিয়ে নিঃশ্বাস আটকে দিতে চাইছে। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখে জল পড়ছে। বলতে গেলাম, যে গেল, সে ত আর ফিরবে না! যারা রইলো তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শক্ত কর ভাই। ওদের কথা ভাব।··· কিন্তু পারছি কই বলতে।

আর একটা ব্যাপার দেখলাম, তোমার কাছে বলেই মন খুলে স্বীকার করছি—এই যে আমি গঙ্গাজলকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, আমি নিজে যেন অপরাধী। কি আমার অপরাধ? দুর্ভাগ্যটা ওর কপালে এলো আমার কপালে না এসে?···যে মূহূর্তে এই কথাটা টের পেলাম সেই থেকে বুকের ভেতরে আনচান্ করতে লাগল--কখন বাড়ি ফিরব। আমার নন্টু এখন কি করছে···। অন্যের মনেও কি এরকম কিছু হয়? তুমি অন্তর্যামী, তোমার অজানা কিছুই নেই! আমি কতো দুর্বল, কতো স্বার্থপর—ছি, ছি।

বাড়ি ফেরার পথে উনি অনেক বড় বড় কথা বললেন, মানুষের সহ্য করার শক্তিটাই নাকি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। মৃত্যু আছে, আঘাত আছে, আরো কতো কথা।

গঙ্গাজল বড় ভালো মেয়ে। তাই দুঃখু হয়, মনে হয়, ভগবান তুমি বড় অবিচার করো। কেন? সেদিন একজন লেখক বলছিলেন, তাঁর কাছে একটি বকাটে ছেলে চিঠি লিখেচে—'আপনাকে আমি ভক্তি করি। আপনার লেখা আমি পূজো করি। সিনেমাতে আপনার 'গল্পর' ছবি এলেই তা দেখি। আমার জীবনের আদর্শ আপনি। দয়া করে আমাকে এমন আশীর্বাদ করুন যাতে পরীক্ষায় পাস করি। আপনার আশীর্বাদই আমার একমাত্র ভরসা। পড়ার বইয়ের একেবারে পাতা উল্টাই নি। আপনার পায়ে পড়ি, আশীর্বাদ করুন যাতে পাস করি। পাস না করলে, আপনার কাছে যাবো, কোনো ফিল্মে

নামিয়ে দিতে হবে।'…এসব ছেলে ঠিক বেঁচে থাকবে—পরীক্ষায় পাস করুক বা না-করুক। আমি মা হয়ে, কখনোই এদের বাবা-মায়ের দুর্ভাগ্য কামনা করব না। আমি বলছি তুমি কেন গঙ্গাজলের ছেলেটাকেও বাঁচিয়ে রাখলে না, ভগবান। হয় এমন কারো যাতে ওর মতো ছেলে ঘরে ঘরে হোক, নইলে যে দু-চারটে ভালো ছেলে হচ্ছে তাদেরও বাঁচতে দাও। নইলে আমাদেরও ডেকে নাও। অন্ততঃ আমাকে— !

নাঃ, আজ আর ঘুম আসবে না।…ছোট্ট নরম হাতে নণ্টু আমার গলা জড়িয়ে ধরতেই চমকে উঠলাম—আচ্ছা আমি যদি না-থাকি তাহলে নণ্টুর কি দশা হবে !

ওর কপালে চুমো খেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দিলাম। তোমার যা খুশী করো, আমি আর ভাবতে পারি নে। তোমার কাছে আর কিছুই চাইব না, শুধু এইটুকু করো যাতে আমার গঙ্গাজল শোকটা তাড়াতাড়ি সামলে উঠে। ও বড় ভালো মেয়ে।

৫

আচ্ছা, তোমার কখনো জ্বর হয়েছে ভগবান? ঝিম্‌ঝিমে দুপুরে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে সময়টা যেন আর কাটতেই চায় না। চোখ বুজে থাকা যায় কতক্ষণ—যদি ঘুম না আসে। হাত-পা চিবোচ্ছে। জ্বর বোধহয় আরও বাড়বে আজ। কাল ত একরকম ওঁর চোখকে ফাঁকি দিয়েই সংসারের সব কাজ চালিয়েছি। আজ ধরা পড়ে গিয়ে একটু মুস্কিল হয়েছে। লোকটা আস্ত পাগল ত! নিজের মুরোদ কিচ্ছু নেই। মাঝখান থেকে মেজাজ খারাপ করে, ছেলেমেয়েগুলোর ওপর এন্তার তম্বি চালাবে। এদিকে আমার ওপর কড়া হুকুম 'তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো।' আচ্ছা, শুয়ে থাকলে চলে?

এই কথা যদি মুখে উচ্চারণ করি ত উনি হাতে আঙুল ঠুকে বলবেন—'নিজেকে এতখানি দামী না-ই ভাবলে? সংসার ঠিকই চলে যায়। যখন আমি না থাকব তখনও চলবে—তুমি যদি না থাক তাহলেও সংসার ত বসে থাকবে না।'

এ কথা শুনলে মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। মনে হয়, যাদের জন্যে এত করি তাদের কাছে এ-ই আমার মূল্য! বেশ, আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমাদের চলে তবে তা-ই হোক। আমি শুয়েই থাকব। কুটো কেটে দুখান করতে আমার বয়ে গেছে।···বিয়ের পর প্রথমদিকে আমার অসুখ করলে উনি আপিস যেতেন না। বলতেন, 'তোমাকে দেখবে কে!'···তখন উনি অনেক কাজ করতে পারতেন। আমি রাগ করে শুয়ে থাকলে দুধ-সাবু এনে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করতেন। তখন বোধ

হয় শরীরে আমার রাগটাই বেশি ছিল। মুখের ওপর জবাব দিতাম—সংসারের আমি কেউ নই! আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না, ভাবতে হবে না—বাঁচি-মরি তাতে কার কি এসে যায়!

আগের মতো আমি বোকা নেই। উনি ওঁর মতো বকেন, আমি চুপ করে শুনে যাই। মা বলতেন, 'বোবার শত্রু নেই।' তা কথাটা খুব মিথ্যে নয়। এই যে আজ সকাল থেকে ওঁর বকুনি লাফানি চলল, কাটা-কাটা বাঁকা কথার তুবড়ি ছুটল—একটি কথার জবাব দিই নি, মুখ বুজে নিজের কাজ করে গিয়েছি। আরে বাপু, যতক্ষণ পারি ততক্ষণ ত করি। তারপর, যখন পারব না, তখন শোয়ার জন্যে কারুর বলবার দরকার হবে না। এত অল্পে এলিয়ে পড়লে কি গেরস্তর চলে! ফ্যাসাদ হয়েছে যে, আমার রাতদিনের কাজের-মানুষ জ্ঞানদা দেশে গিয়েছে——এখন জগনার মা দুবেলা বাসন-মাজা ঘর-মোছার কাজটুকু করে দিয়ে যায়। এই ত জগনার মা—কোলে ওর কাঁচা ছেলে, এখনো একমাস হয় নি। ওতো নিজের ঘর-কন্না সামলে আমার বাড়িতে ঠিক কাজ সামলাচ্ছে! বসে থাকলে যেমন ওর চলে না, তেমনি আমারও চলে না।

আপিস যাবার সময় উনি বলে গেলেন—'ডাক্তারকে খবর দিয়ে যাচ্ছি। আর ছাখো, ওবেলা যদি উনুনের ধারে-কাছে গিয়েছ ত, হাঙ্গার স্ট্রাইক করব।'

হেসে বললাম—আরে বাবা এখন সিজ্‌ন চেঞ্জের সময়, সর্দি-জ্বরে ডাক্তার ডাকার দরকার হবে না। আমি ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়েছি। আর রান্নার কথা বলছ—এ বেলাই তরকারি বেশি করেছি, খানকয়েক লুচি শেষ আঁচে ভেজে রেখে দেবো। ব্যস—!

'কি খাবে?'

—খেতে ইচ্ছে করছে না! দুখানা—

'উঁহু, টোস্ট খাওয়ার মতলব ছাড়। স্রেফ দুধ-সাবু।'

চুপ করে থাকাই ভালো। আগে থেকে বন্দোবস্ত না থাকলে, দুধ

কোথায় পাবো! নণ্টু-বোণ্টুর মুখের আহার কেড়ে আমি বুড়ো-মাগী খেতে পারি?

উনিও বেরুলেন আমিও বিছানা নিলাম রান্নাপাট চুকিয়ে।

বড় মেয়েকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। ও ঘরে ওরা দুবোনে পড়াশুনো করছে—সামনে ওদের পরীক্ষা। এ মাসে অনেক টাকা ওদের পিছনে খরচ আছে। দুমাসের মাইনে, পরীক্ষার ফি—ছেলেদেরও তাই! কোথা থেকে যে কী হবে! গত মাসে ত একশ টাকা ধার হয়েছে। এ মাসেও যদি ধার পড়ে—না, না এ আমি ভাবতে পারি না। বাঁধা মাইনের চাকরিতে আয়ের হিসেব ত কলসীর জলের মত।

নমিতা আমার গায়ে ঠেলা দিতে চমকে উঠলাম। —কি? অমন ধাক্কা দিচ্ছিস কেন?

'ডাকলে যে –'

—ও, হ্যাঁ, ছাখ একটু চেপে ধর ত? বড্ড কাঁপুনি লাগছে। লেপ —লেপটা চাপা দে বাপু!

বেচারি হয় ত ঘাবড়ে গিয়েছে। ডাক্তারের বাড়ি যেতে চাইল, বারণ করলাম। নণ্টু এসেছে টিফিনে, নমিতাকে আমার পাশে বসে দেখে হুমকি দিল—'এ্যাই দিদি, ওখানে কেন? মা—'

তারপর গলা জড়িয়ে ধরে বলল –'তোমার সত্যি সত্যি অসুখ বাড়ল যে মা!'

—হুঁ!

'সকালে আমি বললাম বলে?'

—কি আবার বললি তুই!

'ওই যে বললাম, তোমার অসুখ-অসুখ বলা শখ হয়েছে। তাই বুঝি ভগবান—'

এরপর ওর চোখ দিয়ে আমানি ঝরবে। তাড়াতাড়ি সেটা এড়াবার জন্যে বললাম—অমন করে আমাকে জড়িয়ে ধরো না, আঃ ছাড়ো –গায়ে বড্ড ব্যথা!

ইনফ্লুয়েঞ্জা বড় ছোঁয়াচে, কী জানি ছেলেটা । ওকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

এরপর বিকেল হবে। ঘর-দোর গোছগাছ করা, ছেলেমেয়েগুলোর জল-খাবার দেওয়া, ওঁর আপিসের পর ফেরা পর্যন্ত কি করে যে কি হবে! আলমারির ভেতর থেকে বাঘ, ভালুক, খরগোস, ডলপুতুলগুলো—আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। ওগুলো সব নন্টুর ভাতের সময় পাওয়া। আচ্ছা ভগবান, যদি আমার এ জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা না হয়ে অন্য কিছু হয়!···

কী খুব হাসছ ত! আমার সর্দি-জ্বর সেরে গেছে, তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে তোমাকে লেখার সময় ন্যাকামি করে চিঠি লিখছি—এইসব ভাবছ? জ্বরের কদিন নন্টুকেই পড়াতে পারি নি, তা তোমাকে লিখব কি! আজ দুটি ভাত পড়েছে পাঁচ দিন পরে। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে তাই কদিনের খবর গুছিয়ে লিখতে বসেছি।

ভাগ্যে তেমন কিছু হয় নি! কপাল ভালো, তাই অল্পের ওপর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছি। পাড়ু করে ফেললে কী হাল হত ছেলেমেয়ে-গুলোর আবার সামনে পরীক্ষা আসছে। উনি কেবল সাবধানে থাকতে বলেন, একটু দুধ খাওয়ার কথা, নিয়মমত সময়ে খাওয়া-দাওয়ার কথা পই-পই বলেন—তা সে সব ত হয়ে ওঠে না। এই সব অসুখ-টসুখের সময় ভাবি, ওঁর কথাগুলো মেনে চলা উচিত। একলার সংসারে একটু হিসেব করে সব দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। তা পারি কই! এই হল আমাদের দোষ। সব জানি, সব বুঝি, তবু যেভাবে চলা উচিত সে রকম চলি না। যে সংসারের জন্যে এতো চিন্তা সেই সংসারের জন্যেই নিজের দিকেও তাকাতে হয় এটা কেন ভুলে যাই!

লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হল কিনা, আমার এই একরত্তি সংসার, কদিন পড়ে থাকলে, পরে তার ধাক্কা সামলাতে পারি না—আর তোমার ঘাড়ে ত গোটা দুনিয়ার বোঝা চাপানো, তোমার যদি অসুখ করে!

জগনার মা এক মুঠো কচি নিমপাতা হাতে করে আনল। মুখে

কিছু রুচছে না কিনা, তাই শুনে ও এগুলো এনে দিল। এক গাল হেসে বলল—'বৌদিদি, নিমবেগুন করো—!'

আশ্চর্য মানুষটা। ও ত এ সংসারের কেউ নয়, অথচ আমার জন্যে এত ভাবে! নাঃ, ওর বাচ্চার জন্যে দুটো জামা আজ-কালের মধ্যেই করে দিতে হবে। ওর স্বামী সংসারের দিকে ফিরেও চায় না। কিন্তু ও একাই সব দিক সামলাচ্ছে—রোজগারও যতটা পারে গতরে খেটেই করে।

মেসিনে বসবার আগে খবরের কাগজে একটু চোখ বুলোই—লেখাপড়া বলতে এখন এইটুকুতে এসে ঠেকেছে। হ্যাঁ, সব আগে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখা অনেক কালের অভ্যেস। আজ শুক্রবার নতুন ছবির খবর দেখলাম। তারপরই যে খবর দেখলাম তাতে চোখ কপালে উঠল।...বারো বছরের ছেলে পকেট মারতে শিখেছে। শুধু শেখাই নয়, দস্তুরমতো ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। দুমাসের মধ্যে আশিটা পকেটের ওপর সিদ্ধিলাভ। উঃ, কী সাংঘাতিক কথা! এ ছেলের কি হবে? সিনেমা দেখার ঝোঁক থেকেই পকেটমারার অভ্যেস করে ফেলল। বাড়ি থেকে পালালো।

দোষ কার? ছেলের! না, তার মা-বাপের! নাকি, আজকের দিনের আকাশ-বাতাসের? না, না, এ যে ভাবাই যায় না।

ভাববার অবকাশ রাখে নি—দস্তুরমতো খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে যে! তবে একটা কাজ একজন অবিশ্যি খুব ভালো করেছেন—সে ওই ভদ্রলোক, যাঁর পকেট মারতে গিয়ে ছেলেটি ধরা পড়েছে, তিনি বিবেচনা করে ছেলেটিকে জেল-হাজতে না পাঠিয়ে ওকে ওর মা-বাপের কাছে ফিরিয়ে দেবার কথা বলেছেন পুলিসকে। ছেলেটা পুলিসের কাছে নিজের সব দোষ স্বীকার করেছে।

এরপর ওর মা যদি চেষ্টা করেন, তাহলে হয়তো ছেলেটি মানুষ হতে পারে! হাজার হোক, ছেলেমানুষ ত, মনটা এখনো নরম আছে। ওরদিকে নজর দেওয়াটাই দরকার। ছেলেমেয়েদের দিকে বাপ-মা নজর না দিলে তার ফল ভালো নাও হতে পারে। বাইরের পরিবেশ

থেকে তাকে যতটা পারা যায় দূরে রাখতে হবে। না, না, তা বলে কি ঘরে বন্দী করে রাখা ? তা নয়। তবে তাদের একা-একা কোথাও ছেড়ে না-দেওয়া।

এই সব ভাবছি এমন সময় বেলা এসে হাজির। কি ব্যাপার ? আমার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছে। আমাদের রাতের রান্নাটা বেলা করে দিয়ে যাবে বলে রিণিকে তার মাসীর কাছে রেখে এসেছে। হেসে বললাম—এ যাত্রা আর দরকার হবে না।

জমিয়ে বসল বেলা। বলল—'জানো দিদি, এর মধ্যেই শিমূল ফুল ফুটতে শুরু করেছে।'

বেলা এখনো শিমূল ফুল ফোটার খবর রাখতে পারে। আর আমি—! দুঃখ হল নিজের জন্য।

সেই পুরনো আমিটা কোথায় গেল ! আমিই এককালে বেলাকে খবর দিতাম শীতের সময় কবে আমগাছে মুকুল এল, কোন গাছে সজনে ফুল বোঝাই হয়ে গেল, শিমূল আমার প্রিয় ফুল—দূর থেকে দেখতে বড় সুন্দর। কেন যে একে কবি গন্ধ নেই বলে শিমূলের নিন্দে করেছেন জানি নে। তবে হ্যাঁ, এই সময়ে সবচেয়ে মনে রাখার মতো ফুল হল বাতাবিলেবুর ফুল। গঙ্গাজলেরও এই ফুলটা খুব প্রিয়। হঠাৎ গঙ্গাজলের কথা মনে পড়ে গেল, ওর চৌদ্দ বছরের ছেলেটি নেই। ভগবান তুমি ওকে শোক ভুলিয়ে দিয়ো। আর সেই ছেলেটি যে তিন মাস পরে মা-বাপের কাছে ফিরে গেল—তাকে সুমতি দিয়ো।

একটা প্রশ্ন মনে উঠতে চাইছিল—ছেলেটির মা বেঁচে আছেন ত ? কিন্তু সেটা না ভাবাই ভালো।

ভাবছো, তোমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিজে হালকা হতে চাইছি—মোটেই তা নয়, আমার ক্ষমতায় না কুলোলে পরে তোমার দ্বারস্থ হই—নইলে শুধু শুধু কাউকে বিরক্ত করা স্বভাব আমার নয়।

আঁচল থেকে দশ টাকার নোট বার করে বেলা দিল ; ও তিন মাস আগে নিয়েছিল ধার। টাকাটা এ সময়ে পেয়ে খুব উপকার হল।

৬

আচ্ছা ভগবান, তুমি খবরের কাগজ পড়ো? আমি পড়ি। বাংলা কাগজ। উনি অবিশ্যি ইংরিজি কাগজ পড়েন। মাসের শেষে যখন টাকাকড়ির টানাটানি পড়ে যায় তখন ভাবি, সামনের পয়লা থেকে আমার বাংলা কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দেবো। এ মাসেও তেমনি একটা সংকল্প করেছি—অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা ত বাঁচে। কিন্তু কাগজ-পড়াটা নেশার মতো দাঁড়িয়েছে। মনে হয় দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যাবে—যদি খবরের কাগজ না পড়ি। ইংরিজি কাগজ পড়ে সবটুকু বুঝি নে, আর সত্যি কথা ইংরিজি পড়ে রস পাবার মতো বিদ্যেও তেমন নেই আমার। যদি সময় পাও ত বাংলা কাগজ একটু উল্টে-পাল্টে দেখো। কেন বলছি জানো? কয়েকদিন আগে এক ভদ্রমহিলা 'ধূমপান'-এর বিরুদ্ধে একটা কড়া প্রবন্ধ লিখেছেন।

ধূমপান সাধারণতঃ পুরুষরাই করে, অন্ততঃ আমাদের দেশে। লেখাটা যখন পড়ি, তখন মনে হয়েছিল, আমাদের মানে মেয়েদেরও তামাকের নেশা আছে। এই যে পানের সঙ্গে জরদা, দোক্তা খাওয়া— এ ত বিড়ি সিগারেটের চেয়েও কড়া তামাক খাওয়া। সে ভদ্রমহিলা মেয়েদের দোষটা তেমন ভাবে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে কেবল ছেলেদের ওপরই এতটা বেশী হামলা চালালেন কেন! তা আজ খবরের কাগজে সে ভদ্রমহিলার আবেদনের ফলাফল দেখে অবশ্য খুব তৃপ্তি পেলাম—কলেজের ছেলেদের মধ্যে একটা আদর্শনিষ্ঠার চিহ্ন তাহলে এখনও রয়ে গেছে! কয়েকটি ছেলে একেবারে সিগারেট

খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে! আর যারা একেবারে পারে নি তারা বারে অন্ততঃ কমিয়েছে। অধ্যাপকের অনুরোধেই হোক, বা লেখিকার সমালোচনাতেই হোক—ফলটা খুবই ভালো। এই ধরনের ছেলের সংখ্যা যতো বেশি বাড়বে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা-ভরসাও ততই আসবে।

ওঁকে সেই কথাই বলছিলাম। বললাম—আমাদের বল্টু-নন্টুকেও সিগারেট খেতে দেবো না, দেখো!

উনি একটু হাসলেন—'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। ট্রামবাসে ত বন্ধই হয়েছে। এবার দেখছি তোমরা আপিসে-বাড়িতেও সিগারেট বেআইনি করে ছাড়বে!'

ওঁর বড়লোক বন্ধু দীপেনবাবুর 'ওয়াইফ'—ভদ্দরলোক কক্ষনো নমিতার নাম মুখে আনেন না, অন্য কিছুই বলেন না, বলেন ওয়াইফ। বিকেলের মুখে এসে হাজির। কি সাজই সাজতে পারে নমিতা। অবিশ্যি সাজলে ওকে মানায়ও। বলল—'উনি টুরে গেলেন। গাড়িখানা পেলাম তাই,—চলো বাসবী আজ ফ্লাওয়ার শো দেখে আসি।'

—ফ্লাওয়ার শো! কোথায়?

'কেন! তুমি স্টেট্‌সম্যান ছাখো নি! এগ্রিহর্টিকাল্‌চারাল গার্ডেনে হচ্ছে যে! তোমার উনি কোথায়? এখনো ফেরেন নি বুঝি!'

—ওঁর তো ফিরতে ভাই ছটা বাজবে।

'কেন? আপিসের কোন মেয়ের সঙ্গে সিনেমা গেছেন নাকি! খোঁজ নাও।'

বড়লোকের গিন্নী, কর্তার ফলাও কারবার—আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই করছে! নমিতা কি বুঝবে কেরানীর বৌয়ের অবস্থা। রাগ হল। হিংসে? না, ঠিক তা নয়, তবে মনে যা-ই থাক, হেসে বললাম—ওঁদের ত শনিবারেও পুরো আপিস চলে ভাই!

ভুরুটা একটু ছোট করে নমিতা বলল—'ওঃ, সরি, আমি ভুলেই

গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নূতন আইন! যাই হোক, চলো চট্ করে শোটা তোমায় দেখিয়ে বাই ফাইভ্ আবার পৌঁছে দেবো, কত্তা টেরও পাবে না। জানো, একটা গাছ আছে ওখানে সেটাকে পাগলা গাছ বলে। তার কোন পাতার সঙ্গে অন্য দ্বিতীয় পাতার মিল নেই!'

চমকে উঠলাম। হঠাৎ কুমারী বাসবীর জীবনের একটা মধুর স্মৃতি বিদ্যুৎ-ছটার মতো খেলে গেল। কিরণদা একদিন ঝাঁ-ঝাঁ বোশেখের দুপুরে আমাকে একটা বাগানে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। কিরণদা আমাকে ভালোবাসতো তা টের পেলাম সেইদিনই। কিরণদা এম. এস-সি. পড়ে। ঢাকুরিয়াতে ওদের বাড়ি, সেখানে মেয়ে দেখানো হবে—মেয়ে মানে আমি। কিরণদার মা-ই সম্বন্ধ করেছেন। সেই জন্যে কিরণদা নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায়, আমরা থাকি সোদপুরে। ট্রেন থেকে নেমে সোজা সেই বাগানে হাজির করল কিরণদা। সুন্দর বাগান। লোকজন নেই। আছে লাল অশোক, আর আছে অজস্র শাদা মালতী। বিরাট বাগান, মাঠ, পুকুর। একটা ঝুপ্সী ছায়াঢাকা জায়গায় আমরা ঢুকলাম। কেমন ভয় ভয় করছিল আমার। কিরণদা হেসে ভরসা দিল, বলল—'পাগলা গাছ দেখ বাসবী!' গাছটার নামও বলেছিল, মনে আছে, স্টারকুলিয়া আলাটা! অদ্ভুত নাম। সেই দিনের সব কিছুই অদ্ভুত ছিল। কতোবার সেই বাগানে গিয়েছি মনে মনে, কিন্তু নামটা আজই প্রথম শুনলাম। এই পাগলা গাছটার কথাতেই আমার সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল।

ঢোক গিলে সামলে নিয়ে বলি—না ভাই, হাতে অনেক কাজ। উনি এলে পরে বেরুনো চলে তবু! তা তুমি বরং ঘুরে এস।

গুছিয়ে বসে নমিতা বলল—'যাঃ, সে হয় না। একা-একা, ভালো লাগে না। তুমি যাবে না জানলে, কোনো পুরুষ-ফ্রেণ্ডকে ডেকে নিতাম। তবে ওদের সঙ্গে নেওয়ার ফ্যাসাদও আছে—চট্ করে ভেবে বসে যে উইক্‌নেস আছে আমার!'

নমিতা যতক্ষণ থাকে কেবল আদিরসের গল্প আর কেচ্ছা! ও বলল—'ছাখো বাসবী, কাল এক ফ্যাসাদে পড়লাম।'

—কি আবার ফ্যাসাদ?

'খবরের কাগজে একটা ষাঁড়ের ফটো ছেপেছে দেখেছো?'

—হ্যাঁ ভাই, কী কাণ্ড বলো! একটা ষাঁড়ের দাম বত্রিশ হাজার টাকা? উনি বলছিলেন, হায় হায় যদি ছবছরের ষাঁড় হতে পারতাম!

'আর এদিকে আমার ছ' বছরের মেয়েকে কৈফিয়ত দিতে পারিনে! একেবারে পাকা বুড়ি। কাগজে ফটো দেখে ওঁকে জিজ্ঞেস্ করেছে গোরুর ছবি কেন? কোন ফিলিমে নেমেছে, বাপী! উনি বলেছেন—মাম্মীকে শুধোও—আমিও ত বোকা! বলেছি—'খুব দামী ষাঁড় কিনা, তাই!—ব্যস মেয়ে বলে, ষাঁড় কত পথে পথে ঘুরে বেড়ায় কই তাদের ত ছবি ছাপে না! তারপর আরও বোকামি করলাম, দামটা বলে। ও এখন অঙ্ক শিখেছে। অঙ্কের বইতে নাকি আছে একটি গোরুর দাম যদি দুশো টাকা হয়···! তা খামোখা অত দাম কেন হল ষাঁড়ের? দাও জবাব! শেষে আর পথ না পেয়ে বললাম—তোমার বাপীর মতো ষাঁড়ের দাম ঐ রকমই হয়! এই আমার বিয়েতে উনি নগতে গয়নায় মিলে তা হাজার ত্রিশেক টাকা নিয়েছিলেন। খামোখা খবরের কাগজে ঐ ছবি না ছাপলেই চলছিল না!'

নমিতার সঙ্গে বসে বসে বকলেই আমার চলে না। নিজের কাজ পড়ে আছে। তা ছাড়া ও যখন এসেছে তখন ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এখান থেকে নড়বে না। মুখে যা-ই বলুক, ও যে কেন এসেছিল তা আমি জানি।

জগনের মাকে দুটো টাকা দিতে হবে। আজ রবিবার। সন্ধ্যেবেলায়ই টাকাটা ওর চাই। ওর মানে ওর স্বামীর। এখন টাকাটা হাতে গেলেই লোকটা রাতের দায়ে নিশ্চিন্দি হয়ে সরে পড়বে নেশা করতে। লোকটাকে একেবারে দেখতে পারি নে। কিন্তু সেদিন বিপদের সময় বড় উপকার করেছে লোকটা। উঃ সে কি সাংঘাতিক

অবস্থা! বৃহস্পতিবার হঠাৎ জল বন্ধ হয়ে গেল। চান, রান্না, সব বন্ধ। হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে ভাবছি, কি উপায় হবে। উনি একবার বালতি হাতে রাস্তার চাপাকলে গিয়ে খালি বালতিটি নিয়ে মুখ বিষ করে ফিরে এলেন। এত ভিড়! শেষে জগনের মা আমাকে উদ্ধার করল। ওর স্বামী কোথা থেকে যে পাঁচ বালতি জল এনে দিল তা সে-ই জানে। বলল –'ভালো জল, খাওয়া-রান্না সব চলবে মা ঠাকরুণ।' আর বাইরের কাজের জন্যে পুকুর থেকে সমানে জল টেনে দিয়েছে। আমি নিজেই বলেছিলাম, কতো দেবো তোমাকে? 'যা ইচ্ছে আপনার!' তা সেদিন মনে হয়েছিল দশ টাকা দিলেও এ উপকারের ঋণ শোধ হয় না। সিমলাই পাড়ার গোবিন্দবাবুদের ত না খেয়েই আপিসে বেরুতে হয়েছিল—রান্না হয় নি জল অভাবে। ওই রকম কতো বাড়িতেই হয়েছে তার ঠিক কি!

তোমার কাছে কিছু গোপন করব না ভগবান! সত্যি এখন, আজ মনে হচ্ছে লোকটাকে আট আনা দেওয়াই উচিত। কি আর এমন, ক' বালতি জলই দিয়েছে এনে ত! ওঁকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, 'পাঁচ টাকা দিয়ে দাও।' আমি আপসে এক থেকে সুরু করে দুইতে থামি, বলি লোকটা ত নেশাভাঙ করবে। এদিকে ঘরে ওর ছেলে-বৌ না খেয়ে পড়ে থাকবে, তাদের ত কোনোই কাজে আসবে না টাকাটাও অতো কেন দেবো!

উনি শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'ভবিষ্যতে বিপদে পড়লে আবারও এই নেশাখোরের কাছ থেকেই ভিক্ষের জল নিতে হবে! তখন তোমার এই বিদ্বান, বিবেচক ঘরের লোককে দিয়ে কিস্যু হবে না।'

জগনের মাকে দুটো টাকা দিয়ে বললাম- একটা টাকার বেশি যেন তোমার স্বামীকে দিয়ো না। আর একটা টাকা তুমি নিজে খরচ কোরো।

একগাল হেসে ও বলল—'এতো কেন দেবেন, এক টাকাই যথেষ্ট। তাছাড়া কিছু কি লুকিয়ে রাখার জো আছে। কাপড়চোপড় হাঁটকে

দেখবে, জানেন !' আমার কাছে এক টাকা জমা রেখে একটা টাকা নিয়ে চলে গেল জগনের মা। স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরি ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগে। কিন্তু সময় বিশেষে অন্য উপায় থাকে না।

রাত্রে খাওয়া চুকলে পরে বেলাদের সঙ্গে আমরা গেলাম গান শুনতে। কলোনীর মাঠে মাইক লাগিয়ে গান হচ্ছে। একটি মেয়ে গাইছে। গলা ভালো, সুরের ওপর দখলও বেশ। কিন্তু পর পর তিনটে গানই খাম্‌টার ঢঙে গাইল। তবলায় আর গলায় যেন লুকোচুরি। আজকাল এই এক ধরনের গাওয়ার ঢেউ এসেছে-- ছ্যাবলামি মনে হয়। যে গাইছে আর যারা শুনছে সবাই যেন লাফালাফি করতে চায়, কথা নিয়ে লোফালুফি করতে চায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত, কিংবা পুরোনো বাংলা ঢঙের গানের চলন কি হঠাৎ কমে গেল !

বেলা খুশী মনে শুনছিল।

ও পাশ থেকে একজন প্রৌঢ়া বললেন--'এ আবার কি অনাচ্ছিষ্টি কেলেঙ্কারি। আমি বলি কি কেত্তন-টেত্তন হবে বুঝি। তাই এনু। বলি, কি কালই পড়ল !'

কদিন আগে পর্যন্ত কলোনীর এই মাঠে অবিরাম হরিনাম কীর্তন হচ্ছিল। সেই আখড়াতে এই—!

আজ সোমবার—নণ্টুর পরীক্ষা শুরু হবে।

সকাল থেকে বার বার সে এসে আমাকে আদর করে বলে যাচ্ছে —'আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি ভাত চাই মা, হ্যাঁ !'

দশটার আগেই খেয়ে-দেয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে চলে গেল।—'মা যাই।'

—এরই মধ্যে যাবি ?

'হ্যাঁ !'

—শোনো বাবা, একটু ভেবে ভেবে উত্তর দেবে। তাড়াহুড়ো কোরো না যেন।

'আচ্ছা!'—বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। মিনিটখানেক পরে হঠাৎ ফিরে এল।

—কিরে ফিরে এলি যে?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে জিভ কেটে বলল—'ইস্ এ্যাক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম মা!'

টিপ করে পেন্নাম! পা ছুঁয়ে।

আমার লক্ষ্মীসোনা ছেলে! আদর করলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম—এই ছ্যাখো, কি রকম ছট্‌ফটে ছেলে তুমি। মা-র কাছেই ভুল করছ্ত!

ছেলেটা ভারি ভালো, তুমি একটু দেখো—ও যেন পরীক্ষায় ভালো ফল করে।

৭

এ শহরে নাকি বসন্ত আসে না। গাছপালা থাকলে তবে তো টের পাবো যে বসন্ত এল! না, তার কোন উপায় নেই—আছে কেবল শীত, গ্রীষ্ম আর বর্ষা। আগে তবু গাছ-গাছালি এখানে ওখানে ছিল—এখন সরকারী, বে-সরকারী, আধা-সরকারী আকাশের চোখে খোঁচামারা ইমারতের দাপটে গাছপালারা বেবাক ক্যালেণ্ডার ফটোর ছবি হয়ে মা-বাবা বা ঠাকুমা-ঠাকুর্দার পাশে অসহায়ভাবে দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে! মল্লিকদের বাড়ির কোকিলটা বারো মাস ডাকে, ক্ষিদে পেলে বেশি ডাকে, মনে দুঃখু হলে বোধ হয় আরো বেশি ডাকে, আর আনন্দ পাবার জন্যে হয়তো খাঁচার কোণে ঘুমোয়। ওর ডাক ত বসন্তের ইশারা নয়! তবে হ্যাঁ, এই সময়টা টের পাই—ভাত, ডাল এমনি খেতে ভালো লাগে না ওঁর। বলেন, 'তেতো কিছু করো!' তেতো কিংবা টকের ডাল রান্না হলে ভাত দুটি (মানে, আজ কাল খাওয়া ত হয়েছে পক্ষীর আহার, ওরই মধ্যে দুমুঠো) বেশি খান। কলাইয়ের ডাল রেঁধেছি আদা দিয়ে—আজ ওরা সবাই খুব খুশী। আমার ভাতে একটু টান পড়ল। তাতে কি হয়েছে। সবাই খেয়ে তৃপ্তি পেলেই আমি হাতে স্বর্গ পাই।

খেতে বসেছি এমন সময় বেলা এল, বলল—'শিবরাত্রির কি করছ? কাল বাদে পরশুই ত! উপোস ত করবে! কোন্ সিনেমাতে যাবে সেটা কিছু ভেবেছ?' আমি বললাম—উপোসটা ভাই করা চলবে না, ওঁর কড়া হুকুম। আমার এত কালের অভ্যেস।

বেলা অবাক হয়ে গেল—'সে কি! তাহলে, সিনেমায় যাবে ত?'

যেন সেটাও উপোসের অঙ্গ! বেলা কস্মিন্‌কালে উপবাস করে না, কিন্তু ওর স্বামীর ইচ্ছে অন্য রকম। আর আমার ভাগ্যে ঠিক তার উল্টোটি জুটেছে। আমাকে উপোস-কাপাস করতে দেখলে উনি ভীষণ চটে যান।

পাতের কোলে কুলের অম্বল দেখে বেলার চোখটা চক্‌-চক্‌ করে উঠল। আমি হেসে বললাম—খাবি? হেঁসেলে আরো আছে, নিয়ে আসি।

খেতে খেতে ও বলল—'হাওয়ায় বড্ড টান! টক করেছ, বেশ করেছ—এতে শরীর ঠাণ্ডা রাখে। এবার শীত না যেতেই রোদের কি তেজ হয়েছে—বাব্বাঃ যেন পশ্চিম!' হাত চাটতে চাটতে আবার বলল—'আচ্ছা এবার কাঁচা তেঁতুল এখনো উঠল না!'

—হ্যাঁ! উঠে বলে ফুরিয়ে যেতে বসেছে!

বেলা একটু হতাশ হল। কিন্তু তারপরই বলল—'দেখলে কাণ্ডখানা! মাউণ্টব্যাটেন গিন্নী মারা গেছেন।'

আমি এখনো খবরের কাগজ দেখবার অবসর পাই নি। ওর মুখে কথাটা শুনে মন একটু খারাপ হল বই কি! বড়লাটের বৌ, কিন্তু মানুষটি খুব ভালো ছিলেন। বেলা বলল—'এই কদিন আগে উনি দিল্লীতে এসেছিলেন, নেহরুর বাড়িতে বিছানাপত্তরগুলোও বুঝি রয়ে গেল!'

বসন্ত এসেছে একথাটা কদিন ধরে একটু একটু করে টের পাচ্ছি। ঝাঁকে ঝাঁকে মশায় ছেঁকে ধরছে—রাতে আর চাদরখানাও গায়ে রাখা যায় না। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা, সকালে মেঘলাটে ভাব, দুপুরে খর রোদ।

আজ শিবরাত্রি। কিন্তু উপোস করা মানেই অশান্তি বাড়ানো। মনটা ভালো নেই। ছোটবেলা থেকে একটা অভ্যেস! তা ছাড়া

আরও একটা কথা মনে হচ্ছে। ভাবনাটা উনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন—অথচ ওঁকে যদি সেকথা বলতে যাই তাহলে চটে যাবেন। তা বলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি কই?

ব্যাপারটা তোমার কাছে জানিয়ে রাখি, অন্তর্যামী তুমি—হয়তো পথটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারো!

আমার এক দূর সম্পর্কের ভাসুর, নামজাদা প্রগতিবাদী নেতা। তাঁর একমাত্র মেয়ে হঠাৎ তাঁর ক্লাস-ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে বসেছে। মেয়েটাকে দেখেছি বহুবার। ভারি মিষ্টি সহবত, লেখা-পড়াতেও খুব ভালো—বি.এ.-তে স্ট্যাণ্ড করেছিল শুনি। মা-বাবাকে বলা-কওয়া নেই, ভিন্ন জাতের ছেলেকে বিয়ে করল চুপি-চুপি! সেদিন ওঁরা কর্তা-গিন্নী দুজনেই এসেছিলেন। ওঁর বৌদি ত আমার কাছে বসে কতোক্ষণ ধরে কাঁদলেন। আহা, বেচারী বড় আঘাত পেয়েছেন। বললেন—'দ্যাখো বাসবী, ওকে আমরা কোনো দিন ত অযত্ন করি নি! বিয়ের আগে একবার মুখের কথাটা পর্যন্ত বলল না, এই ত না খেয়ে না পরে লেখা-পড়া শেখানোর ফল! একেবারে ছেঁটে ফেলে দিলি তুই! আমরা কেউ নই! তোর যতো আপন হল ওই তেইশ বছরের চ্যাংড়া ছেলে! বাপ-মা কি তোর ভালো চায় না, না বোঝে না? উনি কোথায় সম্বন্ধ করছেন পাশ করা ডাক্তারের সঙ্গে। ছেলেটি স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে পড়তে গেছে। জামাইয়ের মতো জামাই আনবো মেয়ের বিয়ে দিয়ে—তার বদলে, চাল নেই, চুলো নেই, লেখাপড়াতেও এমন কিছু নয়। সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে কোনো রকমে! কপাল আর কাকে বলে—'

ওঁরা চলে যাওয়ার পর আমার স্বামী বললেন—'মেয়েকে দোষ দিয়ে কি হবে! আমার দাদার দুঃখ পাওয়া উচিত হয় নি। উনি মুখে বক্তৃতা করে বেড়াবেন, উনি মানে আমি আজকালকার নেতাদের কথা বলছি, সাহিত্যিকদের কথাও বলছি! এঁরা সবাই পশ্চিমী সমাজ ব্যবস্থা আর বাস্তবদর্শনের মোটা মোটা বুলি ঝাড়বেন আর মনের ভেতরে

ভট্টাচার্যমশায়ের টিকি পুষে রাখবেন—তার ফল এই হবে। আরে বাবা, তোমার মনের তলার খবরটা কে রাখতে পারে? তোমরা যা বড় গলায় বলবে, ছাপার হরফে লিখবে—সেটাই সমাজের সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটবে। এঁরা পুরনো আমলের সামাজিক আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছেন, মনের শেকড়টা সেখানেই আটক রয়েছে। কাজেই তাঁদের মুখের কথার ধাক্কায় সমাজ পাল্টালে তাঁরা আঘাত পাচ্ছেন।—'

ওঁর কথা সব সময় আমি বুঝি নে। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, আমার ছেলেমেয়েও বিশ্বাস করুক- তাই চাই। কিন্তু উনি করেন না, ওঁর মনের গড়ন অন্য রকম। এখন, আমার ছেলেমেয়ে কোন পথে যাবে? আমার ভাসুরঝির বিয়েটা আমি ভালো মনে নিতে পারি নি- উনিও ত পারেন নি! তবে ওঁর কথা হল—'মেয়েটা বড় বোকা! দেখে শুনে একটা ব্রিলিয়্যাণ্ট ছেলেকে প্রেমে ফেলা উচিত ছিল ওর।'

বিকেলে বেরুলাম, বাজার করতে—বালিশের ওয়াড় আর সায়ার কাপড় না কিনলেই নয়। বাসে, পথে, কত মেয়ে, বউ, বুড়ি! কেউ গঙ্গা স্নানে চলেছে, কেউ বা স্নান করে ফিরছে- হাতে ঘটি, ছোট কলসী আর ভিজে কাপড়-গামছা! মনে মনে আমিও ওদের সঙ্গে যাত্রী।

আজ সকালেই শেতলা পূজোর জন্যে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। উনি দিলেন না, বললেন—'চারদিকে পক্স হচ্ছে। টিকে না নিয়ে থাকো তো চটপট সেটা আগে নাও। মা শেতলাকে ডেকে কিস্যু হবে না বাপু—যাও।'

লোকটা চলে গেল ব্যাজার মুখে, ওঁকে বললাম—তা দুটো পয়সা দিলেই পারতে!

'না-না, গাঁজা খাবে পয়সা নিয়ে। আমি ওকে চিনি।'

—পূজোও ত করতে পারে! মিছি-মিছি মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কি লাভ।

সে কথার কোনো জবাব এল না। মিনিটকয়েক পরে উনি হাঁক দিলেন—'ওগো শুনছ ? এই ছাখো—'

কপির তরকারিতে জল ঢেলে দিয়ে এসে দাঁড়াই। কপি আর কেউ খেতে চায় না, নন্টুকে যদি বলি— তুই তো কপি ভালোবাসিস ত ও মুখ খিঁচিয়ে বলবে—'হুঁ ! তাই বলে রোজ রোজই কপি, ভালো, না ছাই বাসি !'

—কেন ? কি জন্যে ডাকছ !

উনি বললেন—'ছাখো একটা মজা ! আজকাল সাধু-ফকিরের খোলস নিয়ে কি কাণ্ডটাই হচ্ছে।'

—কি হল আবার ?

'কদিন আগে একটা জোচ্চোর ধাপ্পাবাজকে পুলিসে ধরেছে— চোরটাও ফকির সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ডিটেকটিভও ফকিরের বেশ ধরে ফলো করে ধরে ফেলল। তাই বলছি, সাধু মানেই সাধু নয়। আর একটা মজার খবর বেরিয়েছিল, একটা লোক সাধু দেখলেই খুন করছে। সাধু খুঁজে খুঁজে খুন করছে'। কোন জোচ্চোর নাকি সাধুবেশে এসে তাকে ঠকিয়ে গেছে ! সাধুরা খুব ভয় পেয়েছে !'

—এখন আমার রং তামাশার সময় নেই। সত্যি তোমার কোনো দরকার থাকে ত বলো। হাতে আমার কাজ আছে।

'বলছিলাম, তুমি ত উপেন গাঙ্গুলীর লেখার খুব ভক্ত। যাবে নাকি মহাজাতি সদনে। ওঁর শোকসভায় অনেক সাহিত্যিক বক্তৃতা করছেন। যাবে ? তাহলে আপিস ফেরত তোমায় নিয়ে ফিরব।'

গিয়েছিলাম শোকসভায়। অনেক লোক। হলটাও বেশ বড়। বড় বড় সাহিত্যিকদের মুখের কথা শুনতে আমার খুব সাধ। উপেনবাবুর লেখার কথা খুব বেশি কেউ বললেন না। মানুষটিই আসল, সেই মানুষের কথা কতোই শুনলাম। মনের ভেতরে কেমন কান্না-কান্না ঢেউ খেলছে।

হঠাৎ মনোজ বসু মশায়ের একটা কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালী' নাকি বহু পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত হবার পর উপেনদা বিচিত্রায় প্রকাশ করেন। বিভূতিবাবুকে আমি ছোটবেলায় দেখেছি, আমার কাকার কাছে ওঁর কথা অনেক শুনেছি। পথের পাঁচালী বিচিত্রায় ছাপা হয়েছিল তাও জানি। কিন্তু কোনো পত্রিকা থেকে না ছেপে ওই বই ফেরত দিয়েছিল একথা এই প্রথম শুনলাম। উপেনবাবু কতো উদার ছিলেন, ভাবতেও ভালো লাগছে।

সভাপতির কথাগুলো দামী, কিন্তু শোকের কোনো ভিজে ভাব তাতে নেই। নিজের কথা বলে উনি যখন, 'সভা শেষ' বলে উঠে দাঁড়ালেন তখন ভিড় ভাঙ্গার পালা সুরু হল। আমি একটু পরে বেরুবো, নইলে ওঁকে খুঁজে পাব না। বসে আছি, এমন সময় ঘোষণা হল—'আপনারা একটু বসুন! উপেন্দ্রনাথের নাতনী উপেন্দ্রনাথের রচিত গান গাইবেন।' গাইলেন ভদ্রমহিলা চমৎকার—কিন্তু সভার ব্যবস্থাটা এমন খাপছাড়া দেখে মন খারাপ হয়ে গেল।

তার চেয়েও মনটা খারাপ হল যখন আমার স্বামী বললেন—'মনোজবাবুকে আমি চিঠি লিখে জবাব চাইব—বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালী' কোন্ কাগজ ফেরৎ দিয়েছিল তিনি নাম করুন—প্রমাণ করুন। না-জেনে এ ধরনের কথা কেন সভায় দাঁড়িয়ে এঁরা বলেন!

আজ আবার মাসের শেষ শনিবার। ওঁর ছুটি। সকালেই ওঁর বন্ধু এসে জুটেছেন বৌদি চা চাই, টা চাই

—কি খাবেন?

'আজ মিষ্টি খাওয়ান!'

—তাই বটে কাল বাদে পরশু মেয়েদের পরীক্ষা। কর্তাকে বললাম, মেয়েদের পড়াটা একটু দ্যাখো। তা আপনি এসে ভণ্ডুল করলেন, মিষ্টি ত খাওয়াতেই হয়!

'আপনি যেন বড্ড তাড়াতাড়ি গিন্নী হয়ে যাচ্ছেন। বিয়েতে, পাকা দ্যাখাতে মিষ্টি খাওয়াবেন না?'

—বিয়ে?

'হ্যাঁ! আমাদের রাজকন্যে, রানীর বহিন মার্গারেটের বিয়ে লাগছে যে!'

—তাতে আমার কি!

'বাঃ, শেষে সেই একজন কমনারের গলাতেই মালা দিবি, তা বেচারী টাউনসেণ্ড কি দোষ করেছিল।'

উনি ফোড়ন দিলেন—'বেচারীর দোষ নয়? আগের পক্ষের ছেলে, যাকে বলে সতীনপো রয়েছে। আর সে ত ভালো ফটোগ্রাফারও নয়!'

আমি বললাম—ও সব বিলিতি খবরে মিষ্টি খাওয়াবার মতো বান্দা আমি নই।

'বেশ, দিশি খবরই দিচ্ছি। নেহরুর বোনপোর বিয়ে হল তার দরুনেই মিষ্টি আসুক। আরও একটা খবর আছে, জাপানী হলেও রাজকন্যে সুগার বিয়ে লাগছে। মোদ্দা চাদ্দিকে বসন্তের বেসাতি বসেছে, মিষ্টি খাওয়াতেই হবে।'

—এক টাকা দশ নয়া পয়সা সেরের চিনি দিয়ে চা করবো, এতেই যা মিষ্টি হয় হলো।

'আর পান?'

উনি বললেন—'না হে, পান খেতে চেয়ো না। দোকানে পানের দর দেখেচ? এক-এক খিলির দাম চার নয়া পয়সা হয়ে গেল। আমাদের ছেলেবেলায় ছিল, পয়সায় দু খিলি পান। বোঝো ব্যাপার।'

আজ, কাল উপরো উপরি দুদিন ছুটি। কোথাও একটু বেরুবো তার পথ নেই। মাসের শেষ—অবিশ্যি ফি মাসেই এমনিভাবে ছুটি জুটবে—শেষদিনে কি পয়সা থাকে হাতে? তার ওপর দু-দুটো মেয়ের এ্যানুয়াল পরীক্ষা। মনে মনে ভগবান তোমায় ডাকছি, পাশ করিয়ে দিয়ো নইলে আবার গোটা একটি বছর চাকা উল্টো দিকে ঘোরাতে হবে।

এ তোমার কি ভয়ঙ্কর খেয়ালী খেলা আমি বুঝতে পারি না, ভগবান! মরক্কোর ভূমিকম্পে যাদের জীবন ঘুচিয়ে দিলে, তাদের ওপর কি তোমার কোনো দরদ ছিল না? কতো হাজার মানুষ মরল! কতো হাজার মানুষ ভিখিরি হল?

দুনিয়ার মানুষ শিউরে উঠেছে নিশ্চয়। যাকগে, দুনিয়াটা মস্ত বড় কথা—ও ত তোমার ভাবনার হুদ্দো। আমি বাংলাদেশের সাধারণ ঘরের বৌ—আমি কিন্তু তোমায় ক্ষমা করতে পারছি না। কদিন ধরে ঘুরে-ফিরে বার বার মনে হয়েছে—তুমি করুণাময় নামের মর্যাদা হারিয়ে বসেছ। তুমি তোমার হাতে-গড়া মানুষের হাল চাল, দেখে বুঝি বা মানুষেরই কাজের নকল করছো! হিরোশিমায় কতো মানুষ মরেছিল তা আমি জানি নে। রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকার হাতে যে আণবিক বোমা মজুত রয়েছে তা দিয়ে এই পৃথিবীকে হয়তো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে করে কি লাভ হবে? ছি, ছি, ছি—তুমি নিজেই তো পারলে না মানুষের মনে শুভ বুদ্ধি দিতে—তার ওপর আবার তাকে নকল করছ, সর্বনাশের মচ্ছবে লেগে পড়েছ। সত্যি, তোমার ওপর এতো রাগ হয়েছিল যে, গত তিনদিন আর কিছু লিখি নি, ভেবেছিলাম—আর কখনও কিছু লিখব না। থাক আমার মনের যতো দুঃখ, আমারই থাক।

কিন্তু কি হল জানো! আজ দুপুরে খবরের কাগজ মেলে বসে আগাদিরের খবর পড়ছি। দেখছি দুনিয়ার মানুষের মনে দরদ

জেগেছে, যে যতটা পারছে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। এক দেশের মানুষের বিপদে অন্য দেশের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। মানুষের মনের তলায় তাহলে এখনও মনুষ্যত্ব আছে!

আরো অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে, তিনদিন ধ্বংসস্তুপের তলায় আটক থেকেও একজন মেয়ের সন্তান হয়েছে। জননী আর নবজাতককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে মাটির ওপর আনা হল!

এই ত তোমার করুণার চিহ্ন! চোখে জল এসেছিল আমার।

সেই ঝাপসা চোখেই দেখলাম বাংলা দেশের 'হাসপাতালে গর্ভপাতের কাহিনী।' পড়ে বেদনাহত হলাম। ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তুপের তলা থেকে নতুন জীবন আবিষ্কারের সংবাদের পাশেই একি সংবাদ! তোমারই সৃষ্ট মানুষের এমন প্রবৃত্তি হয় কেন ভগবান!

আজ শনিবার—যে শনিতে আর সোমে কোনো তফাৎ নেই, উনি ত সেই সন্ধ্যে বাঁউরে ফিরবেন। বিকেলটা খালি খালি। নণ্টু খেলতে বেরিয়ে গেছে, বোল্টুর পায়ে একটা ফুস্‌কুড়ি হয়ে পড়ে আছে। কাল বিকেলে বমি করে জ্বর এল, ছেলের সে কী কাঁপুনি। আজ সকালে ইন্‌-জেক্‌শন, কাল রাতেও একটা হয়েছে, সন্ধ্যেতে আবার ডাক্তার আসবেন।

দরজায় কড়া নাড়ল—কে এমন অসময়ে। ময়দা-মাখা হাতে গিয়ে খিল খুলব কি না ভাবছি। যদি অচেনা কেউ হয়! আবার কড়া নাড়তেই, উঠে গেলাম। আহা, ময়দা বুঝি কেউ মাখে না।

—ও মা, তুই! জবা—কি রে, অমন হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস। আয়, ভেতরে আয়।

জবা কোনো কথা বলল না, পিছুপিছু রান্নাঘরের দোরে এসে দাঁড়াল। বসতে বললাম, বসল না। কোনো কথাই বলছে না, ওর কি হয়েছে? বললাম—একটু পরে চা করব, এ্যাঁ! তারপর পিসিমা, পিসেমশাই সব ভালো আছেন ত?

ফ্যাস-ফেসে গলায় বলল— 'ওই এক রকম। দিদি, তোমায় একটা কথা বলব—।'

জানি, কথাটা ওর নতুন নয়ঃ অনেক অনেক পুরনো। সবাই সবাইকে বলে। টাকার কথাটা শুনতে রুচি নেই, শেষ পর্যন্ত শুনতেই হবে। তবু এড়াবার জন্যে বললাম—তোর কি শরীর খারাপ নাকি। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। ঠাণ্ডা লেগেছে? তোর চায়ে আদার রস দেবো!

হাসল জবা। বড় শান্ত মেয়ে। বড় চাপা মেয়ে। ওকে দেখলে কেউ টের পাবে না, ওর মাথার ওপর কি বিরাট দায়িত্ব ঝুলছে।

ও হাসতে হাসতে বলল—'দোহাই দিদিভাই, তোমার ডাক্তারী রাখো। আদা দিয়ে অমন চমৎকার চায়ের জাত মেরো না। আর গলার কথা বলছ! সে ভারি মজার ব্যাপার। কাশ্মীর গিয়েছিলাম। সেখানকার অমন চমৎকার শোভা দেখে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি নেঃ একের পর এক গান গেয়ে গেছি মনের আনন্দে। ওখানে একেই ত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার ওপর গলায় স্ট্রেনও খুব পড়েছে— আমাদের পাড়ার যা ছিরি, ওখানে গান-টান গাইতে পারি নে। অভ্যেস না থাকায়—বুঝলে! হঠাৎ কাশ্মীরের কাব্য বরদাস্ত হয় নি— তাই।'

আমি অবাক। বলি—কবে গেলি তুই কাশ্মীর! ফিরলিই বা কবে!

'আরে দূর! স্বপ্নে—স্বপ্নে দেখা কাশ্মীরের চোটেই গলার এই দশা। সত্যি সত্যি গেলে আর রক্ষা ছিল না।'

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে জবা কিন্তু অনেক কথাই বলল ঃ ও কিছুদিন আমার এখানে এসে থাকতে চায়। ওর বাবা-মা সবাই ওর ওপর বিরক্ত। ব্যাপারটা খুবই জটিল। ও একটি অবাঙ্গালী ছেলেকে ভালোবাসে। না, তেমন খারাপ কিছু নয়। একই আপিসে ওরা চাকরি করতো। সেই সময়ে আলাপ। জবার টেম্পোরারী চাকরির মেয়াদ চুকে গেল, কিন্তু ছেলেটির সঙ্গে পরিচয়ের সুতোটা কাটলো না। মাঝে মাঝে সে ওদের বাড়ি আসে। একদিন পাড়ার সব

ছেলেরা দল পাকিয়ে বাড়ি ঘেরাও করল ঃ ছেলেটি তখন জবাদের বাড়িতে রয়েছে। তারা চায় ছেলেটিকে বার করে দেওয়া হোক—তারা উচিত মতো ব্যবস্থা করবে। জবার বাবা বাড়ি ছিলেন না। জবাব দিল জবা—না। অর্থাৎ চ্যাংড়াদের হাতে ভদ্রলোককে ও ছেড়ে দেবে না। ইট পাটকেল পড়া শুরু হল। অগত্যা জবা বেরিয়ে এল। বলল—'আপনারা এরকম করবেন না, পুলিশে খবর দেবো তাহলে।'

অবশেষে আপোষ হল। ছেলেটির পাড়ায় ঢোকা বন্ধ। জবার বাবা মেয়েকে বুঝিয়ে বলেছেন—'যদি ওকে বিয়ে করো, আমি বাধা দেবো না। কিন্তু তোমাদের জন্যে বাড়ির সকলকে অপদস্থ হতে হয়—এটা নিশ্চয়ই চাও না তুমি। তা যদি হয়, তবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে, বিয়ে করে স্বামীর ঘর কর। কেন না, এখানে আমার আরো ছেয়েমেয়ে থাকে, তাদের ভবিষ্যতের কথা, নিরাপত্তার কথা, সমাজের কথা—।' আরো অনেক কথাই বলেছেন আমার পিসেমশাই। এই নিয়ে তিনি এমন কথাও বলেছেন যার ফলে জবার মতো মেয়ে, যে মেয়ে সকালে দুটো মেয়েকে পড়িয়ে চল্লিশ টাকা, দুপুরে একটা স্কুলে চাকরি করে একশ টাকা আর সন্ধ্যেতে একটা ছেলে পড়িয়ে ত্রিশ টাকা ঃ মোট প্রায় পৌনে দুশ টাকা রোজগার করে বাপের সংসারে গোঁজা দেয় নির্বিবাদে—সেই মেয়ে চলে আসতে চায় সংসার ছেড়ে।

সব শুনে আমি বললাম—তুই তাহলে ওই লোকটাকে বিয়ে করবি ?

—'কেন, তোমারও আপত্তি আছে! অবিশ্যি এখনি বিয়ে হতে পারে না। সে থাকে হোটেলে। সব আগে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া দরকার, আমার অন্তত আরো শ' খানেক রোজগার বাড়া দরকার। তারপর বিয়ে—। বাবা যাই-ই বলুন, আমি ত টাকা বন্ধ করতে পারব না! তাহলে, সবাই না খেয়ে মরবে যে! বাবার যা রোজগার—তাতে এমনিই চোখের জলে নাকের জলে চলে। হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। জানো, বাবা আজকাল

ট্রামে বাসে চড়া ছেড়ে দিয়েছেন, আর কুলোয় না বলে। কোন্‌দিন হয়তো পথের মধ্যে মাথা ঘুরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন। কী যে করি!'

জবা চলে গেছে। আমার মুখ চোখ থেকেই হয়তো আন্দাজ করেছে কিছু। নিজেই ও হাসতে হাসতে বলে গেল যাবার সময়—'না, না, এমনি তোমার মন বুঝবার জন্যে বলা। যদি হঠাৎ কখনো দরকার হয় তখন ঠাঁই পাবো কি না পরখ করে দেখে গেলাম। আর ত্যাখো, তোমার সেই তেইশ টাকার মধ্যে এমাসে সাত টাকার বেশি দিতে পারছি নে। এখন এটা রাখো। দেখি সামনের মাসে—'

হাত পেতে নিলাম। ইচ্ছে করে না ওর কাছে এভাবে টাকা নিতে। কিন্তু ও যা অভিমানী মেয়ে, যদি না নিই তাহলে আর কখনো আমার কাছে কানা-কড়িটি নেবে না। গরীব হলেও ওর আত্মমর্যাদার অভাব নেই, বরং একটু বেশি।

আমি দেখেছি, এটা আমারও আছে। আমার চেয়ে অবস্থা যার ভালো তার কাছে ছোট হয়ে যাবো কোনো কিছুতে এ আমি ভাবতেও পারি না।

কিন্তু জবা ত সম্পর্কে আমার বোন, তবে কেন এই পরের মতো ব্যবহার। সত্যি, আত্মীয়তার কিই বা মেনে চলতে পারি আমি। কই জবাকে ত থাকতে দেবার কথা ভাবতে পারি নি। অথচ ওর এমন দুঃসময়ে বড় বোনের মতো কাজ করা হত তাতে।

আমার মতো ভদ্রঘরে এটা যতো বড় সমস্যা, রাস্তার ওপারে, ওই বড় নর্দমাটা ডিঙ্গিয়ে গেলে এটা তত বড়ো সমস্যা নয়। ওরা পারে। ওরা অনেক কিছু পারে যা আমরা পারি নে। ওদের আন্তরিকতা, আত্মীয়তা অনাহারে, রোগে, দুর্ভোগে মরে যায় নি। আর আমরা স্বাভাবিক প্রতিদিনের নিয়মের বাইরে এতটুকু অসুবিধের আঁচ লাগলেই আত্মীয়তাকে গুটিয়ে রাখি। এমন বিশ্রী শিক্ষা কোথা থেকে এল?

সকাল থেকে মেঘমেঘ: ও বাড়ির দীপু বলছিল—এটা নাকি

কাল-ফাল্গুনী! কালবৈশাখী ত বলা চলে নাঃ ফাল্গুনে এখনো দোলই যেখানে বাকী সেখানে, ঝড়-বৃষ্টিকে অন্য কিছু বলার চেয়ে এ নামটা ও বেশ বার করেছে। আজও কি বৃষ্টি হবে? কে জানে! আগাদিগের ভূমিকম্প, নিউইয়র্কে তুষার-বর্ষণ: তার তুলনায় কাল-ফাল্গুনী ত কিছুই নয়।

তবে দিন দিন ছনিয়ার ভাবগতিক এমন দাঁড়াচ্ছে যে, কখন কোথায় কি ঘটবে, কে কি চেহারা নিয়ে প্রকট হবে তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

কিন্তু আমাদের ভাগ্যটা বাঁধা মাইনে, জিনিসপত্রের দাম বাড়া, যানবাহনের ভাড়া আর ভিড় ছু-ই বাড়া, আর অসন্তুষ্ট বয়স-বাড়ার ছকের বাইরে বোধ হয় যাবে না। মেঘলা আকাশ আর মেঘ-ছাওয়া জীবনের এমন খাশা ছন্দ মিলিয়ে গদ্যকবিতার দাঁতখিঁচুনী আরো বাড়িয়ে দাও ভগবান—যেটা তুমি পারো তাই করো। এমন করো যে বিবেক, বুদ্ধি, শালীনতাবোধ সব ভোঁতা হয়ে যাক! দেখবে তখন আর কোনো নালিশ থাকবে না, নাকে কান্না থাকবে না, আফশোস থাকবে না—থাকবো আমরা, থাকবে ট্যাক্সো আর থাকবে প্ল্যান, যে প্ল্যানের মাথামুণ্ডু বেহদ্দ বোকা মেয়েমানুষের মগজে ঢোকে না, ঢুকতে পারে না। কেন না, সে নেহাতই ছোট মন নিয়ে ছোট সংসারের হাল ধরে বসে আছে—তাকে সংসার চালাতে হয় যে।

আজ একটা মজার কাণ্ড দেখে প্রথমে হাসি পেয়েছিল—দমফাটা হাসি হাসবার পরও কিন্তু চোখে জল এল।

যাচ্ছিলাম বেহালাতে, বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে! যাবার তেমন গা ছিল না। মেয়ে ছুটোর পরীক্ষা চলছে বলেই—ওদের জন্যে রাত্রের রান্না চুকিয়ে, নণ্টু-বণ্টুকে নিয়ে সন্ধ্যের পর আমরা রওনা হলাম। এতক্ষণ একভাবে ট্রামে-বাসে বসে থাকলে ঘুম আপনিই এসে যায়। সেই শ্যামবাজারে বসেছি। মাঝে মাঝে নণ্টুর উদ্ভট কথায় হুঁ-হাঁ করে ঠেকা দিচ্ছিলাম। গড়ের মাঠের মিঠে হাওয়ায় চোখের পাতা আর খুলে রাখতে পারি নি। হঠাৎ গায়ে ঠেলা খেয়ে চমকে উঠলাম। ওমা, এতো

আলো! গাছের ডালে ডালে লাল-সবুজ-নীল আলোয় বিয়ে বাড়িখানা ঝলমল করছে। উঠে দাঁড়ালাম। বাসখানা থামবার আগেই উনি আমায় বসিয়ে দিয়ে বললেন—'ও কী! বসো, এখনো দেরী আছে।'

ঘুমোচ্ছিলাম, সেটা ধরা পড়ে গেছে। তাতেই একটু বেকুব-বেকুব লাগছে নিজেকে। ওঁকে বললাম—আমি মনে করি কি, এই আলোওলা বাড়িখানাই বুঝি বিয়ে বাড়ি!

উনি বললেন—'তা বটে! এটা কি জানো? ব্লাইণ্ড স্কুল! এখানে অন্ধদের লেখাপড়া শেখানো-টেখানো হয়।'

—তাই বুঝি! তা এত আলো দিয়েছে কি জন্যে?

'হয়তো কোনো উৎসব আছে।'

---তা নয় রইলো। কিন্তু অন্ধদের উৎসবে আলোটা কোন কর্মে আসবে শুনি।

এ কথায় উনি হাসলেন প্রথমে, তারপর নন্টু, বন্টু, আমিও হেসে উঠলাম। কিন্তু হাসি ফুরোবার পর মনটা এতো ভার-ভার লাগল, কেন জানি না। বার বার চোখে জল আসছিল। বিয়ে বাড়িতে অতো হাসি, গল্প, সানাই,—তারমধ্যেও বার কয়েক আমার কান্না-কান্না ভাব হয়েছে।

কোথা থেকে একটা ডানা-ভাঙ্গা টিয়াপাখি নিয়ে এসেছে বন্টু। পাখিটা হয়তো ঝড়-ঝাপটায় জখম হয়ে নর্দমার ওপারের ডুমুর গাছে আশ্রয় নিয়ে ছিল। সেখান থেকে ধরেছে জগনা। জগনার সঙ্গে মাঝে মাঝে নন্টুর খুব ভাব হয়। ওসব ছেলের সঙ্গে ছেলেদের মেলা-মেশা আমি পছন্দ করি নে। খারাপ-খারাপ কথা শেখে—ছেলেমানুষ ত যা চোখে ছ্যাখে, যা শোনে, তা-ই শেখে।

পাখিটা দেখেই আমি ধমক দিয়ে উঠলাম—বিদেয় কর! কোথা থেকে এই আপদ এনে জোটালি! যতো সব বাজে ছেলের সঙ্গে টো-টো ঘোরা স্বভাব হল, যা দেখতে পারি নে—

নণ্টু মুখ ভার করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে ! বণ্টু বলল— 'আমি নিতে চাই নি মা ! বলেছিলাম ত, তুমি বক্‌বে। তা নণ্টু কিছুতেই শুনল না, বলল না রে দাদাভাই নিয়ে চল, দেখছিস না ওর একটা পাখা খোঁড়া। মা ওকে আইডিন দেবে, ও সেরে উঠবে, বেশ হবে।'

নণ্টু যখন খুব ছোট্ট তখন পর-পর গোটাতিনেক পাখি পোষা হয়েছিল—তুটো মরে যাবার পর তৃতীয়টি কেনার শখ ছিল না, সেও এমনি এসে জুটেছিল, অবিশ্যি সে মরে নি—পালিয়ে ছিল। সেই থেকে সিঁড়ির ঘরে খাঁচাটা অযত্নে পড়েছিল। ওদের তুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর থাকা গেল না, বললাম—বেশ করেছ। যদি টৌ-টো করে ঘোরা বন্ধ করো তাহলে পাখিটা রাখব। খাঁচাটা আবার দেখি—

পাখিটা এখন এ-বাড়ির এক নম্বর মেম্বার ঃ সকাল থেকে ছেলেদের খবরদারী শুরু হয়—'মা, জগন্নাথের খাবার দাও,···ওর কাগজখানা নোংরা হয়েছে পাল্টে দাও না মা,···ও-হো বেলা হয়ে যাচ্ছে জগুবাবুর চান হল না এখনো···আচ্ছা এমন অসময়ে জগু কেন ঘুমোচ্ছে ? শরীর বুঝি খারাপ ! না কি রাতে ভালো ঘুম হয় নি !···'জখম ডানার জন্যে ওর নাম জগন্নাথ। উনি অবিশ্যি বলেন—'মৌনীবাবা' ! চ্যাঁ-চ্যাঁ আওয়াজ-টুকুও করে না, পাছে মেহনৎ হয়ে যায় ! এমন পাখিও বাপের জন্মে দেখি নি। কাজের মধ্যে কাজ হল, সারারাত ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে কাগজ ছিঁড়ে কুটি কুটি করা। আমার এই এক নতুন চাকরি হয়েছে !···

উনি কদিন ট্যুরে গেছেন। বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। একটা মানুষ নেই ঘরে তাতেই যেন আমি বেকার হয়ে গিয়েছি। অথচ এখানে ওঁর থাকা বলতে ত সকালটুকু তারপর সারাদিনের দায়ে নিশ্চিন্দি। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফেরেন, আবার ত বেরিয়ে যান ঘণ্টা খানেক পরে। ফেরেন রাত তুপুরে। কতক্ষণই বা থাকেন !

রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। নাঃ, এ-ভারি বিশ্রী অবস্থা।

সামনের পথের দিকে আল্‌সে মনে তাকিয়ে তাকিয়ে কতোক্ষণ কেটে যায়।

এমনি তাকিয়ে আছি, হঠাৎ একটা কথা কানে গেল—'আমাদের মেয়ে মরল, ছেলে তিনটের মা গেল –ওর আর কি, বলো! ওর আবার বৌ হবে, নতুন বৌ! আমাদের মেয়েও আর ফিরবে না, ছেলেগুলোরও খোয়ারের একশেষ হবে।......সত্যি!'

আচ্ছা আমি যদি হঠাৎ এমনি করে মরে যাই, তাহলে- -?

আকাশ-পাতাল ভাবনায় হাবুডুবু খেয়ে মরছি, পিছন থেকে নণ্টু এসে আঁচল টেনে বলল –'আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না! বেশ বেশ যা হোক।

বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। ছিঃ, এসব অলুক্ষুণে কথা ভেবে মরছি কেন! ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, না-না, আমাকে বাঁচতেই হবে। নইলে এদের কি দশা হবে।

একটা কথা মনে পড়ল। উনি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলেন---বিধবা মেয়েদের সঙ্গে বিধবা-পুরুষদের বিয়ে হওয়া উচিত। ছ্যাখো, আমি তোমায় বলে যাচ্ছি খবরদার, যদি বিয়ে করো তাহলে একথা মনে রেখো। যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে অথবা ত্নুনিয়ার সভ্য দেশের আচার-ব্যবহার খতিয়ে দেখলে—বিধবা, বিপত্নীক মানুষের বিয়ে হওয়াটা বিচিত্র নয়, হয়েও থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ত দরকার—আর বার-বার বিয়ে না করাটাকেও জন্মহার কমানোর একটা সহজ, সুন্দর উপায় হিসেবে চালু করা বোধহয় খারাপ নয়।......

উনি বাড়িতে পা দিতে না-দিতে বাপ-সোহাগী মেয়েরা লাগানো-ভাঙানো শুরু করেছে। উনি না থাকলে নাকি ওদের মা রান্নাবান্না শিকেতে তুলে রাখে। খালি ডাল, বড়ার ঝোল, বড়ার ঝাল, বড়ার অম্বল—ব্যস্ হয়ে গেল রান্না। বড় মেয়ে বলল—'যাক বাবা এবার মাছ, তরকারীর মুখ দেখা যাবে।'

উনি ঠেস দিলেন—'এ-কদিনে কি রকম প্রফিট হল?'

এই ত সবে বাড়িতে পা দিয়েছেন, এরই মধ্যে সব সত্যি কথা বলা ঠিক নয়। হয়তো কিছু পয়সা বাঁচত—যদি নটোর পিসীকে দশ-দশটা টাকা ধার দিতে না হত। না দিয়েই বা পারি কি করে, নটোটার মায়ের দয়া হয়েছে। ওদিকে জমিদারের পেয়াদা এসে মহা হুজ্জুতি জুড়ে দিয়েছে। তিন মাসের ভাড়া বাকী। সে আবার এমন চশমখোর লোক যে, বলে, 'আরে মায়ের দয়াতে যদি তুমার ভাতিজা ফৌত হয় তবে! তোখোন ত সব নুকশান—! আমার ভি নোক্‌রি খতম।......'

নটোর বোনটার ওপর পেয়াদার একটু নেক্‌-নজর ছিল, মেয়েটা বোকা, তবে ভালো মেয়ে।

মেয়েটা আগে এসব বুঝত না, যেদিন বুঝল, সেদিনই চেঁচামেচি করে কেলেঙ্কারী বাধিয়ে ফেলল। বস্‌তির বাসিন্দেরা পেয়াদাকে 'প্যাঁদানী'ই দিত, নেহাৎ নাকি রাজপুরুষের আপন লোক আর খাজনা-ভাড়া অনেকেরই বাকীবকেয়া রয়েছে, তাই মুখের সুখে গালিগালাজ করেই ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই, জগ্‌নার মায়ের ভাষায় 'পেয়াদার পীরিত' ছুটে গেছে। তার তাগাদার চোটে, লাঠি-ঠোকার বহরে বস্তীর মানুষেরা বড় বেকায়দায় পড়েছে। বিশেষ করে নটোদের ওপর লোকটার ভারি চোট। তাই নটোর পিসী যখন কেঁদে ফেলল, দুঃখের কথা বলতে বলতে তখন দশ টাকার নোটখানা দিয়ে বললাম---ভাঙিয়ে পাঁচ টাকা আমাকে ফেরৎ দিয়ে যাও, পাঁচ টাকা নিয়ে এখন কাজ চালাও। নটোর পিসী আর আসে নি জগনার মাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল নোটের ভাঙটি পায় নি। আজ তিনদিন হয়ে গেল, আজো ভাঙানী পায় নি, নাকি! মানুষের বিপদে জেনে শুনে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি নে, এটা কি আমার স্বভাবের দোষ! ওঁকে যদি বলি ব্যাপারটা তাহলে বকুনী খাবো। আচ্ছা নটোর পিসীর বোঝা উচিত ছিল যে, তার মতো আমারও টাকার

দরকার থাকতে পারে। এই করেই বুঝি মানুষ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছে !……

কদিন যেরকম অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কিছুই ভালো লাগত না, তেমনি আবার নতুন করে সংসারের কাজে মনটা বসে গেছে। অবিশ্যি মন-বসা না-বসার জন্যে কাজ ত পড়ে থাকে না, ছিলও না। আগে যদি বা মনিব ছিলেন একজন—এখন, আরও চারটি মনিব বেড়েছে। সবার কাছেই জবাবদিহি করার দায় আমার। তাই উনি যে-কদিন বাইরে ছিলেন সে কদিন কাজ যা করেছি মেসিনের মতো। আমার ছেলে, আমার মেয়ে—তাদের জন্যে করাটা কর্তব্য, করতে হয়, তাই করা। কিন্তু এখন উনি হাজির, কাজ তার জন্যে কিছু বেড়েও গেছে, তবু কাজের মধ্যে একটা বেঁচে থাকার স্বাদ পাচ্ছি। এ কথাটা যদি ওঁকে বলি, উনি ঠাট্টা করবেন। যাক-গে, কি হবে মুখে বলে।

তার চেয়ে আলুর টিকিয়া বানিয়ে রাখি। আপিস থেকে ফিরে টিকিয়া দেখে ভারি অবাক হয়ে যাবেন !

যা ভেবেছি ঠিক তাই। খুশির সুরে ধমক দিয়ে বললেন—'করেছ ভালো। তবে, বাড়তি খাটুনিগুলো করা কেন ! এসব ত না হলেও চলে।'

—মোটেই বাড়তি খাটুনি নয়। বিকেলে ছেলেদের জলখাবারটা করতেই হত। রাত্রের জন্যে আলুর দম করব, তা, শেষ আঁচে উনুনে চাট্টি কয়লা ফেলে দিয়ে চান করতে গেলাম। আলু সেদ্ধ চড়িয়ে দিয়ে খেতে বসলাম। চাট্টি বেশি আলু দিয়ে দিলাম— !

খেতে খেতে উনি বললেন—'একটা ফ্যাসাদে পড়তে হবে মনে হচ্ছে।'

—কি ? আবার বদ্‌লি নাকি ?

'না। আজ আপিসে এক ভদ্রমহিলা গিয়ে হাজির। হয়তো বাড়িতেও আসবে কাল সকালে। ঠিকানা নিয়ে গেল কিনা—'

— কে, কে-গো ?

ভদ্রমহিলাকে নাকি আমি চিনি না। ওঁর ছোটবেলার পরিচিত। অনেকদিন দেখা-শোনাও নেই। এমনকি মহিলা নিজের নাম বলাতেও উনি চিনতে পারেন নি, শেষে তাঁর ভাইয়ের নাম বলতে চিনেছেন। বছর খানেক ধরে এখানে ওখানে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছেন তিনি। ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলেন, বিশেষ সুবিধে হয় নি। দুটি ছেলের একটিকে অনাথ-আশ্রমে রেখেছেন। ছোটটি আমার নন্টুর বয়সী, তাকে আর কাছছাড়া করতে পারেন নি। স্বামী, হ্যাঁ স্বামী ছিলেন, হয়তো আছেনও কিন্তু কোথায় আছেন তা কেউ বলতে পারেন না। অভাবের পীড়নে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল—একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মহিলাটি এখন কোথাও রান্নাবান্নার চাকরি পেলে বর্তে যায়।

প্লেটখানা ফাঁকা হয়ে যেতে আর দুখানা টিকিয়া দিলাম। উনি মাথা নেড়ে বললেন—'এ দুটো তোমার। তা ছাখো না, যদি কেউ রাখে! আমি আপিসে দু-একজনকে অবিশ্যি বলেছি। তবে কি মুস্কিল জানো, ওই ছেলেটা ত রয়েছে। এমনি, একা মানুষ হলে কোনো গোলমাল ছিল না—দত্তরায় রাখতো, কিন্তু যেই শুনল সঙ্গে ছেলে থাকবে অমনি পিছিয়ে গেল।'

ওঁর ঘাড় থেকে দুর্ভাবনার বোঝাটা হাল্কা করার জন্যেই, কোনো কিছু না ভেবে বললাম—তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। আজকাল কাজের লোক সবাই খোঁজে। বিশেষ করে তোমার পরিচিত, তার মানে বিশ্বাসী, ভদ্র—ওর জন্যে ভাবতে হবে না।

কথাটা বলেছি বড় মুখ করে, কিন্তু আমি ত জানি, কেন বলেছি। দোহাই তুমি একটা কিছু উপায় করে দিয়ো ভগবান—নইলে ওঁর কাছে অপদস্থ হতে হবে। আর কারুর চিন্তায় উনি বিপন্ন, এ আমি সইতে পারিনে। সে যে-ই হোক না কেন।···

কাল রাতে অনেকক্ষণ সেই অচেনা মহিলার কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরেছি। আজও সকাল থেকে কয়েকবারই সেই ভাবনায় অস্বস্তি টের

পেয়েছি, নিজের মনে। মেয়েটা এসে গেলে বাঁচি। না, কাজ ত আর বললেই পাওয়া যায় না। তবে মানুষটাকে দেখলে পরে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজের চেষ্টা করা যায়।

ওঁর স্নানে যাবার সময় সেই মহিলা এলেন। আমাকে বৌদি বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। 'না, না', করলাম—কিন্তু কে কার কথা শোনে। উনি মুখ কাঁচুমাচু করে চা দিতে বললেন। মহিলা, মানে, ওই মেয়েটি—যার নাম ঝুণ্টু, তিনি আপত্তি করলেন। ঝুণ্টুকে ঘরে বসিয়ে উনি ফলাও করে বক্তৃতা জুড়ে দিলেন, কোথায় পাঞ্চেতে বুধ্‌নী সাঁওতালনীরা একজোটে নেহরুর কাছে দরবার করেছে যে, ওদের দেশ-ঘর যেখানে, যেখানে এতদিন ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাঁধ বানালো, রাস্তাঘাট তৈরির কাজে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটল, সেখানে হঠাৎ তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এখন কি খেয়ে বাঁচে, কোথায় যায়! এই ত সেদিনের কথা, যখন দেশের কর্তা খুশি হয়ে সাঁওতাল মেয়ের কাজের জন্যে পুরস্কার দিয়ে গেলেন নিজে হাতে—তখন কি কেউ ভেবেছিল যে ভবিষ্যতে ওরা ছাঁটাই হয়ে বরবাদ বাতিলের দলে পড়ে যাবে! বুধ্‌নীদের কি দশা এখন, ভাবো দেখি ঝুণ্টু!

আমি ওঁকে একটু বকলাম—আচ্ছা, এখন তোমার ওই বড় বড় কথা রেখে, যাও ত আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলছি। মেয়েমানুষের দুঃখ তুমি পুরুষ হয়ে কি বুঝবে! দেশের দশা নিয়ে লেকচার দিলে কি এঁর কোনো সুরাহা হবে?

উনি উঠে দাঁড়ালেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভালো। আরে সেই জন্যেই ত বাড়িতে আসার কথা বলেছিলাম। তবে কি জানো, ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশনটা জেনে রাখলে পরে নিজের দুরবস্থার জন্যে হতাশা কমে। এই জন্যেই বলি—।'

ঝুণ্টুদি, হ্যাঁ, ওঁকে দিদিই বলা যায়—বয়সে উনি আমার চেয়ে বড়োই হবেন। তাছাড়া হয়তো অভাব-অনাহারেও বয়েস খানিকটা

বেশিই দেখায়। দ অনেকক্ষণ রইলেন, অনেক কথা বললেন! অবস্থা দেখলে যা মায়া হয়, শুনলে তার চেয়ে বেশী কষ্ট হয়। সত্যি, আজ এ-বাড়ি কাল ও-বাড়ি—এমনিভাবে মানুষটা কি করে বেঁচে রয়েছে ভাবা যায় না! দুপুরে খেতে বললাম রাজী হলেন না, ছেলেটা ত না খেয়ে থাকবে। যে বাড়িতে এককালে ওঁরা ভাড়া ছিলেন সেখানেই কটা দিন আশ্রয় নিয়েছেন—ছেলেকে সেখানেই রেখে এসেছেন।

যাবার সময় দুটো টাকা হাতে দিতে গেলাম, নিলেন না, বললেন—'এ তো আমি চাই নি বৌদি! একদিন দুটো টাকা নিয়ে কি হবে! যাতে এই দোরে দোরে ঘোরা আমার ঘোচে সেটা করে দিন ভাই।'

দু-দিন পরে ঝুণ্টুদিকে দেখা করতে বলেছি। এর মধ্যে একটা কিছু জুটিয়ে দেওয়া যাবে না?

নণ্টু আমার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখছিল ঝুণ্টুদিকে, আস্তে আস্তে বলল—'সেই ভাইকে কাল আনতে বলো না মা, দোল খেলব আমরা!'

ছেলেটা বড় অবুঝ। সব দিক বোঝে না, জানে না যে এভাবে আসতে বললে ওরা আসবে, থাকবে—থেকেই যাবে। আমি তখন খরচ সামলাবো কি করে!

একটা মহাপর্ব গেল। দোল। সেদিন সকাল হওয়ার অনেক আগেই বোল্টু আর নন্টুর মাতামাতি। কলতলায় নেমে ওরা দুজনে রামরাজত্ব শুরু করে দিয়েছে। আমার বকুনি কানেই তোলে না, অগত্যা ওঁকে বললাম—ছাখো না একটু!

ওঁর দেখা আবার চরম দেখা। বলে দিলেন—'নটার আগে যদি কেউ রঙের ধারে কাছে যায় তাহলে তার দোল খেলাই বন্ধ করে দেবো।'

দুমিনিট আবহাওয়া থমথমে। তারপর নন্টু নিজের মাথাতেই খানিকটা রঙ ঢেলে ঘুরঘুর করতে লাগলো—'নটা কখন বাজবে? কতো দেরি আছে আর, ওমা বলো না।' পাগল করে দেবার দাখিল। শেষে শুরু হল ঘড়ি দেখা। ওঁর ঘরে বোধ হয় তিন চার পাক দিল, তখন উনি ঘড়িতে এ্যালার্ম লাগালেন—'ঠিক সময়ে এ্যালার্ম বাজবে। ঘড়ি দেখার দরকার নেই। যাও—'

কিন্তু যাবে কোথায়! তার আগে আমাকে পাগল করুক! আটটা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতেই আমার প্রাণ পালাই পালাই ডাক ছেড়েছে। পাশের বাড়ির হরেন, বিন্দু, মিন্নু সবাই নাকি দোল খেলছে। কান্না-কাটি শুরু হল। আর থাকতে না পেরে ওঁকে গিয়ে বলে ঘড়িটা আধ ঘণ্টা ফাস্ট করিয়ে তবে বাঁচি।

ওঁর বন্ধুরা একে-দুয়ে এসে জুটেছেন। ওঁদের পালা শুরু হবে এবার। পাড়ার সব বড় বড় মাতব্বর মানুষেরা ফাগ নিয়ে বেরুবেন। এর সঙ্গে গান চলবেঃ বসন্ত উৎসবের গান, ঢোলক, ম্যারাকাস হারমোনিয়ামও থাকে ওঁদের মিছিলে। এই একটি দিন ওঁরা দলবেঁধে আনন্দ করেন। প্রফেসর, আর্টিস্ট, লেখক, সাংবাদিক—সবাই নাম-করা

লোক। ওঁদের দোলের আনন্দে হুল্লোড় নেই, ছ্যাবলামি নেই—আছে কৌতুক আর সঙ্গীত। বেশ লাগে।

ওঁরা ফিরলেন বেলা বারোটায়। চা চড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম। দালানে সবাই রং-মাখা সং-সাজা চেহারা নিয়ে বসেছেন। গান হচ্ছে —'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল্, স্থলেজলে বনতলে লাগল যে দোল……'। গানের পরে চা, চায়ের সঙ্গে কুচো নিম্‌কি আর টুকরো আলোচনা 'মহাপ্রভুর শ্রীপাদুকা এসেছেন কলকাতায়। দেখতে যাওয়া হোক!' কথাটা কানে আসতেই মনে হল, আমিও যাবো।

ওঁর প্রফেসর বন্ধু বললেন—'হ্যাঃ, পাদুকা ত খড়ম। তার মধ্যে আবার দেখার কি আছে! যদি গৌরাঙ্গদেব আসতেন তা হলে—।'

শিল্পীর কিন্তু অন্য কথা, তিনি মাথা নেড়ে আপত্তি করলেন—'আরে মশাই, আপনার ইম্যাজিনেশন বড় মাঠো। ঐ শ্রীপাদুকার সঙ্গে কত বড় একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। কতজন যাবে, কি রকম তাদের চোখমুখের চেহারা হবে। আজকের দিনেও গৌরাঙ্গের নামে এতখানি সাড়া-নাড়া পড়ে এটাই ত'দেখার বস্তু—।'

রান্নাঘরের চৌকাঠে হোঁচট খেলাম। শিল্পী মশাইয়ের হুঁশ-বুদ্ধি একটু কেমন কেমন। হয়তো আমার মনের কথাটা আমার স্বামীও টের পেয়েছিলেন, নইলে বলবেন কেন, 'আপনাদের ওই কল্পনার দৌড়ের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিয়ে পারব না। কিন্তু যার তেমন জোর আছে সে খামাখা ভিড়ের গুঁতো খেতে ছুটবে না—ঘরে বসে খবরের কাগজ দেখে আন্দাজ করে নেবে। তাতে মেহনত বাঁচবে, পয়সা বাঁচবে, সময়ও বাঁচবে।

নস্যি নিয়ে শিল্পী মশায়ের গলার আওয়াজ একটু খনখনে হয়েছে, তিনি সেই খোনা গলায় প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন—'থামো হে ছোক্‌রা! যতো সব ইয়ে, দেখছি। শেষে দোলটাই মাটি করে দেবে তোমরা তর্কের ধকলে! কই বৌমা আর এক রাউণ্ড চা ছাড়ো বাপু! এনিওয়ে, আমি ভাই মজারু মেজাজের তাওয়ায় বসে সবটুকু দেখবার তামাশা

ফস্কাতে দেবো না। যাবোই, আমি বাণিজ্যেতে যাবো—' বলে ভদ্রলোক গান জুড়ে দিলেন আবার।

এককালে শিল্পী ভদ্রলোক নিজেও রাজনীতি করতেন। আজকাল কিন্তু সেসব ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর স্ত্রীর দুঃখ আমি জানি। দুনিয়ার পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে ঝগড়া—না, ঠিক ঝগড়াও করেন না, কেমন চোখা-চোখা কথার খোঁচা মেরে ছেড়ে দ্যান ভদ্রলোক। তার ফলে পয়সার কাজ একদম জোটে না। সংসারে নেই নেই ভাবটা লুকোনোর চেষ্টাও নেই, উপায়ও নেই। ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে দুঃখ হয়। তাদের দোষ কি? তারা এই খেয়ালী মানুষটার জন্যে ভুগে মরছে। অথচ ভদ্রতার খাতিরে সবই ওরা মুখ বুজে হজম করছে ত! আচ্ছা ভগবান, তুমি কেন এই লোকটাকে একটু সাংসারিক জ্ঞান দাও না?

থাকতে না পেরে ওঁকে এর আগে বলেছি, তা উনি বলেন—'খাঁটি শিল্পীর স্থান এ সমাজে থাকতে পারে না। আমাদের দাদা সেই জাত শিল্পী হয়েই ত সব ঘোলা হয়েছে। নইলে, ওঁর কতো ছাত্র আজ বড় বড় ফার্মে কর্তা ব্যক্তি—বিস্তর রোজগার করে তারা।'

আমি অবাক হয়ে যাই, ছাত্ররা বড়লোক হচ্ছে আর ওঁর এ দুরবস্থা কেন? উনি বলেন—'কম্প্রোমাইজ করতে পারা চাই। অন্যের অনেক অন্যায়কে না দেখে, না সমালোচনা করে, মানিয়ে নিয়ে চলতে পারা চাই। সেটা উনি পারেন না। অবিশ্যি এরকম মানুষ কম হলেও সংসারে থাকা দরকার। আমরা অন্যায়কে মনে মনে অন্যায় বলি অথচ মুখে সেটা বলতে পারি না—মন আর মুখের কথায় তফাত না থাকাই ত উচিত। আমরা তা জানি, জেনেও চুপ করে থাকি। তাতে অন্যায় বাড়ে—বাড়তে বাড়তে একদিন অন্যায় আমাদের গিলে খেয়ে ফেলবে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকবে না। যতদিন স্পষ্ট করে ন্যায় অন্যায়ের কথা বলবার মতো মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিনই মানুষ মানুষ!'

ওঁর কথাগুলোও বুঝি। কিন্তু যে মানুষ নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়ের দিকে তাকায় না সে মানুষ কেমন মানুষ, তুমি বলতে পারো? আমি কোনো জবাব খুঁজে পাই নি।

আজ জবা এল। বলল—'তোমরা ত এখানে খুব হাঙ্গামা করলে দোলে। আমার কপালটাই খারাপ দিদি, খরচপত্তর করে যাওয়াই সার—অথচ মজার ভাগে জিরো!'

—কোথায় গিয়েছিলি?

—শান্তিনিকেতন।

—হঠাৎ?

—আর বল না। সেই ভদ্রলোক বললেন, শান্তিনিকেতনের দোল বড় কাব্যিক দোল। কুঞ্জে কুঞ্জে গান, নাচ, ফাগ। গাছে গাছে পাখি ডাকে, সেই সুর অনুসারেই নাকি রবীন্দ্রনাথ গানে সুর দিতেন। আর এখন সোনালী পলাশ, শিমূল, বনপুলক, যোজনগন্ধা, নীলমণিলতার ফুলদোলে বসন্ত মনকে মাঁতোয়ারা করে দেবে। তাই পালিয়ে গেলাম। বাড়িতে অবিশ্যি সবাই জানল যে, ওখানে একটা বড় চাকরির খবর আছে তারই চেষ্টায় যাচ্ছি।

—তারপর!

—'আচার্য ক্ষিতিমোহন দেহ রেখেছেন। উৎসব বন্ধ। কিন্তু যাওয়া আসার পথে ত তাণ্ডব বন্ধ হয় নি। তিন দিন আগে দোল গিয়েছে কিন্তু আজও ট্রেনের কামরায় কাদা ছুঁড়ছে। আপিসে আসছে লোকে স্যুট্ পরে, দিল একতাল কাদা ছুঁড়ে। কি কাণ্ড বলো দেখি। গাড়িতে এক ভদ্রলোক জামা কাপড় ছেঁড়া নিয়ে উঠলেন—কি ব্যাপার? তিনি শাসন করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে এই দশা।

জবারও চেহারায় রুক্ষতা এসে পড়েছে। বয়েসে আমার ছোট। কিন্তু ওর দিকে, তাকালে সেটা মনেই হয় না। বেচারী এই বয়স পর্যন্ত কেবল লড়াই করে যাচ্ছে। এখনো বিয়ে-থা হল না। কিন্তু বাঁচার

মতো বাঁচতে কার না সাধ যায়। সেই তাগিদেই পালিয়েছিল। আবার ফিরতে হয়েছে ওকে, বিবেকবুদ্ধির গুরু দায়ে।

আমাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে ও বলল—'জামাইবাবুর সঙ্গে তোমার ঝগড়া চলছে বুঝি? নাঃ, তাহলে চাটুকুও কপালে নেই দেখছি।'

—তা কেন, এই ত সবে এলি। বোস্ না।

জবা বসবে কি, নণ্টুর জন্যে ও বেচারীর থির হবার জো আছে! তার ওপর সবে আজ নণ্টুর পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। নণ্টু এবার ফার্স্ট হয়েছে। তার লাফালাফি দেখে কে। উনি আপিস থেকে ফিরলে আর এক পত্তন মাতামাতি চলবে। কবে নাকি নণ্টুকে উনি বলেছিলেন—ফার্স্ট হলে পুরীর সমুদ্র দেখাবেন। তা সেটা ঠিক মনে করে রেখেছে ছেলেটা। পড়ার পড়া যেমন মনে থাকে তেমনি এসবও ভোলে না।

উৎসাহের দাপটে নণ্টু জবার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে লাগল। নণ্টুর মাথাটা ভালো, ওকে ভালো স্কুলে দিতে পারলে মানুষ হত। মেয়ে দুটোর ওপর তেমন ভরসা নেই। বোল্টুর শরীরটা কিছুতেই জোর ধরছে না। নইলে ছেলে হিসাবে বোল্টুও মন্দ নয়। ওদের দুভাইকে ওঁর ইচ্ছে মিশনারীদের স্কুলে পড়ানোর। কিন্তু আয়টা সে ইচ্ছে পূরণ করার যোগ্য নয়। এমনি অন্য সাধারণ স্কুলের কথাও জানতে আমার বাকী নেই—ছেলেরা সব ম্যাটিনিতে সিনেমার টিকিট কেনার লাইন লাগায়। ওদের দিকে তাকিয়ে গায়ের রক্ত আমার হিম হয়ে যায়। হায়, হায়! এদের মা-বাবা নিশ্চিন্ত আছেন যে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখছে—মাসের পর মাস মাইনের টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। অথচ—!

জবার সঙ্গে পরামর্শ করেছি, আজও করলাম। ও বলল—শহরের সব স্কুলেরই এই দশা। যদি পাড়াগাঁয়ের কোনো ইস্কুলে পাঠাতে পারো তাহলে এই শহুরে নোংরামির হাত থেকে বাঁচোয়া—!

—আচ্ছা জবা, তাহলে কি তুই বলতে চাস যে, শহরের সব ছেলের

মা-বাবা তাই করবে ? সেটা কি সম্ভব ! তার চেয়ে শহরের স্কুলগুলোর ওপর সবার কড়া নজর থাকলেই মিটে যায় ল্যাঠা !

'কে রাখবে নজর !'

—কেন, হেডমাস্টার, অন্যান্য সব মাস্টারই রাখবেন।

'আর বল না। নিয়ম ত আছে যে, ছেলেরা স্কুলের বাইরে যেতে পারবে না। কিন্তু সেটা খাতাপত্রেই। আমাদের বাঁটুলের কথা ত জানো—ওর বাবা সাত মাস পরে টের পেলেন, ছেলে স্কুলে যায় না, মাইনে দেয় না, পরীক্ষাও দেয় নি ! অথচ যে স্কুলে বাঁটুল পড়ে সেখানকার আইনে ছাপা আছে—যদি কোনো ছেলে উপরো-উপরি তিন দিন কামাই করে তাহলে গার্জেনের কাছে চিঠি লিখবেন স্কুলের হেডমাস্টার। এটা কি করে হচ্ছে বলো ?'

—অথচ ওঁর কাছে ত শুনি শিক্ষার জন্য সরকার কোটি-কোটি টাকা খরচ করছেন।

'হ্যাঁ টাকা ঠিকই খরচ হচ্ছে। তবে তার বেশির ভাগই কণ্ট্রাক্টরদের পিছনে যাচ্ছে। অজ পাড়াগাঁয়ে, যেখানে সাধারণ বাসিন্দাদের চালাঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় কি হয় না, সেখানে গিয়ে ছাখো মাল্‌টি-পার্‌পাস-এর ইমারত হাঁকড়ানো হচ্ছে—ওই চালাঘরের ছেলেদের লেখাপড়ার জন্যে রাজবাড়িটা আগে দরকার, না, একটু দুধ, দু-মুঠো ভাত আগে দরকার ! কিংবা ভালো মাস্টার দরকার। আরে দিদি, তুমি জানো না—কারখানার চাকরি পেলে লোকে আর মাস্টারি চায় না। সেখানে তুমি ইমারতের খরচ কমিয়ে এই সব দিকে আগে নজরটা দিলে ত কাজের কাজ হয়।

কিন্তু আমাদের শহরের কি দশা হবে ভাই !

জবা হাসল—যে তিমিরে সেই তিমিরে। নতুন সমাজ, নতুন শহর, নতুন মানুষের দিন আসছে দিদি। তুমি-আমি ভেবে মরলেও কিছু লাভ হবে না। কি যে আসছে সেটা আজকে আমরা আন্দাজ করতে পারছি না। যাক, এখন দশটা টাকা দিতে পারো ?'

টাকা কোথায় পাবো? তবু পাঁচটা টাকা দিতে হয়। বাইরে ঘুরে এসে ওর হাত ফাঁকা হয়ে গেছে। বাকী কটা দিন ত চলা চাই। যাবার সময় জবা বলল—এদিক দিয়ে শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থাটা অনেকখানিই আমাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়। ওখানে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে। খালি পায়ে কতো যে হাঁটতে হয় ওদের তার হিসেব নেই। বেশ লাগে। ভেতরের কথা জানিনে দিদি, তবে ওপর থেকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে আমাদের শিক্ষার কাঠামো গড়া হয় নি, এখনো হচ্ছে না—যা হচ্ছে তাতে কাঠামোর ছাঁচে মানুষকে ঢালাই করার চেষ্টা। এটা ঠিক রাস্তা নয়।'

—তাহলে এ সব জেনেশুনে তুই মাস্টারি করছিস কেন?

'কেন! এ কেনর জবাব দেবার মতো খাঁটি মানুষ কটা আছে! আর কিছু জোটে না বলে, বুঝলে! আমি কেন, বেশির ভাগই তাই—দু-একটা সত্যিকারের মাস্টার থাকেন তাঁরা আশপাশের চাপে চ্যাপ্টা।...'

জবা বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটি ছোকরা দরজার মুখে ওকে প্রশ্ন করল, ওঁর নাম করে। ছেলেটিকে এর আগেও দু-একদিন দেখেছি আসতে। ও আসে চাকরির উমেদারি করতে। কতোই বা বয়েস—বড় জোর বাইশ-তেইশ হবে।

জবা ত উনি বাড়ি নেই বলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তবু সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারছি না। সে হঠাৎ বললে—'দেখুন, আমি একটু বসলে আপনাদের অসুবিধে হবে? মানে সারাদিন ঘুরেছি কি না! দাদার ত বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। মানে ওঁর সঙ্গে দেখাটা করে যেতে চাই।'

কি বলি! ওঁর ঘরে এসে বসল, জল চাইল। মুখচোখের চেহারা দেখে বেশ বোঝা যায় যে খুব ক্লান্ত আর হতাশ। হয়তো ক্ষিদেও পেয়েছে! বললাম—চা-টা খাবেন?

হ্যাঁ বলতে গিয়েও যেন পারল না। হেসে ফেলল। রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে সে বলল—'আমাকে দেখেই ধরে ফেলেছেন।'

ওঁর আসতে দেরি হচ্ছে। নন্টু ঘর-বার করছে। এদিকে সেই ছেলেটিও বসে থাকতে থাকতে অনেক কথা বলল—তাকে এখন বাঁশবেড়ে থেকে রোজ যাওয়া-আসা করতে হয়। অথচ কলকাতায় তার দাদা-কাকা সব আছেন। কেন? গান শেখাতে-শেখাতে সে ছাত্রীকে বিয়ে করে ফেলেছে বলে। নিজের পায়ে দাঁড়ানো যে এত শক্ত তা জানা ছিল না। বন্ধুরা সবাই সাহস দিয়েছিল, বলেছিল বিদ্রোহ ছাড়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু এখন কেউ সাহায্য করে না। দমদমেই প্রথমে বিয়ের পর ঘরভাড়া করে দুজনে ছিল ওরা। সেখানে বাড়িওলাদের ছেলে-বুড়ো সবাই নাকি বৌটাকে বিশ্রীভাবে জ্বালাতন করত। তা ছাড়া খরচও ত চলা চাই—গানের টুইশান মেলে কই! রেকর্ডে গাইবার চান্স পাওয়া সহজ নয়—কোনো জায়গায়ই নামকরা গাইয়েদের ঘোঁট ফুঁড়ে ঢোকা যাচ্ছে না। এদিকে লেখাপড়াটাও তেমন শেখে নি সে, দুটো নীচু ক্লাসের টুইশান। আর একটা বিলিতি কোম্পানির দালালি—সেখানেও নয়া লোককে অর্ডার দিতে চায় না দোকানদারেরা, কমিশনের ওপর ত আয় দাঁড়াবে! এই সব ফৈজতে পড়ে এখন বাঁশবেড়েতে পিসীর বাড়ি ওরা দুজনে গিয়ে উঠেছে। স্টেশন থেকে মাইল দুই, এ-বেলা ও-বেলা দু-মাইল হেঁটে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতে হচ্ছে। তবে পিসীমা মানুষ ভালো। আশ্রয় দিয়েছেন ত!...

ওঁর সঙ্গে দেখা হল না ছেলেটির। ট্রেনের তাগিদ আছে।

এই বয়সে এরকম ভাবে জড়িয়ে পড়েছে বেচারী! এত সাধ করে বিয়ে করে এখন বোধ হয় বৌয়ের সঙ্গে মুখ তুলে কথাও বলতে পারে না।

জবার বয়স পেরিয়েছে, বিয়ে করার উপায় নেই—আর এই ছেলেটি অল্প বয়সে বিয়ে করে কী ফ্যাসাদে পড়েছে! আচ্ছা ভগবান, তোমার দাঁড়ি-পাল্লায় এমন বে-আন্দাজী ওজনের ফেরে মানুষকে ফেলাটাই কি পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে!...

১১

কি যে রান্না করি, সকালে উঠে আমার কান্না পায়। বাঁধাকপির বড়াও আর কেউ খেতে চায় না। বলে, 'এর চেয়ে ঘাস ভালো।' সেদিন মোচার ঘণ্ট ছোলা-বড়ি দিয়ে রান্না করেছিলাম, তা নণ্টুবাবুর গলা দিয়ে নামতেই চায় না।

অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম– তরকারি খাওয়া ভালো। তরকারি খেলে গায়ে জোর হয়।

ঠোঁট উল্টে গম্ভীর ভাবে বললে—'এঁঃ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস এলেন—নতুন আবিষ্কার করেছেন মোচা খেলে গায়ে জোর হয়।'

ধমক দেবো, কি হাসব ভেবেই পাই নে।

আজকাল এত অল্প বয়সে ছেলেরা পাকা-পাকা কথা শেখে যে আমার বাপের জন্মেও তা মাথায় আসবে না।—

মোচা রুচবে না, কপি মুখে তুলবে না। কি রাঁধি। পটল দেড় টাকা—ছোঁবার উপায় নেই। ঢেঁড়স এক টাকা সের—তা দিয়ে ত আর গোটা তরকারি করা যায় না। ঝিঙ্গে দশ আনা সের। বাকী থাকে কুমড়ো আর এঁচোড়—ব্যস চুকে গেল বাজারের আনাজের দৌড়। মাসের শেষ, হাত ফাঁকা অথচ ভাতের কোলে মনের মতো তরকারিটি নইলে ছেলেমেয়ে নারাজ।

আজ অবিশ্যি বড়ি ভাজা দিয়েই ওরা সোনা-হেন মুখ করে অর্ধেক ভাত খেয়ে নিল। বড়িগুলো পাঠিয়েছেন বিরামপুরের উমাশঙ্করের দিদি—বড়িগুলো দেখলে আর রাঁধতে ইচ্ছে করে না। ফুল, লতা

পাতার কল্কা করা এক-একটি নিঁখুত শিল্পকাজ—তুদণ্ড চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। এমন সুন্দর জিনিস ঘরে সাজিয়ে রাখতে পারলেই ভালো হয়। অথচ আমরা তা করি নে, খেয়ে ফেলি! এ ধরনের বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ আজকাল বড় একটা দেখাই যায় না। আমি ত পারিই না—আমার চেনা-জানা আর কাউকেও দিতে দেখি নি। আমাদের এই জীবনে শিল্পের ঠাঁই কতো কমে গেছে। আলপনার বেলাতেও সব ঘরের সব মেয়ে তেমন পটু নয়। আমরা শুধু নকলের চর্চায় সময় খরচ করি। মাথার চুল কমে যাচ্ছে—সেটা ঠেকানোর চেয়ে ডো-নাট্, রোল, এই সব আজেবাজে বস্তুর সাহায্যে অভিনবত্ব দিয়ে অন্যকে ঠকানোর দিকেই আমাদের বুদ্ধি খরচ করি। এমনি যেন সব ব্যাপারেই।…

বোল্টু আর নন্টু তুজনে মিলে খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি করছে। তা থেকে হাতাহাতি। আমি গিয়ে পড়তেই ওরা আপোষ করে নিয়ে আমার কাছে কাগজখানা হাজির করল। তুজনে সমস্বরে বললে—'পরীক্ষার হলে কি কাণ্ড হয়েছে গ্যাখো মা। খাতাপত্তর ছিঁড়ে তচ্‌নচ্‌।'

পর-পর কদিনই এই হাঙ্গামা চলেছে। শুধু এবারই নয়, কয়েক বছর ধরে এই গোলমাল হৈ-হল্লা যেন ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা এটা কেন হয়? পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়েছে বলে সবাই ত আপত্তি করে না। যারা বই পড়ে নি তারা ফেল করার অগৌরব বরণ করে নিতে রাজী নয়—ব্যস, অমনি আর সব ছেলের খাতা ধরে টানো, ছেঁড়ো, তারপর দল পাকিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ভণ্ডুল করে দাও! এ কেমন শিক্ষা আমাদের!

কাগজে কাগজে একটা ধুয়ো উঠেছে পরীক্ষার প্রশ্ন সহজ করো। আমার ত মনে হয় যতো সহজই হোক প্রশ্ন, লেখাপড়া না শিখলে—সহজ প্রশ্নের উত্তরও ছেলেরা দিতে পারবে না।

সবচেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছি: কটি ছেলে গার্ডের কাছে দস্তুর

মতো বই দেখে নকল করার আব্দার ধরেছিল। গার্ড আপত্তি করাতে তারা মারধোর করে চেয়ার টেবিল ভেঙে জানালার কাচ গুঁড়িয়ে দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছেঃ পরীক্ষা ভণ্ডুল করেছে। যেন সেটাই পরীক্ষার বিষয়।

উনি বললেন—'দিলেই হত বই। যারা ফেল করবার তারা টুকেও পাস করতে পারতো না। আরে বাবা বইয়ের কোন্ পাতায় কি বিষয় লেখা আছে সেটা কি তারা জানে ছাই! যদি তা জানতো তাহলে হাঙ্গামার কথা মাথায়ই আসত না।'

এ এক আশ্চর্য অবস্থা। যারা এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কাছেও যদি নাকে-কান্না শুনতে হয় তাহলে? এই যে সেবার প্রশ্ন কঠিন বলে এম. এ.-র পরীক্ষার্থীরা বেরিয়ে এল—এটা কী দারুণ লজ্জার কথা! এম. এ. হল মাস্টারের ডিগ্রী—সেখানে ত পাঠশালার মতো ক-খ করে গুলে বেটে খাইয়ে দেওয়ার কথা নয়। এম. এ.-র ছাত্ররা নিজে নিজেই বেশি পড়বে এটাই আশা করে সকলে—পাঠ্য বলে দাগ-মারা কখানা বইতে সে জ্ঞানের সীমা টেনে দেওয়ার কথা নয়—সেই শেষ চূড়ার ডিগ্রী-গৌরব পাবার যোগ্যতা যাচাই করবার এক্তিয়ার থাকবে না পরীক্ষকের! তা হলে ওটাকে শিক্ষা না বলে তক্‌মা নাম দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

এ সব খবর আবার ফলাও করে খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে। নণ্টু বণ্টুর মতো ছোটছোট ছেলেমেয়ে যারা সাধারণতঃ কাগজের খবর নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা এইসব ছবি দেখে অবাক হয়ে যায়। তারপর যদি ওরা ভবিষ্যৎকালে এই সব মতলব কাজে লাগায়! আচ্ছা ভগবান্ তুমি এই খবরের কাগজের মাতব্বরদের একটু সুবুদ্ধি দাও না কেন!

কথাটা অমনি অমনি বলছি নেঃ ধানবাদে লাউডস্পীকার লাগিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব জাহির করছিল যারা তারা নিশ্চয় রায়ো-ডি-জানেইরো'র খবর কাগজে পড়েছিল।

ওমা, তা বুঝি শোনো নি তুমি! দস্তুরমতো একটা ছোট-খাটো

রেডিয়ো অফিস সঙ্গে করে একটা ছেলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। সে প্রশ্নটা মুখে মুখে বলছে, তাই শুনে অপরপক্ষ রেডিয়োতেজবাব পাঠিয়ে দিচ্ছে! ভাবো তো একবার কাণ্ডখানা।

এসব দেখে আমার ত মনে হয় ছেলেদের বুদ্ধির অভাব নেই, তবে সেটা কাজে লাগানোর দিকে লক্ষ্য না রেখে বাঁধাধরা ছকে 'তোতা কাহিনী' মগজে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

যার যেদিকে মাথা খেলে তাকে সেইভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়াই আসল কাজ।

আমাদের দেশের সবদিকেই একটা এলোমেলো ভাব। যাদের মাথা ব্যথা হবার কথা সেই সব লোক অন্যদিকে ব্যস্ত। শিক্ষকরা এখন ধর্মঘট করেন—তাঁদের মাইনে বাড়াও। তাঁরা পড়াবেন, না পেটের চিন্তা করবেন? ছেলেরা শিখবে কোথা থেকে! নোট বই তাদের বেদ—নোটের বাইরে থেকে প্রশ্ন এলেই তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। তারা মাস্টারমশাইদের অনুকরণে স্ট্রাইক শিখেছে।

উনি বলেন—'এটা প্রতিবাদের যুগ। সবাই প্রতিবাদ করছে।'

কাজের কাজ করবার হাওয়াটা এদেশ থেকে উবে গেল নাকি! দোষ দিতে গেলে কাউকেই পুরো দায়ী করা চলে না—তবে দোষ কার? ভাগ্যের!

কিন্তু ভাগ্যের হাতে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। উদ্ধারের উপায় বার করতেই হবে—নইলে আমাদের ছেলেমেয়ে-গুলো অমানুষ হবে। এ যে ভাবাই যায় না। যদি স্কুল-কলেজের কর্তারা, শিক্ষা-বিভাগের মোটা মাইনের চাকুরেরা এ ব্যাপারে চোখ বুজে বসে থাকেন তাহলে আমাদের অর্থাৎ মা-বাপ, দাদা-দিদিদের এদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। পেট ভরে খাই না-খাই ছেলেমেয়েদের মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে—হবেই।

ভগবান তোমার কাছে সব ব্যাপারেই শরণ নিচ্ছি, কিন্তু তুমি এত উদাসীন যে মনে হয় আমার কথায় কানই দিচ্ছ না।...

ছেলেমেয়ে কটা পাস করেছে। এখন সামনে ওদের বই কেনার সমস্যা। টাকা চাই। যা সব বইয়ের দাম!

সামনের মাসে ওঁর এক নতুন চাকরি হবে—ঘুরে ঘুরে বই খুঁজে আনা। অবিশ্যি এক মাসে সব বই কেনাও যাবে না। আর কটা দিনই বা পড়া হবে? গরমের ছুটি পড়বে। মার্চ মাসটা পরীক্ষা আর ফলাফল নিয়েই ছেলেমেয়েদের কাটল। এপ্রিল যাবে নতুন বই কেনার ধান্দায়, তারপর এসে পড়বে গরমের ছুটি। পড়া শুরু হতে হতে সেই আষাঢ়ের ধাক্কা। এর চেয়ে আগেই ছিল ভালো। মাত্র বড়দিনের অল্প ছুটি--তারপরই জানুয়ারীতে পড়া শুরু হত—একটানা মে-এর গোড়া অবধি লেখাপড়া চলতো। কোথা থেকে যে এই উদ্ভট মার্চে বছর খতমের নিয়ম এল। আসল কাজের কাজ না হোক এই ধরনের ওলট-পালট হামেশা হচ্ছে। শুনছি নাকি আবার পুরনো নিয়ম চালু হবে। হোক--!···

টিয়া পাখিটা আজ বড় ছট্‌ফট্ করছে। বেড়ালের উৎপাতের ভয়ে ওকে আমাদের ঘরে এনে রাখা হয়েছে। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, ওর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজে প্রথমে তা বুঝি নি। ভেবেছিলাম, চোর-টোর না কি? কান খাড়া করে রাখলাম—আবার কোনো শব্দ হয় কি না। অবিশ্যি আমার যা সাহস তাতে চোরই যদি হয় তাহলে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে না। তবু—। যখন বুঝলাম পাখির ডানার শব্দ, তখন উঠে পড়লাম। চৌকির তলায় নিশ্চয় মশা কামড়াচ্ছে বেচারীকে। কি করি? একটা চাদর দিয়ে খাঁচাটা ঢেকে দেবো? দম আটকে মরে যাবে না! আচ্ছা, ওরা ত বনে-জঙ্গলে থাকে তখন ওদের কি মশাতে কামড়ায় না? কি জানি।

অনেক ভেবে শেষে নন্টুর ছোটবেলার ঢাকা মশারিটা সিঁড়িঘর থেকে এনে ঢেকে দিলাম।

উঃ যা সাংঘাতিক মশা হয়েছে এপাড়ায়—বাইরে বসে থাকাই দায়।

উনি বলছিলেন সেদিন নাকি কর্পোরেশনের কোন্ কাউন্সিলার বলেছেন, যে মশা-মারা তেল ছড়ানোর জন্যে যে টাকা খরচ করা হয় তা দিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলের লোকেদের মশারি কিনে দেওয়া হোক। তাতে কি রেহাই হবে? মশারি ত কেবল ঘুমোবার সময় কাজে লাগে। কিন্তু রান্না, খাওয়া, লেখাপড়া করা বা বসে থাকা—কিছুই যে শান্তিতে করা যাচ্ছে না। আমি ত ভাবছি মশারির বদলে বোরখা বানানোর আর্জি করবো।...

ওঁর সেই পরিচিতা মহিলা ঝুণ্টুদি আজ দুদিন হল এখানে আস্তানা নিয়েছেন। বলা নেই কওয়া নেই ছেলের হাত ধরে রাত নটার সময় এসে হাজির। কি সমাচার? না, কোথায় একটা কাজের বন্দোবস্ত হয়েছিল। সেখানে ছেলেকে নিয়ে দুদিনও টিকতে পারেন নি। তারপর ফিরে গেলেন পুরনো আশ্রয়ে। তারা আর আমলই দেয় নি, বলেছে —'বাড়িতে অনেক আত্মীয় এসেছে অতএব জায়গা হবে না।' অগত্যা—!

রাতবিরেতে মানুষকে ফিরিয়েও দেওয়া যায় না।

আবার রান্না করতে বসি। ঝুণ্টুদি অবিশ্যি বলেছিলেন—'ওসব হাঙ্গামা করো না বৌদি। এমনি বেশ থাকবো। যদি কিছু থাকে ত ছেলেটাকে দাও।'

তাই কি পারা যায়!

ইচ্ছে না থাকলেও না-বলে উপায় নেই। 'কাজ-টাজ দেখে নিন, এভাবে আর কদিন চলবে।'

আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে চেষ্টা করে দুতিন জায়গায় কাজের খোঁজ পেয়ে তাঁকে পাঠালাম। উনি যান আর ফিরে এসে বলেন—'লোক বেশি।' কিংবা 'খাটুনি বেশি।' অথবা 'বাজার হাট করা, বাসন মাজা, হাঁড়ি-ঠেলা সব কাজ কি একজনের ঘাড়ে চাপানো চলে! একা মানুষ আমি অতো রকম পারবো কেন?'

দুদিন ধরে এই এক রুখু ঝামেলাতে পড়েছি। মুখে কড়া কথা বলা

আমার অভ্যাস নেই। কিন্তু উনি বিরক্ত হয়ে ঝুণ্টুদিকে বললেন—'তোমার মনের মতো কাজ জুটবে না। মনকে কাজের মতো তৈরি করো।' ঝুণ্টুদি চোখের জল ফেললেন।

এই দু-দিনে যা বুঝেছি ওঁর ধারণা সিনেমা থিয়েটারে একটা চান্স পেলে উনি টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। আমাকে সাধাসাধি করেন, সিনেমা দেখতে যাবার জন্যে। বলেন—'চলো না বৌদি, ম্যাটিনিতে চুপি চুপি দেখে আসি, দাদা টেরও পাবেন না। টিকিটের পয়সা আমি দেবো।'

আশ্চর্য লাগে। এ কেমন মন!

ছেলেটা ত কথায় কথায় নণ্টু, বোণ্টুকে বলে—'আমি টিঙ্কু রিঙ্কুর মতো নাম কিনব। মামণি ত বলে আমি কেমন স্মার্ট!'

ছেলে দুটোর জন্যে ভাবনা হচ্ছে। ওই পুঁচকে খোকা সে কিনা স্মার্ট। সে কিনা স্টার! কি যে করি। ওঁকে যদি এসব কথা বলি তাহলে উনি নির্ঘাত ঝুণ্টুদিকে বাড়ি থেকে হাঁকিয়ে দেবেন—তখন ঝুণ্টুদি কোথায় যাবেন? অথচ এভাবে আর সয়ে থাকা যাবে না।

চৈত্রের মাঝামাঝি হতে চলল—অথচ এখনো রাতে গায়ে চাদর দিতে হচ্ছে। ওদিকে ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে মহাদেব' হেঁকে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে যেচে বেড়াচ্ছে সন্ন্যাসীর দল। আমাদের নর্দমার ওপারের অর্ধেক ছেলে-বুড়ো সন্ন্যাস নিয়েছে। ওরা সব ঘুরছে। ওরা 'বাবার ভক্ত' ধর্ম করছে, পুণ্য জমাচ্ছে, অথচ ওরাই অন্য সময়ে কেউ রেলের ওয়াগন ভাঙ্গে, কেউ ছিঁচকে চুরির দায়ে ধরা পড়ে মেয়াদ খাটে, কিংবা অন্যের বৌ-ঝির সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করার অপরাধে মারধোর খায়! ওদের দিকে তাকালে আমার ভারি অবাক লাগে। মনে হয় ওরা যেন অন্য, ওরা যেন ভিন্ন—আমাদের পাশাপাশি থেকেও ওরা যেন আমাদের মতো নয়।

তবু ঝুণ্টুদির মতো মানুষের চেয়ে ওদের আমি পছন্দ করি।

১২

ভালোর কাল বুঝি সত্যিই আমাদের এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

আমাদের এপাড়ায় এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁকে সবাই 'বেল কাঠ' বলে আড়ালে ঠাট্টা করে। আসলে মানুষটি কড়া, গোঁড়া নীতিবাগীশ, পরের অন্যায় দেখলে সইতে পারেন না —মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলেন। সেজন্যে তাঁকে অনেকেই অপছন্দ করে, তবু এধরনের মানুষ পাড়ায় থাকা দরকার—একথা উনি বলেন, আমি ত বলিই। হঠাৎ তাঁর নামে আদালতের সমন এসে হাজির। কি ব্যাপার? সবাই অবাক। কথা চলে হাওয়ার আগে। শুনলাম নাকি পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েকে তিনি অপমান করেছেন। মানে, ওদের ঘরে ঢুকে তার গায়ে হাত দিয়েছেন, খারাপ মতলব ছিল, এই সব! বিশ্বাস করতে মন নারাজ। এ যে কল্পনাও করা যায় না। ভদ্রলোককে আমি কতোবার দেখেছি। আমার স্বামী ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীরও আলাপ আছে। কথাটা কানে যেতে বিশ্বাস হয় নি। উনি অফিস থেকে ফেরার পর শুনলেন, শুনেই ছুটলেন ভদ্রলোকের বাড়ি। একবার ভাবলাম যেতে বারণ করি, আবার মেয়েলী কৌতূহল পেটের মধ্যে পাক খাচ্ছিল, তাই বললাম একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে।

অনেক রাতে উনি ফিরলেন, থমথমে গম্ভীর মুখ। আস্তে আস্তে শুধু মাথা নাড়লেন, 'নাঃ আমাদের বনেজঙ্গলেই চলে যাওয়া উচিত। কিছুদিন ধরেই নাকি পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা চেষ্টা করছিল ঐ ভদ্রলোককে তাড়াবার জন্যে। উনি উঠে গেলে ওই ভদ্রলোকের

ঘরগুলো তারা দখল করবে। তাদের হাতে কাঁচা পয়সা হয়েছে হালফিল। কারবার ফেঁদে ফেঁপে উঠেছে। দুটো ফ্ল্যাটের একটিমাত্র কল, বাথরুম। ঐ নিয়েই গোলমাল শুরু হয়—ওরা ভদ্রলোককে চরিত্রহীন, মাতাল, জুয়াচোর বলে উড়ো উড়ো কথা শোনায়। ইনি তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন—এরকম করবেন না। এতে কোনো লাভ নেই। আমরা পাশাপাশি থাকি, যতদিন অন্য কোথাও উঠে না যাই ততদিন ত প্রীতি বজায় রেখেই থাকা উচিত। অবিশ্যি আপনাদের ঘরের দরকার মানি, কিন্তু আমি কোথায় যাই বলুন, তাছাড়া আমি এই বাড়ির গোড়ার আমলের ভাড়াটে। জানেন ত, ইচ্ছে থাকলেও আজকাল বাড়ি জোটানো সহজ নয়।...এই গেল প্রথম। তারপর, বাড়িওয়ালাও—এই চক্রান্তে দুয়ো দিল—দল পাকিয়ে ওরা মতলব এঁটে, নাকি থানায় ডায়েরী করে এসেছিল। তলে তলে সাক্ষী-সাবুদ সাজানো হয়ে গেছে।...'

যা গতিক তাতে আদালতে হাজির হয়ে ঐ ভদ্রলোকের পক্ষে প্রমাণ করা শক্ত হবে যে তিনি এসব কাজ করেন নি। অথচ আসল সত্যি ত এরা সবাই জানে যে, ভদ্রলোকের কোনো দোষ নেই। আর যদি তেমন তদ্‌বির না করতে পারেন ভদ্রলোক তাহলে মামলায় হেরে যাবেন। তখন তোমার সত্যের মর্যাদা কোথায় থাকবে বলতে পারো ভগবান।

আমার স্বামীর কাছে ভদ্রলোক বলেছেন যে, যা হয় হবে তিনি সত্যি কথাই বলবেন। উকিল দেওয়া, পাল্টা সাক্ষী সাজানো এই সব যদি করতে হয় তাহলে তাঁর আত্মহত্যা করাই নাকি ভালো!

ভাবতে ভাবতে রাতে আর ঘুমই এল না। শুধু এই ভদ্রলোকেরই এই দশা তা নয়, এরকম আরো মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। হরিপদ মাস্টারকেও রামবাবু ত এই ধরনের ফ্যাসাদে ফেলেছে। রামের ছেলেটার বয়েস আর কতোই হবে! বড়জোর বারো কি তের। ওপাড়ার খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলেটার হাতটান হয়েছে বেজায়।

এমনিতে লেখাপড়ায় মাথা ভালো বলে ছেলেটাকে ভালো করবার জন্যে হরিপদবাবু কী মেহনতই না করতেন। রামবাবু আছেন আপন তালে—এণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে সংসারটা ছোটো নয়, বেচারার দিন চলে না। তা হরিপদ নিজের পান-বিড়ির খরচ বন্ধ করে এই ছেলেটার বই কিনে দেন, স্কুলের মাইনে মাফ করিয়ে দেন। আর সেই ছেলে একদিন হরিপদর গিন্নীর বাক্স ভেঙে গয়না চুরি করল। ধরাও পড়ল। তারপর থেকে রামবাবু রটিয়ে বেড়াচ্ছেন যে, হরিপদর মতো মিথ্যেবাদী লোক আর হয় না—আসলে হরিপদই অভাবে পড়ে তার গিন্নীর গয়নাগুলো রামের কাছে বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল, এখন টাকার তাগাদা করাতে এইভাবে এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দী এঁটেছে। স্কুলের মাথামাথা লোকের কাছে রামবাবু গিয়ে এই কথা বলে এসেছেন। হরিপদ ত আর আগে থেকে কাউকে আসল কথাটা বলেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, ছেলেমানুষ একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে, শুধরে দিলেই চলবে—আর সেটার ভারও নিজের হাতেই রেখেছিলেন। এখন রামের রটনার পর হরিপদর কথাগুলো অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। শেষে এই জন্যে স্কুলের চাকরিটাই হয়তো চলে যাবে। অবিশ্যি হরিপদ মাস্টারের মতো শিক্ষকের পক্ষে অন্য চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু বেচারার মন ভেঙে গেছে। দুঃখু করছিলেন—'বৌমা, কি দিনই পড়ল। যার জন্যে এত করি সেই কিনা আমাকে চোর, জোচ্চোর প্রতিপন্ন করল। এ পোড়া দেশের পরকালটা কি হবে !……'

উঃ, হঠাৎ কী সাংঘাতিক গরমটাই পড়ে গেল !

রান্নাঘরে আর বেলা নটার পর টিকতে পারি নে। অথচ উপায়ও নেই কিছু। বেলা যত বাড়ে কান-মাথা দিয়ে আগুন তত ছোটে।

এদিকে পরিত্রাহি গরম। তার ওপর কলের জলে আকাল লেগেছে। ফিতের মতো সরুধারা দেখলে কান্না পায়। চান করে যে একটু আরাম পাবো—তাও কপালে নেই।

নর্দমার ওপাশে যাদের ঘর, তাদের আবার জানলাটুকুও নেই—

এক এক ঘর এক এক দরজা। মাথার ওপর টিনের চালা। সূর্য প্রদক্ষিণের সঙ্গে হিসেব করে করে ওদের ঘরের ছেলেমেয়েরা কখনো তেঁতুলতলায়, কখনো বড় ফ্ল্যাটের লম্বা ছায়ায় পথের ওপর, কখনো বা পাশের গলিতে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। ঘরে আসে যখন খেতে পাবার আশা আছে। আর রাতেরবেলা পথের পাশে, ওধারের মাঠে চট, ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকে—তখন ছোটো-বড় কেউ ঘরে টিকতে পারে না ওরা। হাওয়া পায়—মশার কামড়ও সয়। আমাদের এপাড়ার মশারা দলে-বলে বাহিনী।

আজ রাতে আমরা ছাদে কাটালাম কিছুক্ষণ। বীটের পুলিস টহল দিতে বেরিয়েছে, সেই শব্দে নীচে নেমে এলাম। ঘরখানায় গুমোট জমে আছে। মশারি ছাড়া শোয়া মানে, মিনিট কয়েক পরে হাত-পা ছোঁড়া। ছেলে দুটো ঘেমে থস্‌থসে হয়েছে। ওরা কিন্তু দিব্যি ঘুমোচ্ছে। তবে নন্টুর দুষ্টুমি বেড়েছে দিনের বেলা। এখন ওর শান্ত, সুন্দর মুখখানা দেখে কি কেউ আন্দাজ করতে পারবে, কী আন্দাজ হামলা চালায় দিনের বেলা।

জানলার পাশে কে কাসছে! প্রথমে চম্‌কে উঠেছিলাম। পরে মনে পড়ল, বস্তীর কেউ শুয়েছে পথের কোলে, জানলার নীচে যে সামান্য ঘাসে-ছাওয়া জায়গা আছে সেখানে।

গত বছরে এইখানেই একটা বুড়ি শুয়ে থাকত। একদিন অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে পানের পিক ফেলেছিলাম বুড়ির গায়ে। তারপর লজ্জায় মরি আর কি। বুড়ি বেঁচে নেই। মরে যেন বেঁচে গেছে। ওকে কেউ দেখত না। দেখতে পারত না, কিন্তু খাটিয়ে নেবার লোকের অভাব ছিল না—ওর ছেলের বৌ, নাতি-নাত্‌নি সবাই হুকুম চালাত।

বেলার ছোট দেওর এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিচ্ছে। ওর ওপর টিফিন দেওয়ার ভার পড়েছে। বেলার সঙ্গে আমাকেও হাজরি দিতে হচ্ছে। প্রথম যেদিন যাই সেদিন মনে মনে ভয় ছিল –কি জানি, যদি

কিছু হাঙ্গামা বাধে ! আই. এ. তে এবার যে কাণ্ড হয়ে গেল ! পুলিসের খুব টহলদারী। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, কোনো গোলমাল নেই। দেখে ভালোই লাগল। অথচ এটাই ত স্বাভাবিক অবস্থা হওয়া উচিত— অবাক হলাম কেন !

বেলাকে কথাটা বলতে ও বলল—'আজকালকার ছেলেগুলো, যতো গোলমাল পাকায়, অথচ হ্যাখো, আই. এ. তে মেয়েদের কোনো সেণ্টারে কিছু হাঙ্গামা হয় নি। পারুক, না পারুক, মেয়েরা অন্যের পরীক্ষা ভণ্ডুল করতে যায় না। অবিশ্যি প্রশ্ন যে শক্ত হয়নি তা নয়। এই আমাদের আরতি যে কলেজে পড়ায় সেখানে হুদো-হুদো মেয়ে ফেল্ট হয়েছে। স্মেলিং সল্টই বিস্তর খরচা হয়েছে। তবুও মেয়েরা ছেলেদের মতো ইনকিলাব করে বাহাত্নরি ফলায়নি।

আমি বললাম—সব ব্যাপারেই মেয়েরা চাপা।

পরীক্ষার পর ছেলেগুলো যখন বেরিয়ে আসে তখন দেখে বড় মায়া হয়। আহা রে ! এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই এদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বেলার দেওর ফিসফিসিয়ে বলল—'জানো বৌদি, আজ তিনটেকে ঘাড়ে ধরে এক্কেবারে গাড্ডায় দিয়েছে।'

—কেন ?

—'টুকলিফাই --হাঁ বাবা। এত সোজা কোশ্চেন, এতেও টুকলি-ফাই।...'

উনি আজ খবরের কাগজ খুলে বললেন—হ্যাখো, হ্যাখো ! কোথাও তেমন কোনো গোলমাল হয়নি। বেশ শান্তিতে পরীক্ষা চলছে—এর মধ্যে বুঝি দু-এক জায়গায় একটু কি হয়েছে, অমনি খবরের কাগজে ইয়া বড় হরপে ফলাও করে সেটি ছাপা চাই। এরা এই করেই সব ব্যাপারে হট্টগোল বাধায়। এতটুকু যদি দায়িত্বের ওজন ঘটে থাকে !

দায়িত্বের কথা যদি উঠল তাহলে কালকের আর একটা মজার কথাও

বলতে হয়। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি—একখানা বাস আসছে। প্রথমে দেখলাম বোর্ডে লেখা আছে গড়িয়াহাট। হাত দেখিয়ে থামালাম। বাসখানা দাঁড়ালো যখন, তখন দেখি লেখা আছে শিয়ালদহ। জিজ্ঞেস করতে কণ্ডাকটর বলল, 'বোর্ডের লেখাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাল্টানো হচ্ছে'। সেটা বুঝি গাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে ছাড়ার আগে করা হয় না! তারপর, বেলগাছিয়া পুলের ওপর গাড়ি আটকে গেল—জাম! প্রথমে দেখে মনে হল আগেকার কোনো ট্রামে কিছু গোলমাল হয়েছে। একটু একটু করে সারি ধরে গাড়িগুলো এগোচ্ছিল বেশ। এমন সময় পিছু থেকে আর একখানা একতলা স্টেট বাস হনহনিয়ে এগিয়ে গেল, তারপর উল্টোদিকের ট্রামের মুখে গিয়ে আটক হল। ব্যস দু তরফের চলাচল অচল। এই যে এতগুলো গাড়ির এতগুলো মানুষের এতখানি সময় ঠেক খেয়ে অপচিত হতে লাগল—এর জন্যে দায়ী মাত্র একটি মানুষের অবিবেচনা। অথচ সেটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে গেলে সে চটে যাবে, খারাপ কথা বলবে।

বাসের একজন যাত্রী ক্ষেপে গিয়ে বললেন—'রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সিম্বল একেবারে কংগ্রেসী। বাবা, কলের ইঞ্জিনে নয় গাড়ি চলে, কিন্তু চালায় কে সেটাই ত আসল কথা। আরে বাবা গোটা দেশটা গৈবী চালে এতকাল চলে এসেছে—আজ হঠাৎ কি সবটা পাল্টানো যায়।...

আজ অশোক ষষ্ঠী। আবার ঝামেলা। উনি বলেন—'এসব ওল্ড রাইটস উঠিয়ে দাও।' কিন্তু মন মানে না। ছেলেমেয়ের কল্যাণের মুখ চেয়ে না করে ত থাকতে পারি না। এবেলা রুটি খেতে হবে। এই গরমে দুপুরে ময়দা খেয়ে কেবল পিপাসা পাবে—হাঁসফাঁস করে মরব। আর রাতে একটু ফল, মিষ্টি—তা ফলের বাজার আগুন। মর্তমান কলা পাঁচ আনা জোড়া চাইল। এরা পাঁজি দেখে দাম ফ্যালে। কলাওয়ালাকে বলি—'একটু কমাও।' তা সে ইদিকে সাহেবী 'ফিক্সড প্রাইশ' রেখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বোল্টু

বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে বলল--'এইত মা বিনিপয়সার কলা। খেলেই হয়।'

শেষে চার আনায় চারটে শসাই কিনি।

আমাকে বাঁধাকপি কিনতে দেখে ছেলেরা হৈহৈ করে উঠল—আবার ওই! কেন পটল কি দোষ করল!

এইজন্যে ওদের সঙ্গে নিয়ে বেরুতে চাইনা।

সুমিতার মা বলেছেন—হিং ফোড়ন, পেঁয়াজ দিয়ে বাঁধাকপি রাঁধলে দিব্যি খেতে হয়। আর এখনই আক্রার পটল খেতে শুরু করলে যখন পটল সস্তা হবে তখন আর রুচবে না যে!

চারদিক হিসেব করে ত সংসার চালাতে হবে।

১৩

যখন আর কিছু ভালো লাগে না তখন বই পড়ার কথা মনে পড়ে। অথচ আগে আমার এতো পড়ার নেশা ছিল, তার জন্যে কী বকুনিটাই খেয়েছি! আর এখন বই-এর মধ্যে মনই বসাতে পারি না, হাজার চেষ্টা করেও তেমনভাবে ডুবে যেতে পারি না। যদি দু-পাতা পড়ি ত পাঁচ মিনিট ভাবি। মনে হয়, এখন নন্টু কি করছে ইস্কুলে? বোল্টুর সর্দি লেগেছে, ভালোয় ভালোয় সর্দির ওপর দিয়ে ছেলেটা টাল সামলে উঠলে বাঁচি। আচ্ছা, বই-এর মধ্যে ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে, তার সবটুকুই কি সত্যি? নাকি, কিছুই এর সত্যি নয়, সবটাই বানানো! আজ চারদিন ধরে যে বইখানার চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়েছি, তাতে আছে আধুনিকা মেয়ে আর বেশ ভালো একটি ছেলে—যারা প্রেমের বনেদ বানিয়ে বিয়ে করেছে সুখী হবার আশায়, তারা দুজনে পরস্পরকে কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারে না! মেয়েটি কলেজের প্রফেসর আর ছেলেটি স্কুলের মাস্টার। রাজনীতির পাঠশালায় ছেলেটির কাছে মেয়েটি পাঠ নিয়েছে, শ্রদ্ধাও করে এসেছে রীতিমত। কিন্তু বিয়ের পরে কিছুদিন পর থেকেই মেয়েটির মনে হচ্ছে ছেলেটি অকারণে ওর ওপরে নিজের দখল-দাবির জাহির করতে চাচ্ছে। মেয়েটির যে নিজের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, স্বামীর পরিচয়ই ওর একমাত্র পরিচয় নয়—এই অভিমানটুকু মেয়েটি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। একজন প্রভুত্ব ফলাতে চেষ্টা করছে আর একজন সেটা বরদাস্ত করতে পারছে না। একজন বলছে, 'তুমি কলেজ থেকে

সরাসরি বাড়ি চলে আসবে।' আর একজন বলছে—'তা কি করে হয় আমাকে এখন বেশি করে পড়াশুনোয় মন দিতে হবে। চেষ্টা করতে হবে, যাতে একটা থিসিস রেডি করতে পারি। কাজেই হাঁড়ি-হেঁসেল সামলাবার জন্যে, আমার মাইনে থেকে যে রাঁধুনী রাখা হয়েছে সে-ই যথেষ্ট। বরং আমি বলি কি তুমি এম-এ.-টা দিয়ে ফ্যালো। অবিশ্যি তোমার যা পড়াশুনো তাতে, একটু ঝালিয়ে নিলেই নিদেন একটা হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে যাবে! তারপর—'

এতে স্বামীর স্বামীত্বে ঘা লাগে! তিনি মনে করেন, ইউনিভার্সিটির একটা ছাপ গায়ে বাড়তি থাকাতেই স্ত্রীর এই দম্ভ। তবে কি স্ত্রী তাঁকে মনে মনে খাটো ভাবে?'

এইসব চিন্তা। আর তার ফলে, স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনো লোককে হেসে কথা বলতে দেখলে স্বামীর অস্বস্তি হয়। আবার অন্যদিকেও তেমনি স্ত্রী যদি বাড়ি ফিরে ছ্যাখে স্বামী গরহাজির, তাহলে সেও সইতে পারে না। লোকটা আড্ডাবাজ, দিন দিন বয়ে যাচ্ছে।...আমরা বদলাচ্ছি! আমরা মানে মেয়েরা। অবিশ্যি ভালোর দিকে যাচ্ছি, না মন্দের দিকে যাচ্ছি সেটা বোঝবার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আমার নেই। তবে আমাদের সমাজের চেহারায় যে একটা পরিবর্তনের ছাপ পড়ছে, সেটুকু ধরতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

হয়তো ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পরিবর্তনটা উন্নতির দিক ঘেঁষে চলেছে। কেন? বলছি!

আই. এ. বা স্কুল ফাইন্যাল কোন পরীক্ষাতে মেয়েদের সেণ্টারে হৈ-চৈ হাঙ্গামা হয়নি। তা বলে কি মনে করতে হবে যে, মেয়েরা পড়াশুনো ভালো করে করেছে কিংবা মেয়েদের বুদ্ধি বেশি? অবিশ্যি মেয়েরা যা করে, তাতে মন লাগিয়েই করে। তাছাড়া ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সহ্য করতে পারে বেশি। প্রশ্নপত্র যাদের কাছে কঠিন মনে হয়েছে, সেইসব মেয়ে ছিঁচকাঁদুনে ছেলেদের মতো হাত-পা ছুঁড়ে দ্যায়লা-বায়না করেনি—চেষ্টা করেছে পরীক্ষা দেবার। নেহাৎ

যারা নার্ভাস হয়ে পড়েছে, তারা কেঁদেছে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। মেয়েদের পরীক্ষার হলে নাকি স্মেলিং সল্ট-এর শিশি হরদম হাজির রাখতে হয়েছে। অজ্ঞান হলেই, নাকের কাছে সল্ট-এর শিশি ধরে তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে গার্ডদের ছুটোছুটি করতে হয়েছে হামেশা। মেয়েদের কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে মনের আকুতি মরা-বাঁচার সামিল। অবিশ্যি ছেলেদের কাছে কি তা নয়? তারা কি চায় না পরীক্ষায় সফল হতে! চায় বই কি। তবে তারা শুধুই লেখাপড়া শেখার মধ্যে রস পায় না—তারা স্পোর্টসম্যান হতে চায়, তারা রেস্তোরাঁয় রকে আড্ডায় রাজা-উজির মেরে বাহাদুরি নিতে চায়। তারপর যদি সময় হাতে থাকে, তাহলে বাপ-মাকে দেখিয়ে পড়ার ভান করে ফাঁকি দিতে চায়। এরপর যখন পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে তখন—তখন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' হেঁকে প্রশ্নপত্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে চায়।

ছেলেদের দোষ দেবো কি! আসলে দোষ ত আমাদেরই। আমরা তাদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে নজর দিতে পারিনে তেমন করে। গোটা দেশের মানুষ এখন প্রাণে বাঁচার জন্যেই জীবনের সব ঘাম ঝরিয়ে ফেলছে। চাকরি ব্যবসায় চুরি, জুয়াচুরি, ফাঁকিবাজি—এই পথ ধরেই যদি বড়োরা, বুড়োরা চলে—তাহলে, তাহলে ছেলেরা কি ভগবানের বাচ্ছা হতে পারবে?

এই যে একদল লোক ধরা পড়েছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার পথ দিয়ে দু পয়সা রোজগারের ফিকিরের জন্যে—এদের দিকে তাকালে লজ্জায়, ঘেন্নায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। এরা প্রত্যেকেই ত মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়! এরা প্রত্যেকেই কারুর ভাই, দাদা, কাকা, মামা, বাবা! এরা সমাজের সামনে কি আদর্শের নজির খাড়া করবে!

মাঝখান থেকে যে সব ছেলেমেয়ে চোরাই প্রশ্নপত্রের সুযোগ পায়নি, তাদের পরীক্ষার সুফলকে কিছুটা ক্ষুন্ন করবে পয়সা দিয়ে কেনা প্রশ্নের সুযোগ যারা পেয়েছে সেই সব 'ক্যাণ্ডিডেট'রা।

ভাগ্যিস এই চোরাই কারবারের চক্রে কোনো মেয়ে নেই!

না, না, তুমি মনে কর না ভগবান যে—মেয়েরা এই সব কাজ করতে পারে! মেয়েরা কি পারে, আর কি পারে না, তার অনেকখানি হদিস আমি নিজে মেয়ে হয়ে বলতে পারি ত!

তাহলে শোনো, এই সব ছড়িয়েছিটকে পড়া স্বভাবের ছেলেদের অস্থিরতার জন্যে মেয়েরা কোন্ কোন্ কারণে দায়ী। মেয়েরা বলতে আমি সব আগে মায়েদের কথাই বলব।

সেদিন দুপুরে আমি যখন থার্মোমিটার কিনে ফিরছি, তখন দেখি অম্বিদের বাড়ির বৌরা আর ননদ সবাই মিলে কলবল করতে করতে চলেছে। আমায় দেখে ওরা থমকে দাঁড়াল। সবাই ওরা খুব সেজেছে ---সিল্ক আর সিফনে এক-একটি 'পরীর পিসতুতো বোন' যেন! অম্বির বৌ বললে—চলুন বাসিদি, টকি অফ টকিজ দেখে আসি।' আমি কি করে যাই! বড় মেয়েটার কদিনই জ্বর হচ্ছে। পাশের বাড়ি থেকে ধার করে থার্মোমিটার এনে এর আগে আগে কাজ চালিয়েছি। কিন্তু এবার ওদের বাড়িতেও বাচ্ছা মেয়েটার টাইফয়েড। ওঁকে বললে আনতে ভুলে যান—অথচ থার্মোমিটার না-হলে ডাক্তারের কাছে ঠিকমতো রিপোর্ট দিতে পারিনে। শেষে নিজেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

ওদের আর অতো কথা বললাম না। একটু আনন্দ করতে বেরিয়েছে ওরা, তার মধ্যে আমার কথাটা বেসুরো শোনাবে। হেসে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তা-ই করলাম। কিন্তু ফিরতি পথে ওদের কথাটা ভাবলাম। ওরা চারজনেই ছেলেমেয়েদের মা। এই দুপুরে চলল সিনেমা দেখতে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। এদিকে ওদের ছেলেমেয়ে যারা বাড়িতে রইল তারা ত চোখের ওপর দেখল আর যারা স্কুলে গিয়েছে তারা বাড়ি ফিরে মাকে দেখতে পাবে না। এতে করে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে?

আমিও সিনেমা দেখি, তবে সব দিক বাঁচিয়ে দেখি। জীবন থেকে সব আনন্দ মুছে দিতে কে-ই বা চায়! তা বলে, আমরা বড়োরাও যদি

নেশার ঝোঁকে দায়িত্ব এড়িয়ে চলি তাহলে তার ফল ত আমাদেরই ভোগ করতে হবে। আমার অবহেলার ফল আমার পাড়াপড়শীকেও ভোগ করতে হবে। সমাজে থাকার এও একটা দিক। আমি যে দুর্ভোগ ভুগি তার জন্যে আমার ত্রুটি নাও থাকতে পারে—অন্যের অন্যায়ের ফল আমাকে আক্রমণ করবে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে শুধু নিজের কাজে নিখুঁত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের অন্যায়ের, ত্রুটির, ভুলের দিকে নজর রেখে প্রতিবাদ করতে হবে, শুধরে দিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে তাকে সেদিক থেকে সরিয়ে আনবার।

আমি, শুধু আমি কেন আমার মতো অনেক মেয়েই যারা সংসারের সুন্দর ছন্দের মধ্যে সুখকে ফুটিয়ে আনন্দ পায় তারা বেশিরভাগই পরের অন্যায় দেখে-বুঝেও অপ্রিয় হবার আশঙ্কায়, অশান্তি এড়ানোর জন্যে প্রতিবাদ করে না। তারা অন্যায়কে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে—হ্যাঁ, তা বই কি।

খুব কম মানুষই আছে যারা ভেতরে বাইরে খাঁটি। তবে আছে বই কি তেমন মানুষ। এই যেমন আশা আর্যনায়কম্। মেয়ে হয়ে তিনি কালো মানুষদের ওপর শাদা মানুষদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে চলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! আশা দেবীও মেয়ে, আর আমি এই বাসবী—আমিও মেয়ে—অথচ তাঁতে আর আমাতে কতো তফাত!

আমি অবিশ্যি কোনোদিক দিয়েই আশা দেবীর সঙ্গে তুলনায় ধারে কাছে যেতে পারি না। যতটুকু পারি ততটুকুও যদি জীবনের প্রতি মুহূর্তে ফোটাতে চেষ্টা করতাম (আমার মতো আরো সব মেয়েই যদি নিজের নিজের গণ্ডীতে এই রকম চেষ্টা করত) তাহলে সমাজের চেহারা সত্যিই অন্য রকম হয়ে যেত।......

ও পাড়ায় বিশ্বাসদের বাড়ির অন্নপূর্ণা পুজোয় খুব ঘটা হয়। আর লোকও নেমন্তন্ন করে রাজ্যের। আমাদেরও নেমন্তন্ন হয়। তবে

উনি বলেন, 'ঠাকুর দেখতে যাওয়া ভালো। কিন্তু ওখানে নেমতন্ন খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।' ছেলেমেয়েরা ঠাকুর দেখে খুব খুশী, ভারি সুন্দর হয়েছে। নন্টুর ত যেটি ভালো লাগবে সেটি মাকে না দেখাতে পারলে তৃপ্তি নেই। ওর জন্যে যেতেই হল। পার্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাতাসে মুচুকুন্দ ফুলের মিষ্টি গন্ধ পেলাম। আহা, এ গন্ধের সঙ্গে ছেলেবেলার কতো কথাই জড়ানো আছে।

ঠাকুর দেখতে যাবো, অমনি সরলাদের বাড়িটাও একটু ঘুরে যাই না কেন। ছেলেমেয়েও খুব রাজী। ওবাড়ির ছেলেদের সঙ্গে এদের খুব ভাব।

সরলা বলল—উঃ কাল বিশ্বাসদের মেয়েটা খুব বাঁচা বেঁচেছে। এই আমাদের দরজার কোণে ওদের মোটরে এমন জোর এ্যাকসিডেণ্ট করল! ধাক্কার আওয়াজে বাড়িখানা কেঁপে উঠল। বুঝলে দিদি, আমি ত ভয়ে অস্থির, বোমা-টোমা ফাটল না কি! জানো ত, আমার আবার হার্টের ব্যামো আছে। ভাগ্যে উনি বাড়ি ছিলেন। তাড়াতাড়ি উনি দোর খুলে বেরুলেন। ব্যাস, তারপর হৈ-হৈ, চেঁচামেচি লোকজন জড়ো হয়ে গেল। আগুন, আগুন!

—কি ব্যাপার?

ব্যাপার আর কি! গাড়ি এসে দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। ব্যাটারিতে আগুন ধরে গিয়েছে। ওই মেয়ে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। কি করে কি হয়েছে কে জানে! কপাল ভালো তাই বেঁচে গিয়েছে। তা যাই বলো ভাই, এমন শান্ত প্রিতিমের মতো দেখতে যে আমার মনেই হয় না ও মেয়ে মোটর চালিয়াতি করে।

—তা এতে চালিয়াতির কি আছে ভাই। গাড়ি চালাতে শিখেছে তাই চালাচ্ছিল। আর এ্যাকসিডেণ্টের কথা কেউ কি আগে থেকে বলতে পারে! পুরুষ ড্রাইভারের হাতেও ত কতো এ্যাকসিডেণ্ট হয়।

—না, না, তা ত হয়ই। কিন্তু হাজার হোক মেয়েছেলে ত! আমি ভাবছি যে যদি ভালোমন্দ কিছু একটা হত। জানো ভাই, কালকের

ছবিটা আমার চোখের সামনে থেকে থেকে ভেসে উঠছে। কাচ-ভাঙা, ধোঁয়াতে রবার পোড়ার গন্ধ, গাড়িখানার সামনের দিকটা থেঁৎলানো —মেয়েটা ছুটে আসছে জল নিতে, ছাই নিতে। আলো চাই—উঃ সে এক মহিমারণ পর্ব! বুকখানা ধড়ফড় করছে।

ঠাকুর দেখা কপালে নেই আমার। এখন ভেতরে যাওয়া বন্ধ। নিমন্ত্রিতরা খেতে বসেছে। বাইরের লোককে এখন ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। কড়া পাহারা।

ফিরে এসে ওঁর কাছে একটু বকুনি খেলাম।

মনটা খারাপই হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নণ্টুবাবুর একটি কথায় আমার মনের সব মেঘ কেটে গেল। ওকে জিজ্ঞেস করলাম—আজ এঁচোড়ের কোপ্তা রেঁধেছি। তোমরা মনে করো না কেন এই বেশ নেমন্তন্ন!

গম্ভীরভাবে নণ্টু বলল—'হুঁ, খেতে খেতে মনে হচ্ছে, মা, তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে রান্না করেছ।'

১৪

জানো ভগবান, এবার তোমাকে আর কলকাতায় বসে চিঠি লিখছি না—অবিশ্যি এও তোমারই ইচ্ছেতে। আমার ইচ্ছেতে ত আমি চলা-ফেরা, ওঠা-বসা করতে পারি নে। সেখানে অনেকগুলো বিবেচনা-বিচারের হিসেব দাঁড়িপাল্লায় চড়ে বসে আছে। প্রথম হিসেব ধরো—ওঁর অফিসের ছুটি পাওয়া না-পাওয়া, তারপরই ছেলেমেয়েদের স্কুলের পড়াশুনোর ক্ষতি হওয়া না-হওয়ার হিসেব, আর সব শেষের হলেও সব চেয়ে বড়ো হিসেব টাকাকড়ির। এই হল সাধারণ চিরাচরিত নিয়ম—আর এই নিয়মের চাকায় 'পাক খেতে-খেতে এতদিন চলে এসেছি, কাজেই কোথাও নড়াচড়া করা হয় নি।

কিন্তু বেড়ালের কপালে শিকে ছেঁড়ার মতো আমাদের কপালেও হঠাৎ বাইরে বেরুনো ভাগ্যে জুটল। ওঁর এক ভাই চাকরি করেন দহননগরে—তিনি এলেনও যেমন হঠাৎ তেমনি আচমকা আমাদের সব্বাইকে হ্যাঁচকা টানে টেনে নিয়ে এসেছেন। আমার স্বামীকে দুই দাবড়ানি দিলেন, ব্যস অমনি অফিসে ছুটির দরখাস্ত করলেন উনি। ছেলেমেয়েদের স্কুল কামাইয়ের ভাবনা নেই, কদিন ছুটি।

আমরা চলে এলাম দহননগরে।

জায়গাটার নামের সঙ্গে এখানকার আকাশ-বাতাসের খুব মিল আছে। বেলা যতো বাড়ে হাওয়ায় আগুনের জ্বালাও ততোই বেড়ে চলে, আর দুপুরবেলায় যে লু ওঠে তার রেশ মরতে মরতে দুপুর রাত হয়ে যায়। উঃ কি তেজ।

বাইরে এসেছে বলে বোল্টু আর নন্টুর আনন্দের সীমা নেই—ওদের এই প্রচণ্ড রোদেও ঘরে আটকে রাখা যাচ্ছে না। ঠাকুরপোর ছুটি ছেলের সঙ্গে হরদম টো-টো ঘুরছে—বারণ করলে কাঁদো কাঁদো হয়ে মাথা নামাচ্ছে। ওঁর ভাইপোরা আমাকে গ্রাহ্য করে না। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমার দাপুটে দেওরটিও। তিনি হাত নেড়ে সব কথাতেই বলেন—'তোমাদের ওই কলকাত্তাই পুতু-পুতু চাল ছাড়ো দেখি। রোদে-জলে পোড় খেয়ে যারা মানুষ হয় তারাই ত মানুষ। বুঝলে বৌদি, যে যুগ আসছে এর পর—সে যুগে আর চেয়ারে পিঠ ঢেলে কলমের খস-খসানি দিয়ে পেট চালানো যাবে না। বুঝলে! ইন্‌ডাস্‌ট্রি—স্রেফ শিল্প। রিয়্যাল শিল্প যাকে বলে, তা-ই মানুষের বাঁচার স্কেল্‌-কম্পাস হবে।'

আমি বলি—হ্যাঁ, শিল্পই ত চিরকাল মানুষের সভ্যতার মাপকাঠি। কিন্তু তার সঙ্গে টো-টো করে রোদে ঘুরে সর্দিগর্মি করার কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমার জানা নেই ঠাকুরপো। অসুখ করলে পরে—

ঠাকুরপো তুচ্ছ করবেনই আমাকে। সব ব্যাপারেই তাঁর এই রকম ভাব ঃ তুমি মেয়েছেলে এসবের কি বোঝো।…তাই বা বলি কি করে। আমার স্বামী ত বয়সে, বিদ্যায় দেওরের চেয়ে বড় ঃ তা ওঁকেও তিনি গ্রাহ্য করেন না। যেন দুনিয়ার সব কিছু ওই একটি মানুষেরই বোঝার এক্তিয়ারভুক্ত। ছেলেরা অনিয়ম আলবৎ করবে, অসুখ যদি করে ত তার জন্যে ডাক্তার আছে রোগ সারাবে। ঠাকুরপোর কাছে আর্ট বলে দুনিয়াতে কিছু থাকা অবান্তর। তিনি শিল্প বলতে ইন্‌ডাস্‌ট্রিকেই বোঝেন। আমার মাঝে মাঝে এতো রাগ ধরে এই লোকটার হামবড়া ভাব দেখে, কিন্তু আমার স্বামী মৃদু হেসে, চোখের কোণে মিনতির ইশারায় আমাকে শান্ত রাখেন।

দেওর-পোদের সঙ্গে মিশে মিশে এই কদিনে ছেলে দুটো শেষে না বিগড়ে যায়—এই আমার ভয়। কথাটা আমার স্বামীকে বলি এমন

সাহস নেই। উনি যদি মনে করেন যে, কেবলমাত্র আমার ছেলেমেয়ের ভালোটুকুই আমি দেখি, আমি স্বার্থপর!

এই একটু দুর্ভাবনা ছাড়া আর সব দিক দিয়ে আমার এই দহন-নগরের নতুন নতুন হাওয়ায় সব কিছুই ভালো লাগছে। সারি সারি একই ধরনের সব বাড়ি। পথগুলো উঁচু-নীচু, তবে তার পিচঢালা ঢালাও ভঙ্গীতে টালুটোক্করের হোঁচট নেই। আমাদের কলকাতার মতো পদে পদে খানা-খোঁদলের অব্যবস্থা অনুপস্থিত। এরই মধ্যে এল নীলের উপোস। আমার পূজো-অর্চনার ব্যবস্থা নিয়ে ঠাকুরপো মহাব্যস্ত। নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কাছাকাছি গাঁয়ের মন্দিরে, মেয়েরাও এল। চমৎকার শান্ত, মধুর পরিবেশ। এখানে অনেক মেয়ে এসেছে পূজো দিতে। গরীব আছে, বড়লোকও আছে—তবে গরীবের ঘরের বৌ-ঝিই বেশী। একজনকে দেখিয়ে ঠাকুরপো বললেন—'ইনি রে-সাহেবের মেম্! ঠাকুরের সোনার মূর্তি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। ওঁর ছেলেটি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল তখন পূজো মানত করেছিলেন কিনা!'

—মেম মানে?

'স্ত্রী। দিশীই—। আগে যে সব পোস্টে খাশ বিলিতী সাহেব চাকরি করত, এখন সেখানে হুঁদে দিশী অফিসার এসে বসেছে। এরা গদীর গরমে সাহেব হতে চেষ্টা করে, কিন্তু দেশী নীচতাও আছে সেই সঙ্গে। সব সময় ওপরওয়ালা মালিকের দিকে এদের নজর, বুঝলে বৌদি। এদের কাছে কাজের কদর নেই, তোষামোদীরই যা দাম। ফলে এদের মোসাহেবদের দেখ্ ভাল নিয়েই এরা মশ্‌গুল। তাই কাজ যারা করতে পারে তারা কাজ না করে সাহেবের তোষামোদী করে, আর যারা তোষামোদ করতে পারে না তারা ভুগে মরে। সেই তোষামুদে দলের দৌলতে রায়গিন্নী আজও রে সাহেবের মেম!'

তা হোক, রে সাহেবের মেম মানুষটি খাশা। আমার সঙ্গে আলাপ হল। উনি নেমন্তন্ন করলেন ওঁর কোয়ার্টারে যাবার জন্যে। আমিও ঠাকুরপোর কোয়ার্টারের নম্বর দিয়ে ওঁকে আসবার জন্যে বললাম।

মন্দির থেকে ফেরবার সময় ঠাকুরপো সব শুনে বললেন—'সর্বনাশ করেছো! যদি লাইনের লোকে রে সাহেবের মেমের গাড়ি ছাখে আমার কোয়ার্টারের সামনে তাহলেই হয়েছে!'

—কি হয়েছে, ঠাকুরপো?

'আমার জান্ কয়লা হবে! এক দল বলবে, দালাল। আর অন্যেরা এসে ধরবে মেমসাহেবের থ্রুতে উন্নতির উমেদারীর জন্যে। তুমি ত এখানকার হালচাল জানো না বৌদি! এখানে ছুটো জাত আছে—ঠিক ইংরেজ আর ভারতীয় আগে যেমন ছিল তেমনি। উঁচুর সঙ্গে নীচুর মেলামেশা কোন পক্ষই বরদাস্ত করতে পারে না! ওরা তোমাদের মতো সাদা চোখে সব ব্যাপার দেখতে অভ্যস্ত নয়। এখানে সবই ছুটো ছুটো—ক্লাব পর্যন্ত ছুটো। কেবল হাসপাতাল আর কারখানা ছুটো নয়—একটা।'

ঠাকুরপোর এসব কথা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার নেই, নইলে বলব কেন—হ্যাঁ, তোমাদের ইউনিয়নও ত ছুটো!

প্রতিবাদ করলেন তিনি—'না ইউনিয়ন একটাই, তবে তার বিরুদ্ধে, তাকে ভাঙবার জন্যে আর একটা ইউনিয়ন খাড়া করেছে। সেটা কারখানার কর্তাদের কারসাজি।'

—তোমরা যদি একতার সংকল্প করো তাহলে তাঁরা কেমন করে তোমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করবেন? এ আমি বুঝতে পারি না।

'ও তুমি চট্ করে বুঝতে পারবে না। ওসব হল পাকা মাথার পাকা চাল। মোটকথা এইটুকু জেনে রাখো যে, গরীব যারা, যাদের সংসার চলা দায় তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে, অর্থের লোভ দেখিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে নেওয়া যায়। অভাব এমনই জিনিস যা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথকে কাঁটায়-কাঁটায় ছেয়ে রাখছে সব সময়।'

ঠাকুরপোর কথাগুলো কেমন পুরনো পুরনো মনে হয়। আমার স্বামীর মতের সঙ্গে মোটেই মেলে না। আমি নিজেও ত অভাবের খবর কিছু কম রাখি নে। সত্যি কথা বলতে কি যাদের অভাব নেই,

তেমন মানুষও অনেক দেখেছি, তারাই কি মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে গরীবদের চেয়ে সরেস? আসলে গলদটা রয়ে গেছে শিক্ষায়। শিক্ষার অভাবটা আর্থিক অভাবের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে মানুষের। কথাটা মনে মনে বুঝলেও ঠাকুরপোর সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে সাহস হয় না। কেননা, আমার স্বামীর মতো মানুষ ইনি নন—ইনি চান যে মেয়েরা সবটুকু না বুঝুক, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বোধে-বুদ্ধিতে খাটো হয়ে, আশ্রিতের মতো পুরুষের মুখ চেয়ে থাকুক। তাই এখানকার নতুন নতুন অফিসে-দপ্তরে যেসব মেয়ে চাকরিতে ঢুকছে সেইসব মেয়ের নামে নানা কুৎসা কাহিনী আমার স্বামীকে শোনান। আমার সঙ্গে এসব আলাপ অবান্তর, কেননা আমি স্ত্রীলোক। আমার প্রশংসা করতে বসে শুধু বলেছিলেন—'এই যে তুমি, বৌদি, লেখাপড়া শিখেছ, তবু কেমন গুছিয়ে ঘর-সংসার করছ। আমার এইরকম মেয়েই পছন্দ। আর, আজকালকার সব মেয়েদের দেখ—চেহারায় শাঁকচুন্নী, পোশাকে উর্বশীর মাসতুতো বোন, দেড়, পাতা বিদ্যে শিক্ষে করে গ্যাট গ্যাট করে চলে আসছে চাকরি করতে! আরে বাপু, তোদের কে ডেকেছে? যা-না হাঁড়ি-বেড়ি ঠেলগে গিয়ে। এদিকে ছেলেগুলো বেকার হয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে মরছে। আই. এ. পাস ছেলে যে চাকরিতে বহাল হয় না, মেয়েদের কপালে আই. এ. না দিয়েও সেই চাকরি জোটে। কেনরে বাপু! তাছাড়া, শুধু চাকরিই যদি করত তাহলেও কথা ছিল না—কাঁচাখেকো দেবী এক-একটি! ঝটপট চারটে ছটা ছেলে এক একটা মেয়ের ইয়েতে ঘায়েল হচ্ছে। সব অনাচ্ছিষ্টি—বাপ-মায়ের সম্বন্ধ করা মেয়েকে বিয়ে করতে ইয়ংম্যানদের আপত্তি। জানো বৌদি, এ যা যুগ আসছে!'

আমার সবটুকু প্রতিবাদ একটি কথার মধ্যে ঢেলে দিয়ে বলি—দোষটা একা কি মেয়েদেরই, না ছেলেদের বেশি?...

নববর্ষের দিনটা এবার সকাল থেকেই নতুন মনে হচ্ছে। মনটাই

অন্যরকম। এখানকার বড় সড়কে এতো লোক চলাচল করছে যেন মনে হচ্ছে এরা সবাই মিছিল করে চলেছে। প্রখর কিরণের সঙ্গে আগুন হাওয়া চোখমুখ ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে—তবু আমাদের সবাইকে নিয়ে চলেছেন ঠাকুরপো তাঁর বন্ধুর নতুন দোকানে, আজ তাঁদের উদ্বোধন ; পূজোর জোগাড়ে আমি তদারক করি এ-ই ওঁদের ইচ্ছে। লাউড স্পীকারে যতো সব হিন্দী গজল আর বাংলা ঝুমুর গান দিয়ে আকাশখানাকে যেন তচ্‌নচ্‌ করছে। এখানে, ওখানে মাইকে মাইকে ঝগড়া। ঝগড়াটা যে শুধু মাইকেই সীমাবদ্ধ তা নয়, মানুষের লড়াই ওই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছে। দুনিয়ার লোকে জানছে রাহাদের সঙ্গে দত্তদের পাল্লা চলেছে। পাশাপাশি দুই দোকানে রেষারেষি। আসল গণেশপূজো হল যেন চুপিচুপি। ঘটার ছটা ক্যালেণ্ডার বিলিতে, মিষ্টির বাক্সে, মিষ্টান্নের ওজনে, পান শরবতের ঢালাও ছড়াছড়িতে। দত্তদের কারবারই ছিল এতকাল একচেটে, পুরনো কাল থেকে তারা এই দহননগরের একমাত্র কাপড়ের কারবারী ছিল। হঠাৎ এল রাহা কোম্পানি—তারা দত্তদের গায়ের ওপর দোকান বসালো। এত বড় শহরে দু-চারখানা দোকান অনায়াসেই চলতে পারে—চল্‌বেও। তবু পাশাপাশির রেষারেষিটা কেন যেন এসেই যায়। মুখে মুখে পাঁচজনে তাই নিয়ে বলাবলি করে আনন্দ পায়। আর খরচের অঙ্ক বাড়ে দুই পাল্লাদার কারবারীর। এতে কি লাভ হয় কে জানে! অবিশ্যি খদ্দেরদের খাতির বাড়ে—এটা সত্যি কথা।

আমার সামনেই এলেন দত্তদের বড়জন, নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। রাহার সাজসজ্জার প্রশংসা করে, হালখাতায় দশ টাকা জমা দিয়ে গেলেন। রাহার তখন খেয়াল হল তারও যাওয়া উচিত ওদের দোকানে। অবিশ্যি সে নিজে গেল না, ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দিল। দত্তবাবু আমাদের সবাইকে অনুরোধ করে গেলেন পায়ের ধুলো দেবার জন্যে। ঠাকুরপো দত্তের দোকানে পুরনো খদ্দের ছিলেন, বন্ধুর খাতিরে

ও দোকানে যাওয়া ছেড়েছেন। তাই বলে কি নববর্ষের দিনে না গিয়ে পারেন? গেলেন।...

সন্ধ্যেবেলা এখানকার ভারতীয় ক্লাবে সভা আছে। কলকাতা থেকে নামকরা সাহিত্যিকরা আসছেন।

ঠাকুরপো বললেন—'আমি কিন্তু কুস্তীর লড়াই দেখতে যাবো। জীবনে কিং-কংকে দেখার সুযোগ আর মিলবে না। আবার দারা সিং লড়বে কিং-কং-এর সঙ্গে।'

আমার স্বামীকেও তিনি কুস্তীর আখড়াতে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করলেন। ছেলেমেয়েরা সবাই গেল কুস্তী দেখতে। গেল না রমা, ঠাকুরপোর মেয়ে। ও যায় কি করে, ওর যে আবৃত্তি আছে সাহিত্য-সভাতে। আমরা দুই জা, আমার স্বামী আর রমা সভায় গিয়ে দেখি বিরাট হলঘরখানা খাঁ খাঁ করছে। সব মিলিয়ে শ'খানেকের অর্ধেক লোকও জুটেছে কিনা সন্দেহ। ওদিকে স্টেজে সাহিত্যিকরা বসেছেন। ওঁদের চোখে একটা নৈরাশ্য প্রকট। কিং-কং আর দারা সিং-এর কাছে বাংলা-সাহিত্য পরাভূত।

তবু রক্ষে যে আজ কেবল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মূল সাহিত্যের অধিবেশন আগামীকাল। প্রতিযোগিতায় যারা নাম দিয়েছে তারা কেউ গরহাজির নয়, এইটুকু বাঁচোয়া। তবু আমার লজ্জা করছে সাহিত্যিকরূপে আজ এখানে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাঁরা ত এখানকার লোকদের মনোভাব টের পেয়ে গেলেন।

প্রথমে লজ্জা হলেও পরে মনে হল, এ বেশ হয়েছে। এই অবস্থার জন্য সাহিত্যিকরাও ত কম দায়ী নন। আজ তাঁদের চেয়ে কুস্তীর ওপর লোকদের যে টান বেশি এর জন্য সাহিত্যের জনপ্রিয়তার অভাবও কার্যকরী বটে।

তবু আমাদের সমাজের এই স্থূলতার দিকে ঝোঁকটা এত স্পষ্ট

দেখে মনে মনে খুব ভয় হচ্ছে—আগামী যুগে কি একদিকে **কুস্তী** আর একদিকে ইনডাস্ ট্রিই সমাজের মানুষকে গ্রাস করবে ?

দ্বিতীয় দিনের সাহিত্য-সভায় বেশ ভিড় হল। অনেক দামী দামী কথা শোনা গেল। এই দিনটাই যেন আমার কাছে প্রকৃতপক্ষে নব-বর্ষের দিন মনে হচ্ছে। কলকাতার মতো এখানকার শ্রোতারা সভার অধিবেশনকালে আসাযাওয়া করে না, সবাই মন দিয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শোনে। সবারই চোখে-মুখে শ্রদ্ধার চিহ্ন।

তাহলে এদের মনে সাহিত্য-প্রীতি এখনও আছে। তবে দারা সিং, কিং-কং-এর চেয়ে সে প্রীতি বহরে খাটো এই যা। প্রীতি বা শ্রদ্ধার এরকম অনুপাত পক্ষপাতিত্ব যে থাকা সম্ভব--তা এই প্রথম টের পেলাম।

এই কদিনে এখানকার সঙ্গে আমার যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। কিন্তু নিয়মের চাকায় বাঁধা জীবন তার ঘানিতে টেনে নিয়ে যাবে—আবার সেই কলকাতায়। আবার শুরু হবে দিনরাতের পুরনো ছকে চলা। নববর্ষের এই কটি খাপছাড়া আনন্দ-দিনের স্মৃতি সম্বল করে আবার কতকাল কলকাতায় কাটাতে হবে, কে জানে !

১৫

ঝগড়া আর দলাদলি। নন্টু-বোণ্টু এরই মধ্যে দল পাকিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটিতে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। শ্যামলদের বাড়ি কিছুদিন ধরে বিকেলবেলা খেলতে যাচ্ছিল—মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলাম। ওদের আর এই গরমে সঙ্গে নিয়ে বাজার-হাটে বেরুতে হয় না।

কিন্তু গরীব মানুষের কপালে সুখ-শান্তি সয় না। নইলে খামোখা দুই মূর্তিমান টরে-টং হয়ে ঘরে ফিরবে কেন! সেদিন ততোটা বুঝতে পারি নি। সকাল-সকাল বাড়ি এল, মনে করলাম হয়তো নতুন-নতুন বই এসেছে তা-ই পড়াশুনোর চাড়ে ছেলেরা আমার ঘরমুখো হয়েছে। পরদিনও বিকেলে যখন খেলায় অরুচি দেখলাম, বার বার বলেও শ্যামলদের বাড়ি পাঠাতে পারলাম না, তখনই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর চন্দনকে উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে এবাড়িতে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করি—কিরে বড় রাস্তার দিকে গিয়েছিলি কেন?

গম্ভীরভাবে সে জবাব দিল—'বড় রাস্তায় যাই নি, পেছনের গলি দিয়ে ঘুরে এসেছি।'

—কেন?

'শ্যামলের দল বলেছে যে ওদের রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আচ্ছা-সে প্যাঁদাবে। তাই—আমি একা-একা এলাম যে—ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে না এসে!'

নন্টু চন্দনের গলা পেয়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধুকে মহাসমাদরে ডাকল—'আয় ভাই আমরা ছাদে যাই, তুই, দা-ভাই আর বাবলু আজ ডাং-গুলীর রীলে খেলব!'

ওরা ছাদে গেল। মনের মধ্যে খচ্-খচ করছিল, এইটুকু একরত্তি সব ছেলে, এরাও—! ছাদের ওপর খেলাটা আমি পছন্দ করি না—কী-ই বা খেলা হবে! শ্যামলদের বাড়ির পিছনে বাগান আছে, ছোট্ট মাঠ আছে, চমৎকার খেলার জায়গা।

ঘর গোছাবার সময় চৌকির নীচে দেখি ওঁর প্যাডের একখানা কাগজ ছেঁড়া পড়ে রয়েছে। কাগজখানা দরকারী মনে করে কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুলোতে গিয়ে অবাক হলাম। শ্রীমান নণ্টুর হাতের লেখা, বড় বড় হরপে—শ্যামল, তুমি সাবধান! তোমার খারাপ কাজের জন্য শাস্তি হবে। ভালো চাও ত দাদাভাই-এর কাছে ক্ষমা চাও। নইলে সাবধান। ইতি নণ্টু, বাবলু, চন্দন।···

রাত্রে উনি যখন একটু স্থির হয়ে বসেছেন তখন নণ্টুর 'সাবধান-পত্র'খানা হাতে দিয়ে বললাম—এইসব বিঘ্নে হচ্ছে। দ্যাখো, চিঠি। এরপর, আজ বিকেলে দু-দলে ঢিল ছোঁড়া-ছুঁড়ি হয়েছে। তুমি একটু শাসন না করলে ত চলে না।

উনি হাসলেন, বললেন—'ছোট ছেলেদের ওরকম হয়।'

তারপর অবশ্য দুই শ্রীমানকে ডেকে বকলেন, বললেন—'আবার যদি শুনি যে তোমরা এরকম বেয়াদবি করেছ তাহলে তোমাদের এ-ঘরে ঢোকা বন্ধ করে দেব।'

বোণ্টু ঢোক গিলে বলল—'শ্যামলই ত ঝগড়া বাধায়। ও চোর হলে চোর দেয় না। হেরে গেলে বল্ দিয়ে মারে। বড্ড জোচ্চুরি করে যে বাবুজী!'

চিঠিখানা নণ্টুর হাতে দিতেই বেচারী জিভ্ কেটে ছুটে পালাচ্ছিল। উনি চট্ করে ওর হাত চেপে ধরলেন, বললেন—'শ্যামলকে তুমি আর একখানা চিঠি লিখবে, তাতে এই কথা লিখবে যে, যদি ঝগড়া মিটমাট করা হয় তাহলে সামনের রবিবার বিকেলে তোমাদের সব্বাইকে রসগোল্লা খাওয়ানো হবে।'

ওরা ঘর থেকে চলে গেলে পর উনি আমাকে সামনে বসিয়ে

বললেন—'ছ্যাখো, এসব ব্যাপারে আমার হাতে বিচারের ভার দিয়ো না। তুমি নিজের হাতে রেখো।'

সত্যি কথা স্বীকার করি, এরকম বিচিত্র বিচার আমাকে দিয়ে হত না। আমি খুব রেগে গেলে বকাবকি করি, দু-একটা চড়-চাপড়ও যে না-দিই তা নয়। আজ নন্টুর চিঠি দেখে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। কি-করি, উপায় না পেয়ে, এতক্ষণ চুপচাপ ছিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখে উনি বললেন—'ছোটদের সঙ্গে সবসময় বড়মানুষী ব্যবহারের ফল ভালো হয় না। বিশেষ করে এখন যা গরম পড়েছে তাতে কারুরই মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। ওরা ত ছেলেমানুষ। বুড়ো বুড়ো লোকগুলোই কি কাণ্ড করছে ছ্যাখো না!'

—কে আবার কি করল, হ্যাঁ গো?

'কেন, আমাদের কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের কাণ্ডকারখানা ত কাগজে পড়ছ! মেয়রের গদী নিয়ে এমন ছেলেমানুষী এরা করছে! আরে বাপু, রাজনীতি করতে হয় করো—তা বলে তোমাদের চ্যাংড়ামি করবার জন্যে ত ভোট দিয়ে পাঠানো হয় নি। কর্পোরেশনের অফিসে আজ আমার এক বন্ধু গিয়ে বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন—কোনো কাজ হয় নি। কথা বললে কেউ আমলই দেয় না। চাকরি করবে কিন্তু কাজ করবে না কেউ—। দিন দিন যা আবহাওয়া দাঁড়াচ্ছে, তাতে বড়োদের কাছ থেকে ভালো কিছু শেখার সুযোগ বড় বেশি থাকছে না। কি যে হবে দেশের ভবিষ্যৎ, ভাবতে সাহস হয় না।'

—আমার ত মনে হয় বিজয়বাবু মানুষটা ভালোই ছিলেন, ওঁকে মেয়র রাখলেই হ্যাঁপা মিটে যেত।

উনি হাত নেড়ে রায় দিলেন—'ভালো-মন্দ বলে এরা কিছু মানে না, যারা রাজনীতি করে তাদের কাছে দলপতির হুকুমটাই আইন। তুমি যদি সেই দলপতির ফতোয়া গ্রাহ্য না করো তাহলেই তুমি যতো ভালোই হও না-কেন তোমাকে যেন-তেন প্রকারেন হটিয়ে দেওয়া হবে। রাজনীতির চেহারা দিন দিন ঘোরালো হয়ে উঠছে। আগে

ছিল মানুষের জন্যে রাজনীতি, কিন্তু দিনে দিনে দাঁড়াচ্ছে, রাজনীতির জন্যে মানুষ। দলকে ক্ষমতার গদীতে রাখার জন্যে মানুষ কী না করছে !

উনি একগ্লাস জল চাইলেন ! ওঁর চোখমুখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন। সারাদিনের খাটুনির পর ওঁকে এইভাবে উত্তেজিত হতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল, বললাম —আজ সকাল সকাল খেয়েদেয়ে চলো একটু পার্কে ঘুরে আসি।...

সকাল বেলাতেই মনটা খারাপ করে দিল জগনের মা। এসে বলল —'মতি বুড়ো মারা গেছে।' এ পাড়ায় এসে অবধি মতিকে একভাবে দেখে আসছি। বয়েস অবিশ্যি হয়েছিল অনেক। লোকটা সে আমলের মানুষ। খুব গল্প করতে পারত। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করত। হাতের কাজ অবিশ্যি তেমন উঁচু দরের ছিল না। তবে এ-পাড়ায় চেয়ার-টেবিল মেরামত করতে হলে, কিংবা ছোটখাটো মিটসেফ কিংবা আলনা তৈরি করতে হলে—সবাই ডাকত মতিকে। কাজে যেটুকু খুঁত থাকতো সেটুকু গল্প করে পুষিয়ে দিত মতি। সে আমলে ভেটেরিনারি হাসপাতালে সাহেবের কাছে চাকরি করেছে—এটা বারবার বলত। তার কথা হল, কাজ করতে হলে ভালো কাঠ চাই, পালিশের মশলা চাই দামী—এসব ছুটোছাটা কাজ তার মতো কারিগরের মনঃপুত নয়। সাহেবী আমলে নাকি ভেটেরিনারি কলেজের বাগান ছিল ছবির মতো, মাঠের দিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যেত। মতির মতে তার সাহেবের মতো মনিব আর হয় না।...একটা বুড়ো লোক চলে গেল, সঙ্গে করে নিয়ে গেল কতো কথা, কত্তো ছোট-খাটো ছবির পসরা...মনটা ভারি হয়ে উঠল।

তার চেয়েও মন ভারি হল হরিপদকে তার বাড়িওয়ালা ধরে মেরেছে শুনে। হরিপদ মানুষটা বেজায় কুঁড়ে। ঘরামীর কাজ ভালোই জানে। কিন্তু বসে বসে বিড়ি আর গাঁজা টানবে, লম্বা-চওড়া বুলি ঝাড়বে।

আর তার বৌটা চার-পাঁচ বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে ভূতের মতো খেটে মরছে। বৌটা বড্ড ভালোমানুষ। আমার কাছে মাঝে মাঝে দু-এক টাকা ধার নেয় আবার না-চাইতেই শোধও দিয়ে যায়। ও নিজের মুখেই হিসেব দেয়—চাটুয্যে বাড়ির সব কাজ করে দিয়ে কুড়ি টাকা মাইনে পায়, সাত নম্বরে শুধু বাসন মাজা তারা দেয় আট টাকা, এমনি করে সব জুড়ে—গিয়ে দাঁড়ায় উনপঞ্চাশ টাকা। তাতে ঘরের ভাড়া দিতে গেলে আর পেটে কিছু পড়ে না। অবিশ্যি উনপঞ্চাশ টাকায় দুজন বড় মানুষ আর দুটি বাচ্চারও আধপেটা হয় কিনা বলা শক্ত। যাই হোক টিনের ঘরের ভাড়া মাসিক দশ টাকা হিসেবে পাঁচ মাসের পঞ্চাশ টাকা বাকী পড়েছিল। বাড়িওয়ালা হরিপদকে ঠেস দিয়ে বলেছিল, 'জোয়ান মোদ্দ বৌয়ের রোজগারে বসে খেতে লজ্জা হয় না। পরের দেনা ও মেয়েমানুষ হয়ে কতো আর শুধবে!'

কথা কাটাকাটি থেকে গড়ালো গালিগালাজ, তারপর বাড়িওয়ালা হরিপদকে মারল, ওদের জিনিসপত্র ঘর থেকে টেনে বাইরে ফেলে দিল। হরিপদ সোজা থানায় গিয়েছে। ওর বৌটা এখন কাঁদছে।

বেচারী বৌটা, ওর ছেলেমেয়েগুলো সবাই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। হরিপদকেও বলিহারি। পুলিস ডাকতে থানায় দৌড়বার বেলায় হতভাগার কষ্ট হয় না, রোদ লাগে না, মাথার ঘুরুনি থাকে না—আর কাজ করতে হলেই ওর যতো রোগ। শীতকালে বলে, 'বুকে হাঁপ ধরছে' গরমকালে বলে 'মাথা ঘুরছে'! এমন গতর-কুঁড়ে মানুষও হয়। যদি কখনো কেউ হরিপদকে দিয়ে কাজ করাবার জন্যে খুঁজতে আসে ত, ঘরে বসে থেকে ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দেবে, 'বল, বাবা অন্য জায়গায় কাজে বেরিয়ে গিয়েছে!' বৌটাই বা সহ্য করে কি জন্যে! ওদের বস্তীর সব লোক হরিপদর এই কুঁড়েমির জন্যে হাড়ে-চটা কেবল যে-মানুষটির সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হবার কথা সে-ই হরিপদকে আগলে রাখে, কোনোদিন কোনো নালিশ শুনি নি ওর বৌয়ের মুখে।

মেয়ে দুটো বারবার দরজা খুলে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে—হরিপদ

সঙ্গে পুলিস নিয়ে ফেরে কিনা দেখবার জন্যে। এরই মধ্যে হরিবোল দিতে দিতে মতিকে নিয়ে গেল। ইস্, যারা কাঁধ দিয়েছে শব বইবার জন্যে তাদের পা-গুলোর কি হাল্! রাস্তার পীচ গরমে গলে গিয়েছে। ওদের পায়ে ফোস্কা পড়বে যে!

আচ্ছা, আমাদের দেশের এই নিয়মগুলো এখন বোধহয় বদলানো দরকার—বিশেষ করে শহরবাজারে যারা বাস করে তাদের পক্ষে আমাদের লৌকিক আচারের অনেক কিছুই অস্বাস্থ্যকর, অসুবিধাজনক। কেন! যদি খালি পায়ে শব না নিয়ে যাওয়া হয়, তবে কি মৃতের অসম্মান হবে? শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা এগুলো ত সবই মনের ব্যাপার—লোক-দেখানো আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেন জাহির করার নেশা আছে।

ওদের কষ্ট দেখে এইসব ভাবছি, কিন্তু আমি নিজে কি পারব আচার-অনুষ্ঠানের বেলায় এতটুকু না-মেনে চলতে? কই তা ত পারি না। বরং আমার স্বামী এদিক দিয়ে সংস্কারমুক্ত বলে সেটা সময় সময় বাড়াবাড়ি মনে হয়। আমার মতো সাধারণ মানুষের এটাই বোধহয় সব চেয়ে বড় সমস্যা—আমরা নিয়মকে নিয়ম বলেই মেনে চলি, তার মধ্যে কতোটুকু ভালো আর কতোখানি ফাঁকা সেটা ধরতে পারলেও মুখে তা প্রকাশ করতে ভরসা পাই নে। অথচ এটা বেশ টের পাচ্ছি যে, বদল না হলে আর চলছে না। অনেকেই ত পাল্টাচ্ছে অনেক নিয়ম—কই তাদের ত সমাজে পতিত করা হচ্ছে না—তবে এই মায়া কেন! কেন তুমি-আমি সবাই মিলে বদলটাকেই বহাল করি না? কই তেমন জোর আমার মনের!···

রাত দশটা বেজে গেল আজ উনি এখনো অফিস থেকে কেন ফিরছেন না! ভাবনা হচ্ছে—রীতিমত দুর্ভাবনা। ছেলে দুটোকে ছাদে শুইয়ে দিয়েছি। বড় মেয়েটা আবার বাপ-সোহাগী। সেও এতক্ষণ ওঁর জন্যে না খেয়ে বসে ছিল। ও এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে

যেন মনে হচ্ছে বুঝি আমার মনের কথা ধরে ফেলবে। এ্যাকসিডেন্টের আশঙ্কা মনে মনে করছি এটা যদি ও বোঝে তাহলে ভয় পাবে ত, তাই ওকে বকে-ধমকে খাইয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলাম।

ঠায় বসে বসে হয়তো চোখের পাতা বুজে এসেছিল। হঠাৎ কড়া-নাড়ার আওয়াজে ধড়-মড় করে উঠে বসলাম। তাহলে মানুষটা ফিরেছে। হাঁফ ছেড়ে সাড়া দিলাম—যাই। ততক্ষণে বাপ-সোহাগী মেয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়েছে।

—কি ব্যাপার? এত দেরি যে—

উনি বললেন—'আর বলো কেন! ষাঁড়ের লড়াই।'

—তার মানে?

'ওই তোমার নণ্টুর কিশলয় কেনার জন্যে বই-পাড়ায় নেমে পড়েই কাল হল! আড্ডা জমে গেল শ্যামবাবুর দোকানে। তারপর যখন ভিড় পাতলা দেখে ট্রামে উঠলাম তখন কি জানি যে তিন-পা এগিয়ে ট্রাম থেমে যাবে। মেছোবাজার ছাড়িয়ে কালোয়ারপট্টীর সামনে রাস্তার মাঝখানে দুই ষাঁড়ে শিং-এ শিং বাধিয়ে এ ওর গতি আটক করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দু-ধারে কাতারে কাতারে লোক জমে আছে। মাঝে মাঝে বজ্‌রংবলী কি জয় দিচ্ছে। লড়াই যাঁরা করছেন তাঁরা ট্রাম-বাস গাড়িঘোড়া লোকজন কিছুই গ্রাহ্য করছেন না। শুধু দু-জনে পরস্পরের রোখ সামলাচ্ছেন। কি করি খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখলাম—তারপর হাঁটা শুরু করলাম।'

—বাঃ, তা ট্যাক্সি করেও ত আসতে পারতে।

'হ্যাঃ, মাসের শেষে পকেটে পয়সার গাছ গজাচ্ছে আমার!'

ঠোঁটের দিকে নজর পড়তে দেখলাম পান খেয়েছেন বাবু! শ্যামবাবুর আড্ডায় ওই এক নেশা—দোক্তা পান, যা আমি দেখতে পারি নে।

অনেক রাত হয়েছে বলে আর এ নিয়ে কথা তুললাম না, মনে মনে রাগটা হজম করলাম। আর যা-ই হোক এ্যাকসিডেন্ট যে হয় নি এই আমার বরাত বলতে হবে।

১৬

অপরাধের মধ্যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে পারলে দিব্যি আরামে থাকা যায়। ব্যস, তাতেই উনি ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে উঠেছেন,—টেরও পাই নি। আসলে আমি ত আর ভেবে-চিন্তে কিছু বলি নি, এমনিই কথার পিঠে কথা হিসেবে এ রকম সবাই বলে। উনি যে কতখানি চটেছেন সেটা জানা গেল ওঁর অপিসে বেরুনোর মুখে-মুখে। ওঁকে খেতে দিয়েছি, সামনে বসে খাওয়ানো আমার একটা নেশা। ওদিকে যে উনুনে দুধ বসিয়ে এসেছি সে কথা স্রেফ ভুলেই গিয়েছিলাম। রান্নাঘর থেকে দুধ-পোড়া গন্ধ বেরুতেই হুঁশ হল। ছুটে গিয়ে নামাতে-নামাতেও অনেকখানি দুধ উথলে নষ্ট হয়ে গেছে। ফিরে যখন এলাম তখন উনি চিম্‌টি-কাটা মিষ্টি সুরে বললেন—'বসে বসে দার্জিলিং-এর স্বপ্ন যারা ছাখে তাদের কি এই গরমে রান্নাঘরে মন বসে? দুধ ত দুধ, ডাল-ভাত তরকারিও পুড়বে এরপর!'

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এত বড় অপবাদ আমার পাওনা হবার কথা নয়। সত্যি ভগবান তুমি ত জানো, আমি কোনোদিন নিজের সুখ-সুবিধের কথা ভুলেও মনে ঠাঁই দিই নি। কিসে ওঁর কষ্টের লাঘব হবে কি করলে উনি ওঁর ছেলেমেয়ের (অবিশ্যি ছেলে-মেয়ে ত আমারও) মুখে হাসি ফুটবে সেই নিয়েই সর্বক্ষণ মাথা ঘামাই। তবু এই কথা বললেন উনি! এই গরমে রান্না করা যে কি দারুণ দুর্ভোগ তা আমিই জানি। রান্নাঘর ত নয় কামারশাল—ছোট তিন হাত চওড়া দু হাত লম্বা খুপরি, তার নীচু টিনের ছাদ বেলা আটটা না বাজতেই তেতে ফাল-

তাতা হয়ে যায়—তার ওপর পূব দিকে যে জানলাটা আছে তা দিয়ে রোদ ঢোকে, সেটা বন্ধ করে দিলে লাইট জ্বালাতে হয়, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না ত! যতো বেলা বাড়ে ততোই মাথার ভেতরে একটা দপ-দপানী যন্ত্রণা হয়। এ বাসায় যে বছর আমরা প্রথম এসেছিলাম সেবারই সেই যন্ত্রণা নতুন দেখা দিয়েছিল, সেবার মনে হয়েছিল বুঝি বা এই যন্ত্রণাতেই মারা যাবো। কিন্তু তা যাই নি, গরম কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই উপসর্গটাও সেরে যায়। আগের মতো এ যন্ত্রণাটা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাই না—বুঝেছি যে গরমে এটা হবেই। তবে কষ্ট যে হয় এটা ত ঠিকই মুখে বলি বা মুখ বুজে হজম করি! —আমাদের কেন সব বাঙ্গালীর বাড়ীতেই রান্নাঘর মানেই বন্দীশালা—এর জন্যে এতটুকু জমি খরচ না করতে পারলেই যেন ভালো হত। অথচ মজা এই যে, আমাদের দেশের মেয়েরা যারা অফিসে চাকরি না করে কিংবা ইস্কুল-কলেজে না পড়ে তাদের জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটে রান্নাঘরে।

উনি, মানে আমার স্বামী আগে আগে বলতেন শোবার ঘরে রান্না করতে। তা আমি রাজি হই নি· ধোঁয়ার কালিতে ঘর যে নোংরা হয়! বেগতিক দেখে সস্তার একটা ইলেকট্রিক হিটারও এনে দিলেন সেদিন—তাতে চা-টা টোস্টটা হয় বটে আমার সংসার ছোট হলে হয়তো রান্নাও করা যেত কিন্তু ওতে আমার পোষায় না, সময় যেন বড় বেশি লাগে। আসলে উনি যদি বা আমার কষ্টের লাঘব করতে চান, আমার এতদিনের অভ্যাসের জন্যে সে পথে চলতে আমার বাধ-বাধ লাগে। তা বলে দার্জিলিং-এর কথায় উনি কেন এমন দুঃখ পান। অবিশ্যি এও হতে পারে যে, বিয়ের পর উনি যখন একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন তখন একাই গিয়েছিলেন—আর সেখান থেকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির ভাষায় কি কাব্য! পড়তে পড়তে আমি বাপের বাড়ির একা ঘরে বসেও লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে যেতাম। সব চিঠিতে বার বার লিখতেন—এমন জায়গায় একা একা ভালো লাগে না।

এত সুন্দর দৃশ্য দেখবার সময় কেবলই মনে হয় পাশে তুমি নেই, তোমাকে দেখাতে পারলে তবে আমার তৃপ্তি হত! আসছে বার তোমাকে নিয়ে বার্চ হিলের এই পাইন-রোডোডেনড্রনের বীথিকায় বসে সকালের মিঠে রোদে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব।...ঢলা পাহাড়, গোলাপী-গাল কাঞ্চী মেয়েদের কথা, ঘুম পাহাড়, কুয়াশা সব যেন আমার চোখে স্বপ্নের মতো। আজো পর্যন্ত মাঝে মাঝে ওঁর তোলা দার্জিলিং-এর ফোটোগুলো দেখা আর পুরনো সেই সব চিঠি পড়া ছাড়া দার্জিলিং-এর বাড়তি পরিচয় আমি পাইনি। ওঁর চাকরি, ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে গিয়ে থাকার খরচ—এই সব হিসেব করে দার্জিলিং দেখার আশা মন থেকে বিদায় দিয়েছি। তবু যদি কখনো দার্জিলিং কথাটা কানে যায় বা চোখে পড়ে তখন ওঁর লেখা সেই চিঠিগুলো মনে পড়ে, মনে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারধবল ছবি। আমি জানি সেই আমার দার্জিলিং, সেকথা ওঁরও না-জানার নয়। তবু কেন আমাকে ভুল বুঝলেন উনি? সত্যিই কি ভুল বুঝেছেন না, নিজের মনে যা উনি চেয়েছিলেন তা করতে পারেন নি বলেই এই বিপরীত প্রতিক্রিয়া?

•

হালখাতার দ্বিতীয় কিস্তী আসছে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। আগে আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি এই দিনে কলসী উৎসর্গ হত, আম উৎসর্গ হত আর হত আমের ঝালকাষণ—সরষে কোটা, লঙ্কা পেশা, কাঁচা আম থেঁতো করা বাড়িতে যেন মহা উৎসব লেগে যেত। আর এখন আমার একার সংসারে এতো সব কে-ই বা করে! তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা জেলী ভালোবাসে বলে আমের জেলী করি। নিজেদের জন্যে আম-তেল করি। তারজন্যে তিথিনক্ষত্র লাগে না। বাজারে কাঁচা আম সস্তা হলেই সেদিনটাই প্রশস্ত তিথি। জেলী ত এবারেও করেছিলাম, তা নণ্টু-বোল্টুর জ্বালায় সে কবে শেষ হয়ে গেছে। চিনির যা দর তাতে বারবার করাও মুস্কিল---আমও এবার তেমন সস্তা হতে পেল না।

শ্যামবাজার থেকে সেদিন কেনাকাটা করে ফিরতি মুখে পাশের দুই বুড়ির কথা শুনছিলাম, 'ছেলেরা সব মেলেচ্ছো হয়েছে, বৌয়েরা খ্রিষ্টানদের মতো। আচার-বিচার মানামানির বালাই নেই, দিন-রাত কেবল হিমানী আর শাদা ছাই মেখে পটের বিবি সেজেই এলিয়ে পড়েন। অক্ষয় তৃতীয়ায় মা-গঙ্গায় মাথা ডুবিয়ে পাপ ধুয়ে পুণ্যি-পুঁজি করবে—তা নয়!'...আমারও ইচ্ছে হয় গঙ্গায় ডুব দিয়ে চান করতে! কতো দিন মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে চান কপালে জোটে নি। কিন্তু আমাদের এখান থেকে গঙ্গায় যাওয়া-আসা এত হাঙ্গামা যে ও-আর হয়ে উঠবে না।

আজ বাদে কাল অক্ষয় তৃতীয়া। একটা দোকান থেকে নেমন্তন্ন করে গেছে—ওঁর নামেই চিঠি দিয়ে গেল, অবিশ্যি উনি নিজে সে দোকানে কখনো যান নি। আমিই সেখানকার খদ্দের। কিছুদিন আগে নাম-ঠিকানা লিখে নিয়েছিল, তা এই জন্যে! চিঠিখানা দেখে উনি জিগ্যেস করলেন—'কতো বাকী ফেলেছ?'

—এক পয়সাও না।

'তবে কেন হালখাতার নেমন্তন্ন করল!'

—ওই দোকানে বুড়ো একজন আছেন খুব ভদ্র তাঁর ব্যবহার।

চিঠিখানা রেখে দিয়ে উনি বললেন 'রাজশেখর বসু মারা গিয়েছেন, শুনেছ?'

—পরশুরাম? হঠাৎ, কি হয়েছিল!

'অসুখ-বিসুখ তেমন কিছু হয় নি। আজ দুপুরে হঠাৎ মারা গিয়েছেন।'

পুরনো আমলের একজন দিক্‌পাল চলে গেলেন। দুর্গাপুজোয় ত আর আনন্দের কিছুই খোরাক ছিল না—ওই পরশুরামের লেখাতেই কেবল নির্ভেজাল হাসি—পুজোর দিনে আমাদের মনকে মাতিয়ে দিত, তাও চিরকালের মতো ঘুচে গেল!

উনি বললেন—'কাল সকালে আমার কিন্তু সব কটা খবরের কাগজ চাই। দেখব কে কি লেখে।'

মনটা ওঁর খুব ভেঙ্গে পড়েছে। উনি ভগবান মানেন না কিন্তু মানুষ মানেন। আমি জানি এই নাস্তিক মানুষটি মনে মনে মানুষ পূজো করেন। উনি যে সব মানুষকে শ্রদ্ধা করেন তাঁরা বেশির ভাগই বেঁচে নেই। জীবিত বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখেছি, রাজশেখর বসুকে উনি দেবতার মতো মানেন। সেই মানুষটা মরে যাওয়াতে ওঁর মুষড়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। খেতে বসে হঠাৎ বললেন—'জানো বাসবী, লোকটা বাঙ্গালী ছিল না মোটেই। এমন স্বাবলম্বী বাঙ্গালীর মধ্যে আর ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

বললাম—তা তুমি খবরটা পেলে কোথায় ?

কোথায় যেন সাহিত্যিকদের থিয়েটারের রিহার্সাল হবার কথা ছিল। ওঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সেখানে রিহার্সাল দেখতে গিয়েই খবর শুনেছেন। রিহার্সালের বদলে শোকসভা হচ্ছে।

খেতে খেতে হাত গুটিয়ে উনি বললেন—'সব দেখে-শুনে আমার মনে হচ্ছে সব সাহিত্যিকই মানুষের মতো মানুষ নয়। একটা ব্যাপার ছাখো, যিনি সবে মারা গেছেন তাঁর শবদেহ চিতায় ওঠবার আগেই এরা সভা করে শোক জাহির করছে। ব্যাপারটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, সাহিত্যের মূল সম্বল যে-মন সেই মনটাই এই সভা-হুজুগে সাহিত্যের ব্যাপারীরা খুইয়ে বসে আছে। রাজশেখরের মৃত্যুতে মন ত খারাপ হয়েছিলই তার ওপর এই শোকসভার বহর দেখে আরো খারাপ হয়েছে। তুমি দেখে নিয়ো বাসবী, এরা শোকসভার খবরটা লোক দিয়ে খবরের কাগজের অফিসে পাঠাবে, সেটা ছাপা হবে কাল সকালে। একই সঙ্গে মৃত্যুসংবাদ আর শোকসভার খবর বেরুবে! কেন, ওঁরা আর একটু কষ্ট করে মৃতের বাড়িতে কিংবা শ্মশানে গেলেও ত নাম ছাপাতো কাগজওয়ালারা!'

এত দুঃখের মধ্যেও মাঝে মাঝে কিছু সান্ত্বনা কপালে মিলে যায়, এই যেমন আজকের একটা খবর রয়েছে—পকেটমার নিজে

উপযাচক হয়ে কলম আর ঘড়ির মালিককে তার জিনিস ছুটো ফেরত দিয়েছে।

লোকটা ডেলিপ্যাসেঞ্জার, নিশ্চয় অফিসের কেরানী, নিজের কলম আর ঘড়ির শোক ভুলতে পারছিল না—তাই হাওড়া ব্রীজের ওপর যেখানে তার জিনিস খোয়া গিয়েছিল সেখানে যাওয়া-আসার পথে রোজ ছু-দণ্ড দাঁড়াত, আস্তে আস্তে চলত আর আপন মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আফশোস করত। লোকটা নিত্যি এইভাবে খেদ করত বলেই হয়ত পকেটমারের করুণা হয়েছিল তাই দয়া করে যেচে ফেরত দিয়ে গেল আসামী।

উনি অফিস থেকে ফিরতেই বড় মুখে খবরটা দিতে গেলাম। উনি নাক কুঁচকে জবাব দিলেন 'যেমন মেয়েলী বুদ্ধি। আরে আসলে লোকটা রোজ ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে এ্যান্টি প্রোপাগাণ্ডা করত, সবাইকে হুঁসিয়ার করে দিত মশাই আমার এখানে পকেটমারা গিয়েছে, দেখে শুনে চলুন, বমাল সামাল। তার ফলে পকেটমারদের বিজনেসের ক্ষতি হচ্ছিল। সবাই যদি সাবধান হয়ে চলে তাহলে পকেটমারদের কারবার গুটোতে হয় যে! সেই দশাই দাঁড়িয়েছিল—তারপর ফেরত না দিয়ে আর করে কি।'

ব্যাপারটা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই, বলি—পকেটমারদেরও কারবার, তুমি বলো কি! চুরি জোচ্চুরিকেও তুমি কারবার বলবে!

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন —'চাকরীই বলো আর ব্যবসাই বলো যে যা করে তা-ই তার পেশা বা কারবার। এই নির্লজ্জতার যুগে সবাই সব কিছুকে পেশা করতে, পেশার কথা বড় মুখ করে জাহির করতে পিছ-পাও নয়। আজ না হলেও ছু-দশ বছরের মধ্যে চুরি জোচ্চুরিকেও লোকে কারবার বলবে। হয়তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেখবে যে—উচ্চ কৌশল বিশিষ্ট সুদক্ষ পকেটমার চাই। বেতন যোগ্যতানুসারে। বক্স নং ক ৪২০-এ আবেদন করুন।

হাসতে হাসতে বললাম—যাঃ তাই কি হয় নাকি। খবরের কাগজে সে বিজ্ঞাপন ছাপবে কেন!

উনি কিন্তু একটুও হাসলেন না, বললেন—'আলবৎ ছাপবে। বিজ্ঞাপন যদি তুমি পয়সা খরচ করে দাও তাহলে তা না ছাপা ত লোকসান। এই ছ্যাখো সেদিন একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষার নোট বইয়ের। ভাবো, প্রাইমারী ছাত্রদের আমল থেকেই নোট মুখস্থর দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। কারা করছেন এই কাজ, না, প্রাইমারীর শিক্ষক সমিতি। যারা এই নোট বেচবে তাদেরও লোভ দেখানো হয়েছে, নগদ দামের প্রায় অর্ধেক মুনাফার লোভও দেখানো হয়েছে।—তা এই বিজ্ঞাপন যদি ছাপা হয়ে থাকে তাহলে আমার ত মনে হয় তোমার পকেটমারের বিজ্ঞাপন ছাপতে কোনো দোষ নেই।'

—এ তুমি কি বলছ। ছুটো এক হল?

'না তা অবিশ্যি নয়। পকেটমার কেবলমাত্র তাদেরই ক্ষতি করছে যাদের পকেটমারা গেল। কিন্তু এই মাস্টারমশাইরা একসঙ্গে গোটা সমাজের কি সাংঘাতিক ক্ষতি করছেন সেটা ভেবে দেখেছ? অবিশ্যি প্রাইমারী স্কুলের যা মাইনের হার তাতে আধপেটাও চলে না বলেই এই ধরনের উঞ্ছবৃত্তি মাস্টারমশাইদের না করে উপায় নেই। বুঝলাম। কিন্তু তাতে করে ত শিক্ষার যা ক্ষতি হবার সেটুকু ঠেকানো যাচ্ছে না! সরকার ত মাইনে বাড়াবেন—বাড়াবেন হামেশা শোনা যায়—কিন্তু সেটা তেমন-তেমন বাড়ানো, তাড়াতাড়ি বাড়ানো খুব দরকার, নইলে আমরা গেছি।'

ওঁর মতো অতো তলিয়ে ভাববার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু উনি যখন এইভাবে বুঝিয়ে বলেন, তখন সত্যি আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার নণ্টু-বোণ্টুর মতো গোটা দেশময় যে সব ছেলেমেয়ে রয়েছে ওরা কি বাস্তবিকই মানুষ হতে পারবে না! এমন কেন হচ্ছে ভগবান? তোমার কি একটুও নজর নেই এদিকে।...

আজ যখন বেলাদের বাড়ি থেকে ফিরছি তখন দেখি একখানা

বাসের সারা গায়ে মানুষগুলো বাদুড়ের মতো ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, বাসখানার ছাদেও জনকয়েক যাত্রী বসে আছে। কোথায় যাবে ওরা? উনি বললেন—'হয়ত ব্যারাকপুর কিংবা সোদপুর, কি বেলঘরিয়া!'

এইভাবে?—

'হ্যাঁ, এছাড়া উপায় কি। বাড়ি ত ফিরতে হবে। হয়ত তোমার মতো ওদের স্ত্রীরা হাঁ করে বসে আছে, স্বামী ফিরলে পরে তবে খাবে! যারা চড়েছে তারা ত বাড়ি পৌঁছবে, ধরো লাস্ট বাসে যে উঠতে পারল না, তার বাড়ির লোকেরা কি দুশ্চিন্তায় কাটাবে।'

না, আর ভাবতে পারি না। এইভাবে আমরা সবাই বেঁচে চলেছি। আশ্চর্য!

সকালে আকাশে মেঘের আভাস দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিল—তবে হয়ত আজ বৃষ্টি হবে। খবরের কাগজেও দেখলাম সেই কথাই লিখেছে। উনি অবিশ্যি হাত নেড়ে ফতোয়া দিলেন, 'যদি বা কিছু হত, তার আর চান্স রইল না। খবরের কাগজের কথা তোমার সরকারই বলো বা ভগবানই বলো কেউ মানে না।'

আকাশের দিকে আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দাও-দাও দুফোঁটা বৃষ্টি দাও। ফুটি-ফাটা মাটির বুক জুড়োক।

মাটির কথা বললেই আমার দহননগরের কথা মনে পড়ে। সেখানে মাটির ওপর ঘাস-লতা শুকিয়ে খড়ের মতো শক্ত আর নীরস হয়ে গেছে। আর সমতলের জমি এতটুকু অখণ্ড নেই—প্রতি দু-তিন ইঞ্চিতে ফাটল ধরে যেন তৃষিত ধরণী হাঁ করে জল চাইছে। কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে ওই শুকনো মাঠের ওপর, মরা ঘাসের গায়ে মাকড়সারা জাল বুনে বেঁচে আছে দেখে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপেরই মতো। অবাক করে দিয়েছিল এই আজব প্রাণী আমাকে।

আমাদের এ পাড়াতে কলের জলেও টান ধরেছে। সরু ফিতের মতো জলের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেটে জল আসে।

আকাশ থেকে তৃষ্ণা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে।

এর পর ঝড় উঠবে, ধূলো উড়বে, গাছপালা উপ্‌ড়ে মানুষ জখম হবে তারপর হয়তো ওই যেখান থেকে তৃষ্ণা এসেছে নেমে—সেখান থেকেই বৃষ্টি নামবে।

আমাদের এ শহরের সবই বাড়াবাড়ি। যখন বৃষ্টি নামবে অঝোর ধারায় যখন নর্দমা উপ্‌ছে রাস্তায় জল উঠবে। আর একবার পথের ওপর জল দাঁড়ালে তখন আর তাকে নামায় কার সাধ্য। থৈ থৈ জলের ওপর দিয়ে ছপ ছপ শব্দ করে, জুতো হাতে নিয়ে পথে মানুষ চলবে—গাড়ি-ঘোড়া তখন বন্ধ। তখন আমরা যেন অন্য পৃথিবীর মানুষ। টালা আর বেলগাছিয়া পুলের ওপারে যে কলকাতা শহর তার সঙ্গে আমাদের তখন শ্বশুর-ভাসুরের সম্পর্ক।

কিন্তু সেসব কথা এখনই বা ভাবছি কেন? এখন ত কলে জল নেই। বস্তীর লোকেরা মজা পুকুরেই দরকারী কাজ সারছে। বড় ড্রেনকে উনি বলেন ভোগবতী –রোদের টানে সেই নর্দমার জল শুকিয়ে পাঁক আর আবর্জনা পচা গন্ধ বেরুচ্ছে! এর ওপর সোনায় সোহাগা হয়েছে বেলাদের বাড়ির সামনা-সামনি যশোর রোডে নর্দমার পাঁক তুলে পথের ওপর জমিয়ে রেখেছে। সেগুলো শুকিয়ে ধূলো হয়ে উড়ে উড়ে বাতাসের রঙ পাল্‌টে দিচ্ছে আর কাঠচাঁপার বদলী গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই উপরি পাওনা!

ঝড়-বৃষ্টি না থাকলেও গান আছে আমাদের কপালে। এ গান কে গায়? কেন, গান গেয়ে যারা ভিক্ষে করে বেড়ায় তারা। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ভালো গান শুনতে—রেডিয়ো বা গ্রামোফোনের গান ভালো লাগে, ওস্তাদী গানেও আমি রস পাই। কিন্তু সেই ছোটবেলায় মাঠে-ঘাটে শোনা গানের রেশ যখন মনকে অস্থির করে তোলে তখন ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি চাওয়ার মতোই অবস্থা দাঁড়ায়। না, ঠিক তা নয়, আমাদের আজ অবসর কোথায় মনকে নিয়ে

মেতে থাকার ? তবে, যদি কখনো কোনো ভিখারীর গলায় সেই সব গান শুনি তখন খুশি হই, হাতের কাজ ফেলে রেখে তার দিকেই মন দিই।

আজ সেই দুর্লভ সুযোগ জুটে গেল।

পাশের বাড়িতে এক সুরেলা গলার বাউল গান শুনে ঝোণ্টুকে পাঠালাম—যা ডেকে নিয়ে আয়।

লোকটার বয়স হয়েছে। পুরনো তেলের টিনে একতারা বেঁধে বেশ সুর বার করছে ত! হয়তো মানুষটার মন গানের ধ্যানেই থাকে—নইলে একের পর এক গান গেয়েই চলেছে। আমার আবার মনের মতো গান পেলেই লিখে-নেওয়া বাতিক আছে। আগে ত কতো গানই একরকম লিখে নিয়েছি। আজ আবার অনেকদিন পরে সেই ইচ্ছে পেয়ে বসল। গান লিখছি দেখে লোকটা বলল—'গান লিখবেন না মা, ওতে আমাদের ক্ষতি হয়।'

কি আর করি, লেখা বন্ধ করলাম। মনে হল, এতে ওর কী ক্ষতি হত!

লোকটা গান থামিয়ে গল্প জুড়ল। নিজের জীবনের কথা। খুলনা জেলার সাতক্ষীরাতে বাড়ি ছিল, এখন পাতিপুকুরে থাকে। যেখানে মিলিটারীরা থাকত সেই জমিতে খোলার ঘর করে পরিবার নিয়ে থাকে। সংসারে ওর একটি আট-ন বছরের ছেলে আর স্ত্রী। কথায় কথায় বলল—'গুরুর কৃপায় গান গেয়ে দিনে এক সের-তিন পোয়া চাল পাই, দু-চার আনা পয়সাও হয়। কোনো রকমে চলে। তবে ছেলেটা মানুষ হচ্ছে না মা। সেই এক ভাবনা আমার। ভাত-কাপড়ের দুঃখ যা হোক সয়ে গিয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় অপমান হতে হয়। এই যে আপনি আদর করে চৌকাঠের এপারে ডেকে বসিয়ে গান শুনছেন, এরকম ত আর সবাই না—দরজা বন্ধ থাকলে যদি বাইরে দাঁড়িয়ে গান গাই, কেউ বা দয়া করে কিছু দেয়, আবার কেউ মুখের ওপর বলে দেয় চুরির মতলবে—! দুনিয়া ত

কারুর কেনা নয় মা, যে যা ইচ্ছে বলুক—ভিখিরির মাথা হেঁট্ করেই থাকতে হয়।'

লোকটা কাঁদল। পয়সা দিলাম। হেসে বলল—'মা লক্ষ্মী, আবার আসব ত?'

—নিশ্চয়।

ওদিকে উনুন বয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়ের বিকেলের জলখাবার করতে হবে। কিন্তু এদিকে ছুটি দিচ্ছে না লোকটা। কি ভেবে বলল—'কই, গান লিখছিলেন, লিখে ন্যান!'

—থাক তোমার ক্ষতি হবে।

'না মা, আপনি নিলে ক্ষতি নাই। গুরুর কৃপায় ভাণ্ডারে আমার গানের অভাব নাই।

ওর কাছে শুনে শুনে লিখলাম ঃ

মা, আমি জন্মাবধি অপরাধী
বিচারে শাস্তি দে মা কয়েদ করে,
তোর শ্রীচরণ কারাগারে।
দে মা আমায় দ্বীপান্তরে
ভবসিন্ধু পারাবারে
আর আসতে না হয় জঠরে।
আমায় মুক্তি দে মা মুক্তকেশী
আর যেন না ভবে আসি
রাখিস মা তোর চরণ-কাশী, আমারে।
না হয় সতী মা আমারে।
চালান করে দাও সদরে
পৌছি গিয়ে সহস্র দলে
এবার থেকে পরম ব্রহ্মপুরে
ডাকব তোরে মা মা বলে
রাখিস আমায় আটক করে
তার ফটকে ভবসিন্ধু পারাবারে।

গানখানা শুনতে যতো ভালো লেগেছিল, লেখবার পর আর তেমন লাগছে না। ওর গাইবার ধরন, গলার দরদ, ভক্তির আমেজ কিছুই যে আমার নেই।

নণ্টু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—'মা, তুমি ওই লোকটার কাছে যে গান লিখে নিলে ওটা কি রবীন্দ্রনাথের গান?'

—না বাবা, কার গান আমি জানি নে।

আর দুদিন বাদেই পঁচিশে বৈশাখ। নণ্টুদের স্কুলে সেদিন জন্মোৎসব হবে। নণ্টু এখন রবীন্দ্রনাথের গোঁড়া ভক্ত।

অবিশ্যি ভক্তি থাকা ভালো, তবে রবিঠাকুরের ওপর ভক্তির জন্যে যেন আজকাল আর কিছুই দরকার হয় না। স্রেফ নির্ভেজাল ভক্তি দিয়ে কি হবে। যদি রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ না পড়ে হুজুগ করা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের কিছু যাবে আসবে না, আমাদেরই দৈন্যের পরিচয় বাড়বে। কয়েক বছর আগে এমনি এক স্মরণোৎসবে গিয়েছিলাম—তা সেখানে অনুষ্ঠানের উপচারে কোন ঘাটতি ছিল না। দেড়-শ পৌনে-দুশো লোকের জমায়েতে মাইক ছিল, বাইরে লাউড স্পীকার ছিল, শাড়ি-পাঞ্জাবীর বাহারও ছিল। কিন্তু ছিল না কেবল নিষ্ঠা। নইলে 'চিরনূতনেরে দিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ' গানটির বাণী গাইবার সময় 'ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়' এর বদলে কোনো এক গায়ক গাইলেন, 'ব্যর্থ হোক…'

হয়তো রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনেকখানিই ব্যর্থ হয়েছে আমাদের জীবনে। কিন্তু সবটুকু ব্যর্থ হতে দিলে ত চলবে না?

সামনে আসছে শতবার্ষিকী—এই সময় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর কোনো সুলভ সংস্করণ কি প্রকাশিত হবে না? আমাদের দেশের লোকের বা আর্থিক অবস্থা তাতে একজন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে রবীন্দ্র-রচনাবলী সর্বগুলি কিনে ঘরে রাখা প্রায় অসম্ভব। অথচ এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্যের অন্যতম—না, শুধু কেনা নয়, পড়াও অবশ্য!

দামে সস্তা হলেই এটা সম্ভবপর, নতুবা সাধের সঙ্গে সাধ্যের মিল হবে না।

আজ পাল্লায় পড়ে শোভনাদের সঙ্গে স্কুলের প্রাইজ কিনতে গিয়েছিলাম। এত রকমের খেলনাও বেরিয়েছে আজকাল। দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। প্রাইজে বই দেওয়া হচ্ছে না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলনাই পছন্দ করে বেশি, আর সস্তাও পড়ে এগুলো। ভালো বই যা, তার দাম বেশি।

আমার সামনে একটি ফুটফুটে ছেলে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে তার বোধহয় কাকা। কাকা যতো বলেন, 'বস' সে কিছুতেই বসে না, বলে, 'দেখি!' তারপর প্রশ্ন শুরু হল। ড্রাইভারের পিছনে যে কাচের দরজা তাতে একটা বিজ্ঞাপনে ময়ূর আঁকা আছে ছেলেটার লক্ষ্য ওই ময়ূর। 'ময়ূরের পা কোথায়? ময়ূর কি তেল মাখে? ময়ূরের পেখম কোন্‌টা? ও যে উড়বে, তা ডানা কোথায় গেল?' আধ আধ সুরে অনবরত প্রশ্ন করে চলেছে। আমার নন্টুও আগে এই রকম ছিল। ছেলেটাকে দেখে নন্টুর কথা মনে হচ্ছে। সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, আনি নি। সে জন্যে রাগ করে বলেছে 'তুমি কেন এ বাড়িতে আসতে গেলে? তোমার মায়ের বাড়িতে থাকলেই বেশ হত!' আহা ছেলেটাকে আনলেই হত।

বিকেলে ফেরবার পথে শ্যামবাজারে নামলাম কাপড় কিনে নিয়ে যাব বলে। নেমেই মনে হল জগনের মায়ের কথা। বেচারী আজ দুপুরে ঘরে ফিরেই স্বামীর কাছে খুব পিটুনি খেয়েছে। শুধু শুধু মারল বৌটাকে। লোকটার যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকত! ঘরে বসে বসে বৌয়ের রোজগার খাচ্ছে আবার উল্টে যেই বৌকেই মার-ধর করল! জগনের মায়ের কাছে বুঝি পয়সা চেয়েছিল, তা সে বলেছে—পয়সা নেই। তখন লোকটা বলেছে, 'তাহলে তোর যে নতুন কাপড়খানা আছে, সেটা বেচে দিই।' কেন? 'না, অনেকদিন মাংস খাই নি—আজ মাংস খেতে ইচ্ছে হয়েছে।'

তাতেও আপত্তি করেছে জগনের মা। গত পূজোতে তিনখানা শাড়ি পেয়েছিল বাবুদের বাড়ি থেকে। তার দুখানা বিক্রি করে বিপদ-আপদ ঠেকিয়েছে। আর যেখানা রয়েছে সেখানাও তেমন দরকার পড়লে বেচবে বলে তুলে রেখেছে। স্বামীর মাংস খাওয়ার শখকে আমল দেয় নি জগনের মা। ব্যস, অমনি চটে গিয়েছেন পুরুষসিংহ।

পুরনো ছেঁড়া কাপড়-জামা দিয়ে বাসনউলিদের কাছ থেকে এটা-ওটা কিনতাম আগে। আজকাল ওইগুলো জগনের মায়ের ভোগে লাগে। আমার কাছে সামান্য দাম দিয়েই কিনতে চেয়েছিল, তা ওর আর কি দাম নেওয়া যায়! জগনের মাকে সবাই বলে—'অমন স্বামীকে ধরে মার দিতে পার না? না হয়, ভাত বন্ধ করে দাও, তখন শায়েস্তা হবে।'

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ, বলে 'তবু ঘরেই থাকে, বার-দোষ ত নেই ওই ইয়ের মতো! বদরাগী হলেও স্বভাব-চরিত্তির মন্দ নয়।' জগনের মায়ের এ-কথা শুনলে হাসিও পায়।

বাড়ি ফিরে দেখি, আমার ননদ এসেছেন। আমাদের জন্যে দু-বোতল ঝালকাষণ এনেছেন। উনি বড় ভালোবাসেন, বলেন—'তোমাদের ওই মাস্টার্ড-এর চেয়ে আমাদের কাষণ অনেক ভালো।'

ভালো বলেই ত উনি নিশ্চিন্ত। আমি একা মানুষ—সব দিক বজায় রাখতে চেষ্টা করেও কি সব সময় পারি! ননদদের সংসারটা এখনকার দিনের দৃষ্টান্তে বড়ই বলা যায়—শ্বশুর, শাশুড়ি আর চার ভাইয়ের সংসার। কাজেই ওদের বাড়িতে এ-সব রেয়াজ এখনো রয়েছে।

পিসিমার সঙ্গে ছেলেদের বিশেষ করে নন্টুর খুবই ভাব। কাজেই আমি যখন বাড়িতে পা দিলাম তখন আর তার মায়ের ওপর রাগ নেই দেখে খুশিই হলাম।

বোল্টু গম্ভীরভাবে খবর দিল—'বাবুজীর ঘরের সেই টিকটিকিটা মা মা—ওপর থেকে ধপ করে চিৎ হয়ে পড়ল, আর মরে গেল!' বোল্টুর আবার পোকা-মাকড়ের ওপর খুব মায়া।

আমরা আসলে অল্প-প্রাণ জীব —একটুতেই মরি-বাঁচি, একটুতেই হাসি বা কাঁদি, এতটুকু কিছু করতে পারলেই বিরাট কোন কীর্তি সম্পাদনের মহা-আনন্দ আদায় করি নিজের মনের কাছ থেকে ত বটেই, অন্যের কাছ থেকেও প্রত্যাশা করি। যদি অন্যের কাছে না পাই ত দোষ দিই সেই ব্যক্তিকে কৃপণ বলে, অবুঝ কিংবা অকৃতজ্ঞও ভেবে বসি। দোহাই ভগবান, আমার এ কথাগুলোকে কোন বড় আঘাতের প্রতিক্রিয়া ভেবে বসো না। বড়-র যুগ আবার যদি কখন ফিরে আসে হয়ত তখনই আমরা টের পাব ঃ কত ছোট আমাদের এই পিঁপড়ের মতো অস্তিত্ব।

অনেকগুলো এলোমেলো ঘটনার টুকরো আমাকে অস্থির করে তুলেছে, তারই বেদনাসিক্ত নির্যাস আজকের আমার এই চিন্তা। হয়ত একটা ব্যাপারের সঙ্গে অন্যটার কোনই সম্পর্ক নেই, হয়ত তুমি আমার এই অসংলগ্ন ভাবনার স্ফুলিঙ্গকে ফুৎকারে উড়িয়েও দিতে পার—দাও, তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কেননা, আমি জানি যে, আমার মতো হাজার-হাজার, লাখ-লাখ, কোটি-কোটি মানুষের প্রতি মুহূর্তের থাকা-না-থাকার বাঁচা-না-বাঁচাকে তুমি পলক ফেলেও গ্রাহ্য কর না। আর তা কর না বলেই, তুমি এত হৃদয়হীন বলেই ত আজ আমাদের এত দুর্দশা ! হাসছ ত? হাসছ বুঝি এই ভেবে যে, মানুষের দুর্দশা যত বাড়বে, মানুষ নিজেকে যত বেশি অসহায় মনে করবে তোমার আসন তত ফলাও হয়ে মানুষের মনকে দখল করে ফেলবে। কিন্তু তোমার কি একবারও মনে হয় না যে, মানুষ এমনি করে ঘা খেতে খেতে শেষে একদিন তোমাকে ভুলেই যাবে—কেন না, সে নিজের মনুষ্যত্বকেও যে ভুলে বসবে! শুধু মাত্র বাঁচা, জান্তব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে লড়াই করতে করতেই যদি তার সবটুকু প্রাণ-শক্তি খরচ হয়ে যায় তাহলে বেচারার মনে টেকে কি করে! আমাদের সেই দশাই হতে চলেছে।

কেন? বলছি।

আমাদের পাড়াতে একটা মুদিখানার দোকান গজিয়েছে। অন্যান্য সব দোকান পয়লা বোশেখ হালখাতা করল, অক্ষয়-তৃতীয়াতেও কেউ কেউ করেছে, কিন্তু যেহেতু এই দোকানের মালিক ·াধুনিক আলোক প্রাপ্ত বলে পঁচিশে বৈশাখ হাল-খাতা করছেন বলে পাতি ছাপালেন। আর ওই পঁচিশে বৈশাখের প্রভাত হল আমাদের 'চির নূতনের দিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ গানের মধ্যে ? না, না, 'আয়ে গা', 'গেরোবাজ বেরো আজ' এই-সব গানের প্রচণ্ড মাইক বাদ্যে!

রেডিয়োর কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত ওই মাইকের (নণ্টু আগে মাইককে might অর্থাৎ মাইট বলত) দাপটে শোনবার উপায় নেই।

এই থেকেই ওঁদের রবিবাসরীয় চায়ের আসর সরগরম হয়ে ওঠে। ওঁর এক বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন- 'দোকানের মালিক ত কোন দোষ করে নি, তোমাদের ওই সিনেমাতেই এ ধরনের নিষ্ঠার প্রথম জন্ম। এই ধর না কেন, 'বাইশে শ্রাবণ' যে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের দিন এ-কথাটা স্মরণ করিয়ে রাখার জন্যে যদি কোন ছবির নামকরণ ওই তারিখের নামে হয় তাহলে অমরত্ব প্রাপ্ত হবেন কবি!'

আমার স্বামী চটে গেলেন, —'যদি ছবির কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোন সম্পর্কই না থাকে তাহলে এই নামের কি তাৎপর্য! আমার ত মনে হয়, ওই নামের মাহাত্ম্যকে ভাঙিয়ে লোককে ভাঁওতা দেওয়াই ছবির কর্তাব্যক্তিদের উদ্দেশ্য! এর আগেও ছবিতে এ জাতের নামকরণ হয়েছে, যেমন যোগাযোগ, ঘরে-বাইরে, অভাগীর স্বর্গ!'

ওঁর বন্ধু পাকা তার্কিক লোক, তিনি বললেন—'ওগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। তাহলে পুলিসে ধরত, না হয় জনসাধারণে এ্যায়সা আপত্তি করত যে ছবিওয়ালারা জনমতের চাপে এ-জাতের নামচুরি বন্ধ করত।'

উনি মাথা নাড়লেন—'আইন করে এসব চালাকি বন্ধ করা দরকার।'

—আইন করলে আইনকে ফাঁকি দেওয়ার পথ-ফন্দি বার করে

ফেলা যায়। আইন করে তুমি কি মানুষের মনে মনুষ্যত্বের প্রতি প্রেম চাপাতে পার? পার না। আইনগুলো আসলে লাঠিরই ভদ্র নাম। আইন ত্রাসের সঞ্চার করে। আসলে আমাদের দেশের মানুষ শিক্ষার সুন্দর আলো থেকে বঞ্চিত। নইলে তুমি ভেবে ছাখো, আগেকার আমলে কোন ছবি যখন পর্দায় আনা হত, তখন তার পিছনে ভাল-মন্দের বিচার থাকত, থাকত আদর্শের দিকে নজর, থাকত সামাজিকতা-বোধের পরিচয়। আর আজকাল ছবি তৈরী করবার সময় সব আগে নজর থাকে 'বক্স অফিস' মানে 'টাকা লুটবার' ফিকিরের দিকে। সংখ্যায় ছবি হচ্ছে অনেক, তবে ভাল ছবি হচ্ছে অনেক কম। ব্যাদার মানুষের মনে এখন কমার্স রাজত্ব করছে। প্রেম, রাজনীতি, মানবপ্রীতি কিছুই কিছু নয়, যদি তোমার ছবি ফ্লপ করে। অতএব যে যেদিক দিয়ে পারছে মার্কেটকে হাতের মুঠোতে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে। একে তুমি অন্যায় বলতে পার, কিন্তু অপর পক্ষ এইটাকেই স্ট্রাগল ফর এক্‌জিসটেন্‌স' বলবে! আর আমাদের বর্তমান সাধারণের মনে সিনেমার প্রভাবই বেশি, তাই 'বাইশে শ্রাবণ' ছবি দেখে পঁচিশে বৈশাখ মুদিখানার হালখাতা হয় দুটোর কোনটার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্ক না থাকলেও হচ্ছে।···

সত্যি, এই যে ছোট্ট চালাকি, এর জন্যে কারও মনে কি কোন বেদনাবোধ হয় না? তুমি বল ভগবান।

এর আগে তোমাকে লিখেছিলাম বেলগাছিয়ার ব্রিজের ওপর আজকাল গাড়ি 'জাম' হচ্ছে হরদম, মনে পড়ে? একটা গাড়িকে ডিঙিয়ে আরেকটার আগে যাওয়ার যত তাড়া কি এই ব্রিজের ওপরেই পড়ে! যেভাবে দোতলা বাসগুলো 'রং সাইড' দিয়ে দানবের মতো গর্জে চলে তাতে আমার হামেশাই বুক ধড়ফড় করে। কয়েক বছর আগে টালা ব্রিজের ওপর থেকে একখানা দোতলা বাস ডিগবাজি খেয়ে মানুষ খুন করেছিল, এণ্টালির মুখে সি-আই-টির নূতন রাস্তায় স্পীডের মাথায়

বাঁক ঘুরতে গিয়ে একখানা স্টেট বাস উল্টে পড়ে মানুষ মেরেছিল, এই বেলগাছিয়া ব্রিজের ওপরেই একখানা মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে একখানা স্টেট বাস ষাঁড়ের লড়াই-এর মতো মুখোমুখি ধাক্কা মেরে সাবাড় হয়েছিল -সব মনে পড়ছে। আজ বিকেলে ওই ব্রিজ দিয়ে যাবার সময় দেখি একখানা বাসের ইঞ্জিন চুরমার হয়ে পড়ে আছে, স্টেট বাসের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছে -দুই ড্রাইভারই তাড়াহুড়ো করে স্বর্গে গিয়েছে।

আইন আছে, ব্রিজের ওপর পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালান চলবে না, অথচ এটা কে-ই বা মানছে! রোজই এ্যাকসিডেন্ট হবার কথা- হচ্ছে না, এটাই আশ্চর্য। আর সেই আশ্চর্য বেআইনী বেঁচে-যাওয়ার জোরেই ড্রাইভারেরা বাসের আগাপাশতলা বোঝাই যাত্রী নিয়ে সার্কাস-বাজী দেখিয়ে গাড়ি হাঁকায় র-সাইডে! অথচ একটু যদি আইন বাঁচিয়ে চলবার কথা তারা ভাবত, তাহলে ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক যাত্রীদের, এমন কি নিজেদেরও প্রাণটা বাঁচত! একথা কে তাদের বুঝিয়ে বলবে?......

আরও ছোট এক জাতের ব্যাপার, তা হল পথ-ঘাটের 'গর্তের লোহার ঢাকনি' চুরি। খবরের কাগজে ছবি বেরিয়েছে অসতর্ক পথিক গলাভর গর্তের মধ্যে পড়ে অসহায়চোখে সাহায্য চাইছে! আমি নিজেও দেখেছি এরকম অরক্ষিত গর্ত। কোথায়? কেন, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের পাশে, ফুটপাথের নীচে চৌকো একটা গর্ত, তার আধখানা এখনও পাথর চাপা অবস্থায় পড়ে আছে। এই ছিঁচকে চুরিটুকু করে করে যা সামান্য লাভ হয় তার তুলনায় পথিকের বিপদের মাত্রা অনেক বেশি। এসব চুরি ধরবে কে?

উনি গল্প করছিলেন কোন্ পাড়ায় এক কনস্টেবল নাকি ডিফেন্স পার্টির ছোকরাদের সাহায্য করবার জন্যে রাত্রে পাহারায় বেরুত-এটা তার চাকরিরই অঙ্গ। এপাশে ওপাশে চুরির উপদ্রব বেড়ে যাওয়াতেই, কিম্বা গরমে ঘুম না হওয়াতেই পাড়ার এক ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন রাত দুটোয় ডিফেন্স পার্টির কাজ দেখবার জন্যে ঘুরতে

বেরুলেন। সারা পাড়া ঘুরে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভদ্রলোক ডিফেন্স পার্টির অফিস ঘরে গেলেন। সেখানে যে দৃশ্য দেখলেন তিনি তাতে মেজাজ তাঁর বিগড়ে যাবারই কথা: পাশাপাশি শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে সবাই—মায় কনষ্টেবলটি পর্যন্ত। তিনি তাদের জাগিয়ে দিলেন আর কনষ্টেবলকে বকলেন। ব্যস, পেয়াদা বাহাদুর অমনি হুমকি দিল 'আপনি মাতাল! এখুনি আপনাকে যদি হাজতে নিয়ে যাই তাহালে মজাটা টের পাবেন।' সত্যি! ভদ্রলোক প্রথমে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, তিনি মাতাল মোটেই নন, নিরীহ মানুষ। কনষ্টেবল দাবি করল, সাক্ষী আছে? অবিশ্যি শেষে পাঁচজনের মধ্যস্থতায় ভদ্রলোক রেহাই পেলেন। মানুষ কর্তব্যে ফাঁকি দিলে সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর বিপদও আজকাল বিস্তর।

ঘুষখোরকে ঘুষ না দিলে কাজ উদ্ধার হয় না। তবে তারা ছাড়াও এক জাতের মানুষ আছে যারা ঘুষ দেওয়া বা নেওয়াকে অন্যায় মনে করে। এই জাতের মানুষ ন্যায়ের পথে চলতে গিয়েই কি কম ফ্যাসাদে পড়ছে! ঘুষখোরকে ধরিয়ে দিয়ে তার নিষ্কৃতি নেই, আদালতে হাঁটাহাঁটি কর, অপর পক্ষের উকীলের জেরা সামলাও! প্রমাণ কর যে, অতি সজ্জন ঘুষখোরকে বিপদে ফেলার কু-মতলবে তুমি ঘুষ দাও নি। এত সময় বা উৎসাহ কিম্বা অর্থ কে কোথায় পায়?

তার ফলে আমাদের এই দশা। আমরা দিন দিন পিঁপড়ে হয়ে যাচ্ছি। কোন রকমে নিজের নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই ব্যস্ত। যদি ব্যস্ত নাও হই, অশান্তির ঝামেলা এড়াবার জন্যে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি না। এ কী মনুষ্যত্ব!

কয়েকদিন ধরে তোমার ওপর খুব রাগ হয়েছিল ভগবান, অবিশ্যি রাগটা ঠিক তোমার ওপর নয়, আমাদেরই ওপর—মানে আজকের দিনের মানুষের অ-মানবোচিত আচার-আচরণের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটারই ধাক্কা তোমার গায়ে গিয়ে পড়েছিল। সে জন্যে আমি দুঃখিত।

তোমার মহাবিশ্বে কত কিছুই ত ঘটে যাচ্ছে। আমার মত সামান্য নারী তার কতটুকুই বা খবর রাখে! দুঃখ কর না।

বিনোবা ভাবে ফতেহাবাদ পৌঁছবার পর যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে তা থেকে আশ্বাস পাওয়া যায় যে, যাকে খারাপ ভাবি, যাকে আমরা অমানুষ ভাবি তার সবটুকুই হয়ত মন্দ নয়, তারও মনের মণিকোঠায় সত্য-শিব-সুন্দরের আসন আছে।

বিনোবা ভাবের উত্তরপ্রদেশে পদযাত্রা যেন মনজয়েরই শুভ যাত্রা। রামায়ণ-মহাভারতের যুগ এটা নয় কিন্তু সেই জাতেরই ঘটনা ত আজও হঠাৎ ঘটে যাচ্ছে। একটি শাজোয়ান লোক এসে বিনোবার কাছে আত্মসমর্পণ করল: সে দস্যু, তার নাম অবতার। তাকে সর্বোদয়ের কর্মীরা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে গেল। একটা স্কুলের অঙ্গনে অবতার তার জীবনের যাবতীয় অন্যায় কাজের কথা বিনোবাজীর কাছে খোলা-খুলিভাবে স্বীকার করে! তারপর বিকেলের প্রার্থনা সভাতে দেখা গেল, সে বিনোবাজীর পাশে বসে আছে। এই স্কুলটা থানার খুবই কাছে। প্রার্থনা সভাতে পুলিসের হোমরা-চোমরা অফিসারও হাজির। যাই হোক, অবতারকে দু-দিন সময় দেওয়া হয়েছে চিন্তা করবার জন্য। যদি সে বোঝে যে তার মনের গতি বদলেছে, তাহলে সে যেন স্বেচ্ছায় তার প্রাপ্য শাস্তি কারাবরণ করে নেয় অন্যথায় সে আবার তার দস্যু দলে গিয়ে জুটতে পারে!

আশ্চর্য জাদুমন্ত্র জানেন বিনোবাজী! উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চলটা ত ডাকাতদের বামরাজত্ব—এখানে আরও আশ্চর্য কোন ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া বিনোবার পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়।

এই কি কম আশ্চর্য! যে লোকটাকে ধরতে, চেষ্টা করেও পারে নি পুলিস, হিমসিম খেয়ে গেছে—সে প্রকাশ্যে বসে আছে, পুলিসও সেখানে হাজির অথচ এ পালাচ্ছে না, পুলিসও ধরছে না!

এই ত আমাদের সান্ত্বনা। এই বিশ্বাস আর কল্যাণ-বুদ্ধি তুমি ফিরিয়ে দাও মানুষকে। তাহলেই পৃথিবী মানুষের বাঁচবার মতো ঠাঁই হবে।

১৭

আরো ধুলো উড়ল, ঝড় উঠল—পথের ধুলোয় ঘরদোর চোখমুখ কিচ্ কিচ্ করতে লাগল—তারপর এল বৃষ্টি। বৃষ্টি এল, আমাদের বাড়ীর মাথায় আকাশটুকু কালো করে মেঘ ঘিরেছে। এমন দিনে নন্টু ঘরে নেই। বছরের প্রথম বৃষ্টি আনন্দে মনটা ছট্‌ফট্ করছে। বৃষ্টিতে একটু ভিজতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু তা ত চলবে না, মেয়ে দুটোর যা সর্দির ধাত, আমার দেখাদেখি ওরাও নামবে উঠোনে, আর অবেলায় ভিজে যদি জ্বর-জারি হয় ওদের তখন ত ঝক্কি পোহাতে হবে এই হতভাগীকেই। শেষে আর থাকতে না পেরে বেশ জোরে জোরেই বললাম—উঃ, যা ঘামাচি হয়েছে! বিষ্টির জলে চান করলে যদি একটু কমে!

ব্যস আর যায় কোথায়! রমার ফোঁড়া আর ক্ষমার ব্লাড প্রেশার হয়ে গেল। ওরা আমার আগেই উঠোনে লাফালাফি শুরু করে দিল।

ভাগ্যে নন্টু-বোল্টু নেই—থাকলে ওরাও ভিজত। কিন্তু পিসির বাড়িতেই কি হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে। কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। আমার ননদের বাড়ি একেবারে ট্রাম লাইনের ওপরে, সেখানে এর আগে ঝড়ে সাইনবোর্ড, করোগেট টিন কত কি-ই যে এসে পড়তে শুনেছি! যদি ওরা ছাদে থাকে আর সেই সময়ে—! না, না। মনে মনে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার নাম স্মরণ করি, পবন দেবের হাতে-পায়ে ধরে মিনতি করি—যেন তেমন কোন

বিপদাপদ না হয়। কিছুই ত বলা যায় না—এই গতবছরেই ত পুজোর কাছাকাছি হল সর্বনেশে ঝড়। তাতে একশ-দেড়শ বছরের পুরনো হাজার-হাজার গাছ মাটিতে মুখ গুঁজে উপ্‌ড়ে পড়ল—অবিশ্যি সেটা কালবৈশাখীর ঝড় ছিল না!

তবু মন মানে না। ছেলে দুটোর জন্যে ছট্‌ফটিয়ে মরি আর কি। কোন দিন ত ওরা আমাকে ছেড়ে থাকে না। বিশেষ করে নন্টুকে নিয়েই আমার ভয়—এমনি বেশ ভাল আছে ত আছে, কিন্তু একবার যদি বিগড়ে যায় তাহলে ওকে আর কেউ সামলাতে পারে না।···উনি অফিস থেকে ফিরলে আজই গিয়ে নিয়ে আসব। ভিজতে ভিজতে মেয়েরা গান জুড়েছে 'এস শ্যামছায়াঘন দিন -'। ওদের মনে এসব কোন ভাবনাই নেই, বেশ আছে!

ওরাই ভাল আছে। এই সেদিন গিয়েছিল ওদের নতুন কাকার সঙ্গে চন্দ্রহাটি। নতুন কাকা মানে আমার স্বামীর বন্ধু—অফিসে ওঁর জুনিয়র। আজকাল ত এই ধরনের আত্মীয়তাই বেশি প্রচলন হয়েছে। আগের মতো আত্মীয় বলতে সব জায়গায় রক্তের সম্পর্কই বোঝায় না, বৃত্তিগত সম্পর্ক দিয়েই যেন আজকালকার আত্মীয়তা-বন্ধন অন্তরঙ্গ হয়।

ভিজতে ভিজতে ক্ষমা বল্লল—'দিদি! সেদিনও এই রকম আঁধার করে আকাশ নেমেছিল।'

রমা হাসল—'আকাশ আবার কোথায় নামল, মেঘ ত! এত বোকা-বোকা কথা তোর!'

ক্ষমা চটে গেল—'আহা, মেঘে ত বিষ্টি হয়, সেদিন এক ফোঁটাও বিষ্টি হয় নি!'

তারপর ওদের ভিজতে ভিজতে গল্প শুরু হ'ল, চন্দ্রহাটিতে দেখা সেই পুরনো মানময়ী গার্ল'স স্কুল অভিনয়ের। ওখানে মেয়েরা থিয়েটার করেছে, মানস, রাজু, জমিদার—সব ভূমিকাতেই মেয়েরা অভিনয় করেছে। নতুন ঠাকুরপোও বলেছেন অভিনয় নাকি খুব ভাল হয়েছে।

ক্ষমা, রমা ওর বন্ধু মেয়েরা সবাই এখন বায়না ধরেছে ওরা অভিনয় করবে। ওঁকে ধরেছে ডিরেকশন দেবার জন্যে। মেয়েদের এই বয়সটাই ভাল, কোন দুশ্চিন্তা ত নেই।

উনি অফিস থেকে ফিরলেন। মুখ ভার করে। কেন? অফিসে কি কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে? না, তা নয় বৃষ্টি দেখে ওঁর মন খারাপ হয়ে গেছে। সে কি কথা, গরমের দাপটে সবাই হাঁসফাঁস করছিল বৃষ্টি হয়ে একটু ঠাণ্ডা পেয়ে মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। না, ওঁর অন্য আশঙ্কা। গত বছর বর্ষার সময় আমাদের এ পাড়াতে বাস-চলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! রোজ ওঁদের অফিস যাওয়া আর ফেরা যেন হিমালয় অভিযান পর্ব ছিল। রাস্তা-ঘাটের অবস্থা আবার যদি সেই দশায় দাঁড়ায়—আর না-দাঁড়ানর ত কোন কারণ নেই, জল নিকাশের কোন উন্নততর ব্যবস্থাই কর্পোরেশন করে নি। কর্পোরেশন খালি মেয়েলি পলিটিক্সই করুক। আর আমরা যারা নাগরিক সুখ-সুবিধের জন্যে ট্যাক্স গুণছি তারা নাকের-জলে চোখের-জলে ড্রেনের-জলে মর-মর হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচি। আহা কি চমৎকার এই নাগরিক জীবন।

ননদ এসে বললেন 'তুই ভাই-এর কীর্তিকাণ্ড সব শুনেছ?'

না, কই, সেরকরম কিছু ত শুনিনি!

আমার মাথায় এখন আগুন জ্বলছে, আকাশে বৃষ্টি নামলেও বাজারে আগুন লেগেছে পেঁপে তোমাদের ওখানে কি দর যাচ্ছে ভাই ছোট্ দি।

ননদ বললেন—'আমাদের বাড়িতে পেঁপে ভাই কেউ মুখে তোলে না। আর বল না, পটল কিনছি পাঁচ সিকে করে, বেগুন এক টাকা, মাছের যা দর হয়েছে তাতে মাংস খাওয়া ঢের ভাল মাছ কি-না সাড়ে তিন টাকা!'

—জান ত তোমার দাদার আবার পেঁপে খুব পেয়ারের। তা ভাই আজ কিনতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেলাম, বলে চোদ্দ আনা সের! কী যে হবে—

ননদ হাতমুখ নেড়ে বললেন 'তুমি আবার আজকাল এত হিসেবী হয়েছ, দেখলে আমার ভয় হয় শেষকালে না আমাদের জবির বাবা হয়ে দাঁড়াও। জবির বাবাকে তুমি ত ছাখো নি, লোকটা ইস্কুল মাষ্টারী করে এই কলকাতা শহরে দোতলা বাড়ি কিনেছিল। কি করত জানো? আলু, পটল, ঢ্যাড়শ—সব গুণে গুণে বৌকে রান্নার জন্যে দিত! হিসেবে উনিশ-বিশ হবার জো ছিল না, অঙ্কের মাষ্টার ত। কিন্তু সব করেও লোকটা ভোগ করতে পারল না, হঠাৎ হার্ট ফেল করে মরল। দাদাকে সাবধান করে দিতে হবে, এত হিসেব-হিসেব করে মাথা ঘামালে চলে? ওঠ-ওঠ চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নাও সিনেমায় যেতে হবে। উদিকে তোমার নন্দাই টিকিট কেটে নিয়ে সিনেমার গেটে প্যায়দার মতো মোতায়েন থাকবেন।'

ননদের অনুরোধ মানে হাকিমের হুকুমের চেয়েও কড়া ফারমান! অথচ এইভাবে সব ফেলে যাওয়া আমার মতো একার সংসার চলে না। সেকথা বলতে গেলেই ভীষণ অভিমান হবে। কিন্তু হঠাৎ আজই বা সিনেমার যাওয়ার বাই উঠল কেন? মনে মনে হিসেব করে দেখলাম আজ ননদের বিয়ের তারিখ। একথা ত মনে ছিল না, ওঁকেও কোন কথা বলা নেই। কি যে করি! নিজের বিয়ের তারিখই মনে থাকে না, তা অন্যের!

কি বলি, কি করি ভাবছি এমন সময় এল ধোপা-বৌ। এ বাড়িতে রাজ্যের লোকের ধোয়া কাপড়ের মোট রেখে ও এখন বাড়ি-বাড়ি কাপড় দেওয়া-নেওয়া করে বেড়াবে।

ধোপা-বৌকে দেখে ননদ প্রথমে ধমক দিলেন—আমাদের বাড়ির কাপড় কবে দেবে? ও পথ যে মাড়াচ্ছই না।

তারপর ধোপা-বৌএর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বাঁকা-চোখা ভঙ্গিতে বললেন—বলি বৌ, এ শাড়িখানা কত দিয়ে কিনেছিস্ রে!

বৌ ফ্যাকাশে মুখে চুপ করে থাকে। তারপর বলে—'আমি কি জানি যে দিদিমনি আপনি এ পাড়ায় আসবেন আজ? আমরা গরীব

মানুষ, কাপড় কিনতে পয়সা খরচ করব ত খাব কি! এ ত সবাই জানে দিদি, ধোপায় কাপড় কিনে পরলে মা-লক্ষ্মী বেজার হন।'

রমা খাতা-কলম নিয়ে কাপড়ের হিসেব লিখতে বসল। ননদ কড়া তাগাদায় আমাকে অস্থির করে তুললেন।

বিপদে পড়ে তোমায় ডাকলে কখন কখন তুমি সাড়া দাও এই-জন্যেই তোমায় এত ভালবাসি ভগবান। ননদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নন্দাই এলেন হাতে মিষ্টির বাক্সো। কি ব্যাপার? টিকিট নাস্তি, বাঁচা গেল।

তারপর নন্দাই জমিয়ে বসলেন চায়ের আবদারে! কথায় কথায় নন্টুদের ঝগড়ার ফিরিস্তি শুনি--প্রশ্ন হল 'শূয়োরের লেজ ক ইঞ্চি বল্ ত?' জবাব - 'বলব না।'.......—'বল!'......না!......বলতে হবেই হবে।........না কিছুতেই বলব না।......ফলে প্রশ্নকর্তা টেনে চড় বসিয়ে দিল। দুই ভাইতে তুমুল তাণ্ডব। নন্দাই বেশ রসিয়ে বলেন।

ওদের দুজনকে ডেকে জিগেস করতে নন্টু বল্ল 'ওঃ সে কিছু না। হয়েছিল বটে মারামারি--ওঃ কিছু না। আমরা ত স্পোর্টস্ ম্যান। মিটে গিয়েছে।'

—ও তাই বল, সেইজন্য মুখখানা দাগে দাগে বোঝাই।

ননদের বিয়ের জন্মদিন এইভাবেই উদ্‌যাপন করলাম আমরা সবাই মিলে। আমার স্বামী বললেন জুবিলিটা করে তোমরা থেমো, নইলে ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করবে যে!

নন্দাই বললেন- ওদের ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছি! লাভ্ ইজ ইম্‌মর্টাল!

আজ সকালে উনি হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন—'তোমরা এই রকম কিছু একটা করতে পার না?'

—কি রকম?

—'এই যে তোমার দীঘার চর্ম-শিল্পীরা যে রকম কোঅপারেটিভ করেছে! জানো, ওরা এত গরীব যে পুঁজির অভাবে কাজ-কারবার বন্ধ,

না খেতে পেয়ে মরবার দাখিল। তা কোঅপারেটিভ করল, সরকারী সাহায্য পেয়ে ওদের কাজও আগের চেয়ে ভাল হয়েছে আর ব্যবসাও বেশ জমে উঠেছে!'

—আমি তাহলে তোমার হাঁড়ি-হেঁসেল ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি, কি বল?

কথাটা বলবার সময় একটু চড়া সুরেই বলে ফেল্লাম। তারপর বলি—খবরের কাগজ মুখে নিয়ে রাজ্যের সমস্যায় সময় খরচ না করে ছেলেমেয়েদের একটু ভ্যাখো না। ওরা ত গরমের ছুটি পড়ে ইস্তক মা সরস্বতীর সঙ্গে আড়ি করেছে।

আকাশে মেঘের দিকে চেয়ে উনি বললেন—'আরে বাবা একটু ফাঁকি দিতে দাও, তাতে কিছু এসে যাবে না। হ্যাঁ গো, শোন—'

শুনতে ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, ডাল নামিয়ে তরকারী চড়াতে হবে। এই 'শোনো' ডাকের অর্থ আমার জানা আছে—চা চাই।

রান্না ঘর থেকে সাড়া দিলাম—বলতে হয় এখানে এসে বল।

উনি উঠে এলেন, তারপর আর একটা খবর দিলেন—'জানো, বাঁকুড়া দামোদর লাইনের ট্রেণ বন্ধ হয়ে গেছে!'

—তাই নাকি? এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বুঝি?

'না, না রেল-কর্মচারীদের সব অসুখ বিসুখ করেছে তাই ট্রেণ বন্ধ! আবার অসুখ সারলে পরে ট্রেণ চলবে।'

—বাঃ, তাহলে যাত্রীরা এখন আসা যাওয়া করবে কেমন ভাবে?

'তা ত জানি না। হ্যাঁ গো তোমার উনুনে এখন কি?'

—দাঁড়াও হিটারে তোমার চায়ের জল বসিয়ে দিচ্ছি।

উনি খুশি হলেন 'সেই ভাল! এমনি করেই মানুষের হৃদয় পরিবর্তন ঘটে!'

—মানে?

'মানে কিছুই নয়। এই ভ্যাখো না করণ সিং, বদন সিং, রামদয়ালের মতো বাঘা-বাঘা ডাকাত বিনোবা ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ

করছে, ডাকাতী তারা করবে না! লুকার মতো দুধর্ষ দস্যু তার অস্ত্রশস্ত্র সব জমা দিয়ে বলেছে এ এক নতুন জীবন।'

—তোমার কথা শুনে আমার গা জুড়িয়ে গেল। তুমি কিনা সামান্য চায়ের জন্যে আমাকে এতবড় অপবাদ দিলে।

উনি হাসলেন—'আরে বাবা এক কাপ চা যা কি-না ছটা পয়সা ফেললেই দোকানে মেলে তার জন্যে হাজার কথা খরচ! আর বাছা-বাছা খবরগুলো বিনা পয়সায় রেডিওর 'খবর বলছি'র মতো গড়-গড়িয়ে বলে যাওয়া! উঃ—'

চায়ের ধূমায়িত পাত্র হাতে নিয়ে উনি বললেন—'আরো একটা খবর শোন—'

—থাক।

—'না গো, এটা পুরস্কার; উপহার যা বল। খবরটা তোমার মনে আনন্দ দেবে। এই আমাদের পাড়ায় কলের জল নিয়ে কতো মারামারি হতো'

—এখন তা হয় না। এখন অজস্র জল—উপ্‌ছে পড়ে যায়।

—'আরে হাঁ, সেই কলের জল নিয়ে পুলিসে-পুলিসে আপোসে এ্যায়সা মারপিট হয়েছে যে ছ-টা পুলিসকে হাসপাতালে দিতে হয়েছে।'

—কোন্ পাড়ায় গো?

—'নাগপুরে।'

—বাঁচালে, কলকাতায় নয় ত!

পুলিসে-পুলিসে মারামারি এমন অনর্থ কাণ্ড আর কোথাও কেউ শুনেছে কি? পুলিস হল আইনরক্ষক। শুধু মারামারিই নয়, এই কয়েকদিন আগেও খবরের কাগজে দেখেছি কনস্টেবলকে চুরির অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর কি শান্তিরক্ষার জন্য গুণ্ডাদের ডাকা হবে? কোথায় চলেছি আমরা।

১৮

দুপুরে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বাদলার জলো হাওয়া লেগে দুচোখের পাতা বুজে গিয়েছে সে-খবর পাইনি। এই হাওয়াতে বুঝি নেশার আমেজ মাখান থাকে, নইলে নণ্টু বোল্টুই বা ঘুমিয়ে পড়বে কেন।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমিও, কিন্তু সেটা টেরও পাইনি। চোখের সামনে সুন্দর স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় বিরস মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, দেখেই চিনেছি—বাগবাজারের গৌরীবাবু। ওঁকে আর চিনব না! কিন্তু গৌরীবাবুর মতো পণ্ডিত, মানী মানুষকে হঠাৎ এভাবে পথে দেখতে পাব আশাই করি নি। ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই উনি আশীর্বাদ করে বললেন—'কি খবর মা?'

—আপনি এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে যে?

'আর মা, দিন দিন আমরা যে কোথায় চলেছি সেটাই বুঝতে পারছি না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। জান মা, সেবার যখন আমার কলেজে গোলমাল করল ছেলেরা—তখন তাদের খুব কড়াভাবে শাসন করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ছেলেরা সব ছেলেমানুষ ওদের সামনে ভবিষ্যৎ রয়েছে। ওরা সেই ভবিষ্যতের ভিত তৈরীর জন্যে লেখাপড়া শিখতে এসেছে। শিক্ষার বনেদটা কেমন মজুত হল, সেটা বুঝে দেখার জন্যেই ত এই পরীক্ষার ব্যবস্থা। ওরা যে হৈ-চৈ করছে পরীক্ষা দেবে না বলে—এটা অন্যায় করছে, এটা ভুল করছে। তা সেটা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সেই ভেবেই

ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বোঝাতে চাইলাম। তা মা তারা গ্রাহ্যই করলে না, আমাকেও তাদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হল। অবিশ্যি সব ছেলেই এরকম নয়।···আমার মনে সেই থেকে একটা ধোঁকা লেগেছিল —কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, শিক্ষার ভেতরে, নির্ঘাত কিছু গলদ হচ্ছে। বুঝলে মা, আবার কাল এই বি. কম. পরীক্ষার ব্যাপারে যে কাণ্ডটা হল···কাণ্ড ত নয় তাণ্ডব! এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে যাঁরা কলেজে পড়াবেন তাঁদের মিলিটারী ট্রেনিং থাকা দরকার, গালিগালাজ মারধর হজম করার অসামান্য পটুত্ব থাকা প্রয়োজন—নতুবা শিক্ষাবিভাগের কাজে ইস্তফা দিয়ে বিনোবার অনুগামী হয়ে পদযাত্রায় যোগ দেওয়া ঢের ভাল। বিনোবাজীর জীবন-মন্ত্রে কী এমন যাদু আছে, যার বলে তিনি দুর্ধর্ষ, খুনী ডাকাতদের মনের মধ্যে আত্মসমর্পণের অসামান্য মানসিকতা এনে দিতে পারছেন! আর এই আমরা, যারা শিক্ষা দেবার ব্রত নিয়েছি বলে মনে করি, তাঁদের হাতে ভাল ভাল, ভদ্রবংশের শান্ত নিরীহ ছেলেরা গুণ্ডামীতে শিক্ষিত হচ্ছে! কী অভিশাপ যে আমাদের অস্তিত্বকে বিকারগ্রস্ত করছে, বুঝে উঠতে পারছি না-মা!'···আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখি, কই আমার সামনে ত কেউ নেই! ওঃ, এই যে হ্যাঁ, খবরের কাগজে পরীক্ষার্থীদের উদ্ধত উল্লাসের দাপটে অন্য দিকে মুখ ফেরান গৌরীনাথ শাস্ত্রী মশায়ের ছবি ছাপা রয়েছে।···

রবিবার সকালে যদি উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তাহলে আমার অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়ে। ওঁর বন্ধু-বান্ধবরা আসেন একটু আড্ডার মুডে। উনি না থাকলেও বসতে বলতে হয়, শোভনতার খাতিরে। আর, কোন ভদ্রলোক ঘরে বসে আছেন মুখ বুজে একা-একা সেটাও ভাল দেখায় না। অতএব এক দিকে রান্নাঘর আর একদিকে বৈঠকখানা দু-ই সামলাতে গিয়ে প্রাণান্তকর অবস্থা দাঁড়ায়

চা-টা পানটা, দু-টো কুশল আদান প্রদান এমনি করে কাজও এগোয় না অথচ বেলা গড়িয়ে যায়।

আজ উনি ফিরলেন বেলা একটা বাজিয়ে। ওঁর সঙ্গে আবার ওঁর বন্ধু। ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে, মানে সেই বিয়ের সম্বন্ধ করতেই দুই বন্ধু বেরিয়েছিলেন। এখন শুরু হল পরামর্শ। উনি ত আমাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বন্ধুকে বললেন—'এসব বৈষয়িক ব্যাপারে বাসবীর পরামর্শ নেওয়াই ভাল। মেয়েরা মেয়েদের সাইকোলজি বুঝবে ভাল।'

ব্যাপারটা মোটামুটি এই: ছেলেটি এম. এ. পাশ করেছে, স্কুলের মাস্টার। তবে ছেলের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। পাড়াগাঁয়ের দেশের ভদ্রাসন বলতে টিনের একটা আস্তানা। পৈতৃক পেশা হল প্রেসের কম্পোজিটারী, কাজেই ছেলেবেলা থেকেই পাত্রকে নিজের চেষ্টায় কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। কখনোই বাড়ির কোন সাহায্য সে পায় নি।

এসব শোনার পর জিগ্যেস করলাম -ছেলেটি দেখতে কেমন?

'রং ময়লা, স্বাস্থ্য ভাল! এখন সমস্যা হচ্ছে এই যে, এরকম ঘরে মেয়ে দেওয়া চলে কি?'

আমি বললাম—আপনাদের ত অবস্থা ভাল।

'হ্যাঁ, মোটামুটি। মেয়ের বিয়েতে ফাঁকিও দেবো না। তবে আমার বাড়ির ওদের আপত্তি এই যে, ছেলের অবস্থা তেমন নয়। এসো-জন বসো-জনের জায়গা নেই। যাকে বলে চাল-চুলো না থাকা গোছের—!'

আমি বললাম—দেখুন, যা দিনকাল পড়েছে তাতে সবাইকেই খেটেখুটে খেতে হবে। আর যে ছেলে শুধু নিজের মনের জোরে এম. এ. পর্যন্ত পাস করেছে, তা ছাড়া শিক্ষার লাইনেই রয়েছে সে ছেলের দায়িত্ববোধ ত সামান্য নয়। চাল-চুলো এই আমাদের ওঁরও না-থাকার মতোই ছিল এখনো নেই, তার জন্যে ত আমাদের বেঁচে থাকা আটকে নেই। বরং বলা যায় যে মোটামুটি সুখেই আছি আমরা। আপনি

আর কিছু করবেন না! বড়লোকের ছেলে দেখে বিয়ে দিলেই যে মেয়ে সুখী হবে একথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু আপনার এই যে পাত্র এর হাতে পড়লে আপনার নাতি-নাতনী অন্তত না খেয়ে মরবে না, মূর্খও হবে না। মোটামুটি মানুষ হবে তারা।

ওঁর বন্ধু তখন বড়ঘরের গরীব হয়ে যাওয়ার অনেক নজীর হাজির করলেন।

ওঠবার সময় বললেন—'সেই ভাল। এখানেই কথা পাকাপাকি করে ফেলা যাক। বিয়েতে কিন্তু আপনাদের সবাইকে যেতে হবে।'

আজ হঠাৎ দহননগরের চিঠি এল। তাতে এ কি সাংঘাতিক খবর! ওঁর সেই ভাই, যার গায়ে প্রায় অসুরের মত শক্তি, তাঁকে কে অচমকা ছোরা মেরেছে। আমার জা-এর এয়োতীর খুব জোর তাই ভদ্রলোক প্রাণে বেঁচে রয়েছেন। তবে এখনো হাসপাতালে রেখেছে ওঁকে।

চিঠিখানা পড়ে উনি আফশোস করতে লাগলেন। কলকারখানা অঞ্চলের সর্বত্রই নাকি এই ধরনের খুন-জখম হামেশা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে মানুষকে খুন করতে মানুষের হাত নাকি একটুও কাঁপে না। কাঁপে না তার কারণ, ওসব জায়গায় এক ধরনের মানুষ আছে যাদের কাজই হল অপরের হয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। এরা এই কাজে ভাড়া খাটে—এবং সেকথা দাপটের সঙ্গে জাহির করে বেড়ায়।

শুধু দহননগরের কথাই বা বলি কেন, এজাতের ঘটনা ত কলকাতার বুকের ওপরও দেখা যাচ্ছে। দিনের বেলায়, সবার চোখের ওপর কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, তারপর ছুরি মেরে পালানো! মানুষের মর্যাদাটুকুই ওরা ভুলতে বসেছে। এরা বোধ হয় মৃত্যুর গুরুত্বটুকু তলিয়ে ভাবে না। যে মরে সে ত মরেই গেল, কিন্তু মৃতের পরিবারের দুর্গতির কথাটা কি ওরা ভাবে!

ওদিকে সভ্যতার লক্ষণ যতই বিজ্ঞানের দৌলতে প্রকট হোক না

কেন, মানুষের মনটাই যদি অসভ্যতার দিকে ঢলে পড়ে তাহলে তাদের সৌধ আর কদিনই বা খাড়া থাকবে!

অন্যায়কে অন্যায় বলেছ কি মরেছ তুমি।

হয় হজম কর মুখ বুজে, না হলে তোমার টুঁটিকে চুপ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা হবে! এঁরই নাম বুঝি যন্ত্র সভ্যতা!

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছ! আগেকার কালের কথা জানি না, তবে এ যুগের মানুষ পৃথিবী ছাড়িয়ে যাবার জন্যে প্রতি নিয়ত চেষ্টা করছে। কেন করছে তা তারাই জানে! হয়তো মানুষ অমর হতে চায়, সেই অমৃতের সন্ধানে ত্বনিয়া তছনচ করে খুঁজে না পেয়ে, অন্য কোন পৃথিবীতে ছুটোছুটি করছে। রকেট, স্পুটনিকে দেবলোকে দূত পাঠাচ্ছে, মানবদূত যাচ্ছে কিন্তু আবার ফিরে ফিরে আসছে এই পৃথিবীর নাড়ির টানে। পায়ে হেঁটে, হাঁটুর জোরে যে মানবদূত হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়াতে উঠেছিলেন—তাঁরা তুজনেই ফিরে এসে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছেন। তাঁদের মনের গড়নটা কেমন তা আমি জানি না। তবে এই বোধ হয় হবে যে, মানুষের কাছে অগম্য বলে কিছু থাকাটা মানুষ বরদাস্ত করতে চায় না —মানুষ চায় না অন্যের ঔদ্ধত্য। আর সেই সঙ্গে আছে মানুষের নিজের বাহাতুরী জাহির করারও তুর্দম নেশা। তাকে সব সময়ই ব্যস্ত রাখে। হ্যাঁ, তা বই কি। এই যে আমি—আমার ছোট সংসারের ক্ষমতা, সব অন্তর ঢেলে দিই তার পিছনেও এই বাহাতুরী পাওয়ার একটা লোভ আছে বই কি। তবে সেটা কেউ স্বীকার করে, কেউ বা সেটা নিজের কাছেও লুকিয়ে রাখে।

সুইডেনের অভিযাত্রীরা ধবলগিরির শিখর চূড়ায় মানুষের প্রথম পদচিহ্ন আঁকল, কিম্বা এভারেষ্টের মাথায় দ্বিতীয় দফায় চীনেরা মানুষের দ্বিতীয় পতাকা ওড়ালো এ সবই ত ওই বাহাতুরীর কথা। ভারতবর্ষের অভিযাত্রীরা এ যাত্রায় নেমে আসতে বাধ্য হল বলে মন খারাপ

আমারই কি কম হল ? এই মন খারাপের মূলে আছে মানুষের আপন দেশকে বড়ো করে দেখার ইচ্ছের ব্যর্থতা। নইলে চীনেরাও মানুষ, ভারতবাসীরাও মানুষ। চীনেরা উঠেছে সেও ত মানুষেরই জয়তিলক ! তা যেমন সত্যি, তেমনি তা সত্যি হয়েও সত্যি নয়। এই সত্যি-নয় অংশটাকে আমরা কম দাম দিই নে। যেমন পাড়ার নিতাইবাবুর ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে খুশি হওয়ার চেয়ে বাড়ির নন্টু ফাস্ট হওয়ার খুশিটা আরো বেশি সত্যি—এও তেমনি। আমরা বড়-আমির চেয়ে ছোটো-আমিকে বড় বেশি ভালবাসি। এই ছোট ভালবাসাটুকুর জন্যেই আমাদের এত বেশি মাতামাতি, তাই না ভগবান ? বড়দের বড় আশা, বিরাট সাফল্য, বিশ্বপ্রেম এ সব কথা আমি আমার এই ছোট মন দিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে। তাই আমার কাছে ধবলগিরি বিজয়ের চেয়ে অনেক বেশি তাজ্জব লাগে যখন দেখি আমাদের এই পাড়াতে একটা মানুষ এক নাগাড়ে একশ ঘণ্টার ওপর সাইকেল চালাচ্ছে। এই লোকটা সাইকেলের ওপর পিকক্ হচ্ছে, আর্চ হচ্ছে, পঞ্চাশ ফুট আগুনের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে—আর তাই দেখবার জন্যে ছেলে-বুড়ো সবাই ভিড় করছে—কেউ তাকে টাকার মালা দিচ্ছে, কেউ বা সোনার মেডেল দিল, কেউ বায়না করে গেল অন্য পাড়ায় খেলা দেখাবার জন্যে। এই যে কাছাকাছির ব্যাপার এটা সহজে ধরতে পারি বলেই সহজে ভাল লাগে। আচ্ছা, একে তুমি কি বলবে ভগবান ! একে তুমি কি ক্ষুদ্রতা বলে উড়িয়ে দেবে নাকি ?

নন্টু-বোল্টুর চোখে ত ও সাইকেল-চালিয়ে লোকটার মতো অসামান্য মহাপুরুষ। এই কদিন আর কেউ নেই। আমিও খুব তারিফ দিই লোকটাকে। কিন্তু আমার স্বামী হেসে ঠোঁট উল্টোলেন। ওঁর মতে এ-সবই হল স্থূল, যান্ত্রিক কৌশল। মনের দিক দিয়ে যদি মানুষ উন্নতি করতে না পারে তাহলে, এ জাতের বাহাদুরী দিয়ে দুনিয়ার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। সেই যে তান্ত্রিকের গল্প আছে না, কোন এক সন্ন্যাসী মন্ত্রবলে নদীর জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে, সবাই বলল

তাকে সিদ্ধপুরুষ! কিন্তু একজন বললেন, ও ত ছু-পয়সার সিদ্ধি। ছুটো পয়সা দিলেই ত নদীটা নৌকোয় করে পার হতে পারে সবাই। এর চেয়ে ঢের দামী সিদ্ধি আছে সে হল সংসার সাগর পার হওয়ার ক্ষমতা! জানো, এই যে আমি রোজ চাকরি করছি, এই যে তুমি রান্নাবান্না করছ, এই যে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে আমরা চেষ্টা করছি এর বাহাতুরী অনেক বেশি। তা সে কেউ মালা দিক আর না-ই দিক। অবিশ্যি ওরা মানুষ হয়ে চিরকালের খাতায় অনেক রেখার মধ্যে আমরা ছুটি রেখা হয়ে যদি বেঁচে থাকি তা-ই ঢের।

ওঁর কথা আমি ধরতে পারলাম না ভগবান। তুমি যদি একটু বুঝিয়ে দাও মানে বোঝবার মতো বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য কর তাহলে বড় ভাল হয়।

তোমার কাছে বিচারের জন্যে কান্নাকাটি করতেও যেন আর রুচি নেই -নেহাৎ তুমি ভগবান তাই 'ঘেন্না করে' কথাটা মুখে আটকে যাচ্ছে, নইলে তাই বলতাম। মুক্তিবাবুর জীবনটা এইভাবে হঠাৎ মাঝপথে নিবিয়ে দেওয়ার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখাতে পারো? অমন চমৎকার স্বভাবের মানুষ আমি খুব বেশি দেখি নি! মুক্তিবাবু আমার স্বামীর খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কতবার এ বাড়িতে এসেছেন। ছুজনে গল্প করতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মুক্তিবাবু গল্প লিখতেন। এই ত গত শনিবারও বিকেলে এলেন, প্রবাসীতে মুক্তির যে গল্পটা ছাপা হয়েছে সেটা পড়ে শোনালেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'কাল মঞ্জুকে নিয়ে বিকেলের দিকে আসতে পারি।' মঞ্জু হল মুক্তির স্ত্রী। মঞ্জুকে ওদের বিয়ের আগে থেকেই চিনি। জবার সঙ্গে বরাবর এক সঙ্গে পড়েছে মঞ্জু। এম. এ. পাস করে মঞ্জু কলেজের প্রফেসর হল, আসানসোল কলেজে ও পড়াতো। তারপর মুক্তির সঙ্গে বিয়ে হল, কতদিনই বা ওদের বিয়ে হয়েছে? বছর দেড়েক! বিয়ের কিছুদিন পরে মঞ্জু কলকাতার কলেজে কাজ নিয়ে চলে এল। ওদের ছুজনের সুন্দর ব্যবহার দেখে উনি বলতেন, 'এই হল আধুনিক যুগের আদর্শ জীবন। ফ্যাশনের

মার-প্যাঁচ ওদের স্পর্শও করে নি—ওরা অত্যন্ত সাধারণভাবেই মেলামেশা করত, সকলকে ওদের অমায়িক আর আন্তরিক ব্যবহারে আপন করে নিতে পারত। ওঁর কাছে শুনেছি, মুক্তিও আগে কলেজের প্রফেসর ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারের পুরো দায়িত্ব হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়াতে মুক্তি শিক্ষকতা ছেড়ে বেশি রোজগারের জন্য ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি নিলেন। অনেক হিসেব করে চলতে হত তাঁকে। ভাইবোনদের মানুষ করা থেকে শুরু করে সবকিছুই তাঁর একার ঘাড়ে। তার জন্য কিন্তু কোন ক্লিষ্টতার চিহ্ন দেখতে পেত না কেউ। সব দিক খানিকটা সামলে বিয়ে করলেন বত্রিশের কোঠায়। কিন্তু সুখ বোধ হয় তাঁর কপালে নিরঙ্কুশ হবার নয়, তাই মঞ্জুর ভারি অসুখ করল। মুক্তি একদিন শুধু বলছিলেন--'এই অসুখটা যদি ওর না হয়ে আমার হত!' মঞ্জু বলেছিল 'অসুখটা যদি আমার বিয়ের আগে হত, তাহলে তোমার কপালে এত দুর্ভোগ হত না --আর আমারও মরতে কষ্ট হত না। এখন এ এক জ্বালা হয়েছে -মরতে পারলে ভাল হয় অথচ বাঁচতে ইচ্ছে করে এতো- !'

মুক্তির চেষ্টায় এবং আর সকলের ইচ্ছায় মঞ্জু সুস্থ হয়ে উঠল। ততদিনে মঞ্জুর কলেজের চাকরি চলে গেছে। তা যাক! মুক্তি বললেন -'ওর আর চাকরি করে দরকার নেই। আবার বেশি স্ট্রেন হলে যদি অসুখ করে তাহলে কি দশাটা হবে ভাবুন বৌদি।'

কিন্তু মুক্তির যে স্বস্তি নেই। ওর অসুখের দরুন সংসারের ওপর অনেক ধকল গিয়েছে, এখন ও সেরে উঠেছে, অতএব ওর বসে থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে সংসারে যখন টাকার দরকার তখন সুস্থ মানুষ কি হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে পারে? মঞ্জু ইতিহাসের অধ্যাপিকা। ঘরে বসেই ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার খাতা দেখল। চাকরির জন্যও চেষ্টা-চরিত্র করতে লাগল। না করে উপায় কি, মুক্তিবাবু যতটা পারেন ব্যয় সঙ্কোচ করে চলেন --আর সেই মিতব্যয়িতার সবটুকুই নিজের ওপর। নিজের খরচ ত ভারি, এক পান

খাওয়া, বেশবাসে সঙ্কোচের অবকাশ ছিল না। ইদানীং নাকি টিফিনটুকুও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মাসখানেক আগে মঞ্জু আমাদের বাড়ি এসেছিল, সেদিন ওর মুখে এসব শুনে আমি ওঁকে বলেছিলাম- হ্যাঁ গো, ছাখো না চেষ্টা করে মেয়েটাকে যদি কোন কলেজে ঢোকাতে পারো---তোমার ত অনেক চেনাশুনো।'

উনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন 'সে কি আর তোমার বলার অপেক্ষায় আমি বসে আছি! কিন্তু যে যুগ পড়েছে তাতে কেউ কাউকে পাত্তা দেয় না। অথচ মঞ্জুর এক্সপিরিয়েন্স আছে, হয়ে যাওয়া ত খুবই উচিত। তবে দেখা যাক সামনে ত নতুন সেশন শুরু হচ্ছে।'

এর মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাত!

মঙ্গলবার উনি ফিরলেন রাত দশটা বাজিয়ে, মুখচোখ কাল করে। বললেন- 'মুক্তিবাবুকে মাঝের আট ব্রিজের তলায় আজ সকালে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে। মাথায় কেউ ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছে---'

এই পর্যন্ত বলে উনি থমকে তাকালেন।

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল' না, কিন্তু আমার স্বামী বলছেন বলেই অবিশ্বাস করতে পারি নি। বাঙ্গুর হাসপাতালে উনি গিয়ে দেখে এসেছেন। হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেছেন--'এর চেয়েও খারাপ অবস্থা থেকে অনেকে বেঁচেছে, তবে ভেতরের অবস্থা ত বুঝতে পারছি না এখনো। সারারাত ধরে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা! এসব কেসে লাইফের কথা বলা যায় না। কন্‌ডিশন মোটেই ভাল নয়।'

কে এই সর্বনাশ করল? কেন!

শনিবার যখন 'দহননগরের ঠাকুরপোকে' ছোরামারার খবরটা দিলাম তখন মুক্তিবাবু আক্ষেপ করে বলেছিলেন -'তাহলে সে সব জায়গায় চাকরি করাও ত বিপদ। তখন কি কেউ কল্পনা করেছিল যে নিরাপত্তার খাসতালুক বাংলা দেশের রাজধানী কলকাতা শহরের বুকেও শয়তানের ক্ষমতা কিছু কম নয়। সেদিন সারারাত উনি ছাদে

শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করেছেন। ভোর হতে না হতে টেলিফোন করেছেন হাসপাতালে। সকালবেলায় মুক্তি সেন জীবন সংগ্রাম থেকে অবসর নিয়েছেন।

এই যে মৃত্যু এর জন্যে কাকে দায়ী করব বলো ত ভগবান! আইন, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা—সবকিছু অগ্রাহ্য করে সবাইয়ের চোখে ধূলো দিয়ে যারা আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাদের শায়েস্তা করার কোন উপায়ই কি নেই।

শুনেছি যে আজকাল যেসব ধনী বা নেতা বা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি যতো বেশি গুণ্ডা-বদমায়েসদের সঙ্গে ভাব-খাতির বজায় রেখে চলতে পারেন তিনিই ততো বড় লোক।

উনি বলছিলেন, আজকাল অপরাধের সংখ্যা নাকি এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যে পুলিসের পক্ষে সবগুলো সমানভাবে খুঁটিয়ে অনুসন্ধানই করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া অনেক দাগী বদমায়েসকে বাঁচাবার পিছনে বড়লোকেদের ম্যাজিক কলকাঠির মতো কাজ করে।

তাহলে কি তোমার এই ইচ্ছে যে, কেবল বড়লোক আর তাদের প্রসাদপুষ্ট ছোটলোক ছাড়া আর কোন মানুষের ঠাঁই তোমার দুনিয়ায় থাকবে না। মাঝারি লোক, ভাল লোক, এদের কি দশা হচ্ছে দিন দিন একবার তলিয়ে দেখো! তোমাকে আর কতো বলব? পুলিসের বড়কর্তাদের সঙ্গে যদি দেখা হত তাহলে নিশ্চয় বলতাম যে, ফুটপাতের নিরীহ হকারদের পিছনে সময় নষ্ট না করে এইসব খুন-রাহাজানীর তদন্তগুলো যাতে নিখুঁত হয় সেদিকে কড়া নজর দিন, দোহাই আপনাদের। মুক্তি সেনকে যে বা যারা মেরেছে তারা মনুষ্য সভ্যতার চরম অবমাননা করেছে। আপনারা সেই মানুষ জাতের মান রক্ষার জন্য খুনীকে খুঁজে বার করুন। তার বিচার হোক। আর দশটা কাপুরুষ খুনী-মনোভাবাপন্ন মানুষের চামড়া গায়ে আঁটা অমানুষ সেই বিচার দেখে সাবধান হয়ে চলুক—এমনটা কি কোন মতে করা যায় না?

মহাপ্রলয় কি বস্তু তা জানি না কিন্তু আমরা যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছি তা থেকে বেশ টের পাচ্ছি যেন ওইদিকেই আমাদের গতি। খুব তাড়াতাড়িই চলেছি আমরা। সভ্যতার ভাগ্যনিয়ন্তা, দুনিয়ার দুই মালিক আইজেনহাওয়ার আর ক্রুশ্চেভ যদি একদিন এই পৃথিবী থেকে মানুষ নামক প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে দেন তাহলে অবিশ্যি আর কোন ল্যাঠাই থাকে না। কিন্তু সেটা যদি নাও হয় তাহলে মানুষ যে কিভাবে বাঁচবে তাও বলা শক্ত। পেটের দায়ে বেঁচে থাকার জন্যে এর আগে অনেকে হাসপাতালে গিয়ে গায়ের রক্ত বিক্রী করত শুনেছি। কিন্তু আজ আবার দেখলাম গায়ের চামড়া কেটে বিক্রী করছে মানুষ। কেন? টাকার দরকার। টাকা কেন? বাঁচতে হবে ত! বাঁচতে গেলে খেতে হবে। বিনা পয়সায় খাদ্য পাওয়া যায় না—টাকা লাগে। রক্ত, মাংস বেচে দিয়ে কি নিয়ে মানুষ বাঁচবে!

তোমার মনে আছে কি না জানি না, গোবিন্দবাবুর ছেলের ডিপ্থিরিয়া হয়ে মাস দুই আগে খুব টাল্‌মাটাল গেল! ছেলেটা সেরে উঠেছে এখন। বেলেঘাটার হাসপাতালে যে নার্সের সেবায় ছেলেটা বাঁচল তিনি মমতাময়ী। ইছাপুর-শ্যামনগরের কাছাকাছি গাঁয়ের উদ্বাস্তু কলোনীতে তাঁর মাথা-গোঁজার আস্তানা। কিন্তু সেখানে থাকলে ত পেট চলে না—কলকাতার এক হোস্টেলে থেকে ভদ্রমহিলা নার্সের কাজ করেন। ওই বেলেঘাটার হাসপাতালে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের নার্সিং করেই যৎকিঞ্চিৎ পেয়ে থাকেন। তা দিয়ে ছেলের লেখাপড়ার খরচ, নিজের খরচ চলা খুব শক্ত। ঠিকের কাজ সব সময় থাকেও না।

ভাবছো, এত কথা জানলাম কি করে। আরে সেদিন যে উনি এসেছিলেন গোবিন্দবাবুদের বাড়ি, রোগমুক্ত ছেলেটাকে দেখবার জন্যে নিজের বাগানের একটি মাত্র গাছের চারটি আম হাতে নিয়ে দেখতে এসে ভদ্রমহিলা মরণাপন্ন অসুখে পড়লেন। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল বমি,

পায়খানা, জ্বর। গোবিন্দদের বাড়ির সবারই মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করে বিপদের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে সেবাশ্রমে (মানে সেই হোস্টেল যেখানে নার্সেরা খরচপত্র দিয়ে বাস করেন) খবর দেওয়া হল। কিন্তু সেখানকার অভিভাবকেরা গা ঢিলে দিয়ে বসে রইলেন। গোবিন্দবাবুদের ছোট বাড়ি, ঘরদোরের অসুবিধে, তাছাড়া রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষা করার মতো লোকও তেমন নেই। চেষ্টা-চরিত্র করেও হাসপাতালের তরফ থেকে কোন সহায়তা পাওয়া গেল না। অবশেষে কয়েকদিন পরে নার্সকে গাড়ি করে তাঁর গাঁয়ের আস্তানাতেই নিয়ে না গিয়ে উপায় রইল না।

যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের বিপদে সাহায্য করে তাদের বিপদে কেউ নেই দেখবার ?

ভ্যাপসা গুমোট আর মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের শ্বাসরোধকারী অবস্থার কথা তুমি কি একটুও ভাবো না ভগবান! সবটুকু ভাবনাই কি মেয়েদের ভাবতে হবে! তুমিও কি আমাদের দেশের সরকারের মতো কালা আর অন্ধ ?

ফি-বছর আমের সময় ওঁকে নিয়ে মহামুস্কিলে পড়তে হয়। পাঁচটা ছেলে-পুলের ঘর, সেখানে কি নিত্যি ল্যাংড়া, বোম্বাই, হিমসাগর আম কিনে পোষানো যায়! অথচ এ সময়ে এক-আধটা আম ছেলেমেয়েরা হাতে পেলে কী খুশিই না হয়। আজও সকালে দু-দুটো ফেরিওয়ালাকে ফিরিয়ে দিতে হল সে ত ওঁর জন্যেই। আমওয়ালা বললে—ফজলী এনেছি মা!

উনি খবরের কাগজ ফেলে রেখে বেরুলেন—'কই দেখি! আরে এ ফজলী নয়, এ যে ফাজিল। এ চলবে না।'

আর একজনকে তাড়ালেন, সে এনেছিল—'ল্যাংড়া।' উনি দেখেশুনে বললেন—'যাঃ, আসলে এগুলো বামুনগাছির 'খোঁড়া' আম। ল্যাংড়া হলে তার চেহারাই আলাদা হত।'

ওঁর সব ব্যাপারেই খুঁতখুঁতে ভাব। আর আমের বেলায় ত কথাই নেই। কবে ওঁর ছেলেবেলাতে মুর্শিদাবাদে রইসমির্জার বাগানের কোহিতুর, মোলায়েম জাম, সাদৌলা খেয়েছেন। কোন্ যোগেশবাবুর বাগানের বড় সিঁদুরে বড়শাহী, রাণীপসন্দ, বিমলী খেয়ে খেয়ে মুখের তার করে রেখেছেন তার ধাক্কা এখন আমাকে সামলাতে হবে। কথাটা মিথ্যে নয়, সেদিন ডিমওয়ালা (এখন সে আম বিক্রী করে বলেই পাড়াতে সে আমওয়ালা বনে গেছে) সস্তায় দু-টাকার বোম্বাই আম দিয়ে গিয়েছিল। ওঁকে দিতে, এক টুকরো মুখে ফেলে বাকীটা সরিয়ে রেখে বললেন—এর সাতপুরুষে কেউ বোম্বাই ছাখে নি, পাটনাইও নয় -এ হল আঁটির বুনো আম।

উনি খেতে পারেন না বলে কেবল ছেলেমেয়ের জন্যে কি করে আজেবাজে আম কিনি। আর ভাল আম ত টাকায় চার-পাঁচটার বেশি মেলে না। আমি যদি বা সস্তার আম কিনতে যাই, নণ্টু-বোল্টু

কিছুতেই তা কিনতে দেয় না। বলে —বাবুজী যদি না খান, তাহলে তুমিও তো খাবে না মা! শুধু শুধু আমাদের জন্যে কেন কিনবে? তার চেয়ে অনেকদিন পরে পরে একদিন ভাল আমই কিনো যা বাবুজী খাবেন, আমরা সবাই একসঙ্গে খাবো।

এইদিক দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে ভালো বলতে হয়। ওরা যদি বরাবর এইরকমটি থাকে ত বাঁচি।

তা না হয়ে আজকালকার শহুরে ছেলেদের মতো হলেই গেছি। ওই যে খবরের কাগজে লিখেছে একজনের কথা: বাপের ওপর ছেলের এমনই আক্রোশ যে, সে বাপকে ছোরা নিয়ে তেড়ে গেল খুন করতে। বাপের সম্পত্তি বেহাত হওয়ার দরুন এই যে হিংসা এ তো মোটেই প্রশংসার নয়। আর তার জন্যে লোকটাকে মেরে ফেলার কথা, এ যে ভাবা যায় না। মানুষ হয়ে মানুষকে খুন করার কল্পনার মতো মনুষ্যত্বের অবমাননা আর কিছু হতে পারে?

অবিশ্যি এটা একেবারে শহুরে ব্যাপার।

তারই পাশে আরও একটা খবর ওই কাগজেই ছাপা হয়েছে। সেটা পাড়াগাঁয়ের সংবাদ, সেটাও পিতা-পুত্র সম্পর্কেরই ব্যাপার। তাতে জানা যাচ্ছে: বারুইপুরের কাছাকাছি পশ্চিম মাধবপুর গাঁ। সেখানে থাকেন উপেন গুহ। একদিন রাতে একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপেনবাবুকে আক্রমণ করে। উপেনবাবুর ছেলে অরুণ পিতাকে বাঁচাবার জন্যে আততায়ীদের বাধা দিতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে গেছে। নিজে আহত হয়ে পিতার প্রাণ রক্ষা করেছে যে ছেলে সে-ই সত্যিকার মানুষ।

আচ্ছা ভগবান, তোমার কি মনে হয়—শহরের আবহাওয়াতে মানুষের ছেলেরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারে না, নাকি! এইসব কারণে মাঝে মাঝে এত বিচলিত হয়ে পড়ি যে, ওঁকে বলি—কাজ নেই কলকাতা শহরে থেকে। তোমায় যদি অন্য কোথাও বদলি করে দেয় ত দিক। চলো এমন কোন জায়গায় চলে যাই যেখানে সিনেমার

পোস্টার থাকে না, রেস্টুরেন্টের ভিড় থাকে না, যেখানে অনেক গাছপালা আর পশু-পাখি আছে!

উনি মাথা নেড়ে বলেন -'আমারও তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে কি জানো, এখানে বাড়তি সিটি এলাউএন্স পাচ্ছি, সেটা ত বন্ধ হয়ে যাবে! তখন খরচে কুলোতে পারবে?'

পারব। খুব পারব। কেন, সেখানে কি আর মানুষ নেই নাকি, তারা সবাই না খেতে পেয়ে মরে গেছে?...

যে ছেলেটি আমাদের খবরের কাগজ দিতে আসে আজ তার কাছে একটা বড় সুন্দর গল্প শুনেছি। না, গল্প নয়—সত্যিকার সত্য ঘটনা! হাসছ তুমি একথা শুনে! ভাবছ সত্যিকার সত্য ঘটনা আবার কিরকম পদার্থ! তাহলে বলি, এটা আজকাল হামেশা হয়ে থাকে। খবরের কাগজে যেগুলো খবর হিসেবে বেরোয় তা হল সাধারণ সত্যি ঘটনার ওপর লেখাপড়া জানা 'খবুরে কাগুজে' লোকেদের কেরামতীর নমুনা। ওঁরা তিলকে দরকার মতো তাল করতে পারেন, আবার তেমনি তালমাফিক তালকে তিলে কুঞ্চিত করার কলা-কৌশলেও ওঁরা বিধাতার পিতামহ। ওঁদের দৌলতে কালোবাজারের বড় মক্কেলও দেশহিতৈষী মহানেতা, দানবীর, বনে যান। এসব কথা আ ম মুখে কপ্‌চাচ্ছি— আসলে এগুলো সবই আমার স্বামীর মুখের কথা। উনি বলেন, সত্য তিন প্রকার: খবরের কাগজের সত্য, পথঘাটের সত্য, সত্যিকার সত্য। এটা আরো খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে আমাদের ঘি-ওয়ালার জবানবন্দী হাজীর করতে হয়। তার কাছে তিন রকমের খাঁটি ঘি পাওয়া যায়: সাড়ে চার টাকা সেরের খাঁটি, সাড়ে পাঁচ টাকার খাঁটি আর আট টাকা সেরের খাঁটি ঘি। সে বলে প্রথমটায় ভেজাল আছে, দ্বিতীয়টায়ও ভেজালে আছে। তবে সাড়ে চার টাকার ঘিয়ে যে দালদা ভেজাল দেওয়া হয় সে দালদাতেও ভেজাল আছে, আর সাড়ে পাঁচ টাকা সেরের ঘিয়ে পিওর দালদাই ভেজাল মিশোনো হয়, আর

সত্যিকার পিওর-খাঁটি ঘি হল আট টাকা সের। এবার বুঝলে ভগবান, সত্যিকার সত্য ঘটনা কেন বলছি ?

ছাখো, কোন্ কথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি। একেই বলে মেয়েমানুষের মন। হাঁ, সেই খবরের কাগজ-বিক্রীকরা ছেলেটির কথা। দাম চাইতে এল, বড় বেলা করে। ছেলেটার মুখ কেমন শুকনো শুকনো দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম - কি হয়েছে তোমার বলো তো ?

ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগে। যখনই আসে, হেসে কথা কয়। আজই কেমন মুখটা ভার-ভার।

আমার কথায় হাসল, বলল- কেন বলুন ত ? টের পেলেন কি করে ?

মনটা তার ভাল নেই, কেননা, তার জামাইবাবু বোম্বাই চলে যাচ্ছেন। কথায় কথায় জামাইবাবুর সম্পর্কে অনেক কথা বলল। বাংলাদেশ দু টুকরো হয়ে যাবার পর, তখন অবিশ্যি জামাইবাবু জামাই হন নি, বাবুও ছিলেন না। পথে পথে ত্টো পয়সার জন্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াত এক বাস্তুহারা ছোকরা। দিন চলে না, পেট কেঁদে মরে। অবশেষে ছোকরা শুরু করল খবরের কাগজ বিক্রীর কাজ। কাজ করার আগ্রহ তার তীব্র, তেমনি দুরাশা লেখাপড়া শেখার। অবাঙ্গালী হকারদের দাপটে সে বিক্রীর জন্যে কাগজ পায় না মোটে। অবশেষে একদিন দেখা করল দৈনিকপত্রের বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে। তিনি সব কথা শুনে, একটা ব্যবস্থা করে দিলেন, যাতে ছেলেটি বিক্রীর জন্য বেশী কাগজ পায়। ব্যস্, সেই হল শুরু। চেষ্টাচরিত্র করে ছেলেটি স্কুল ফাইন্যাল পাস করল, ইন্টারমিডিয়েট পাস করল, গ্রাজুয়েট হল। বিয়ে করল। বিয়েতে পণ সে নেয় নি তবে একেবারে যে কিছুই নেয় নি তা নয়, একখানা সাইকেল আর কয়েক বস্তা সিমেন্ট সে যৌতুক নিয়েছিল। নিজস্ব একখানা গাড়ি থাকলে ঘোরাঘুরির কতো সুবিধে। আর ওই সিমেন্টটাও ঘর তোলার জন্য দরকার—বিয়ে

করে বৌকে ত আর এর বারান্দায় ওর ছাদে রাখা চলে না! বিয়ের পর সে জামাইবাবু হল। খবরের কাগজের বার্তা সম্পাদক মশাই সহৃদয় মানুষ। তাঁর সুপারিশে জামাইবাবু সরকারী চাকরি পেয়ে দিল্লী চলে গেলেন। এই যে ছেলেটি আমাদের কাগজ দিয়ে যায়, এ-ই এখন জামাইবাবুর কারবার দেখাশুনো করে। ব্যবসাটা মন্দ দাঁড়ায় নি। সম্প্রতি জামাইবাবু কলকাতায় এসেছিলেন—কটা দিন খুব আনন্দেই কেটেছে। আজ জামাইবাবু চলে যাচ্ছেন, এবার তাঁকে বোম্বাইতে থাকতে হবে।

আমি বললাম—তা এতে মন খারাপ করার কি আছে? তুমিই কি চিরকাল খবরের কাগজ বেচবে? চেষ্টা করলে তুমিও এমনি লেখাপড়া শিখে ভাল কাজ করতে পারবে।

সে হেসে বলল 'তা বৌদিদি আপনার আশীর্বাদে একটা কাজ ত করি, সরকারী ইয়েতে আমি এ্যাপ্রেন্টিস আছি। ওপরওয়ালারা ভরসাও দ্যান যে, লেগে থাকলে এতে বিস্তর উন্নতি আছে।'

আগামীদিনের সাফল্যের স্বপ্ন যেন ওর দুচোখের তারায় তারায় জ্বল জ্বল করে ঝিকিয়ে ওঠে। ছেলেটা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে মনটা আমার কি জানি কোন্ অজানা তৃপ্তির স্বাদে বিভোর হয়ে রইল। খেটেখুটে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে যারা তাদের পাশে তুমি থেকো, তাদের তুমি দেখো ভগবান।

আজকের তারিখটা আমি ভুলব না, ভুলব না, কিছুতেই ভুলব না, কোনদিন ভুলব না। আজ প্রিটোরিয়া থেকে যে খবর এসেছে, তাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী রমণী তার শাদা জাতির কলঙ্কের কথা দুনিয়াবাসীর কাছে অকপটে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। এই মেমসাহেবের নামটাও লিখে রাখি: মিসেস হেলেন বিয়াত্রিচে মে যোশেফ। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদের উপর শাদা চামড়ার প্রভুদের অমানুষিক পেষণের বিরুদ্ধে এই মহিলার প্রতিবাদ ঘোষণা স্মরণীয়—যেমন একদিন আমাদের এ

দেশ থেকে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলেন আশাদেবী আর্যনায়কম, এও তেমনি! না, এ তার চেয়েও বেশি – কেননা, ভারতবর্ষ একদা ইংরেজদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছিল, তাই আমাদের দেশের মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের শোচনীয় অবস্থাটা সহজে বুঝতে পারে এবং সেই জন্য সহানুভূতিও স্বাভাবিক নিয়মেই আশা করা যায়। কিন্তু ইংরেজ হল রাজা-রানীর জাত, অত্যাচার করাটাই তার জাতীয় চরিত্র বলে আমাদের ধারণা ছিল। মিসেস যোশেফ সেই ধারণা পাল্টে দিলেন। তাঁর মানবচেতনার তুলনা মেলে না। আদালতে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করা হয়েছে, তাঁরই নির্লজ্জ দেশবাসী তাঁর মানবতাবোধকে টুঁটি টিপে ধরার বিচিত্র বিচারের দায়িত্ব বহন করতে উদ্যত। মিসেস যে তাতে বিন্দুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত নন, তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন "আফ্রিকার মানুষদের জন্মগত অধিকার হরণ করা হইয়াছে···দক্ষিণ আফ্রিকার জমির অত্যন্ত সামান্য পরিমাণই আফ্রিকানদের দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার নাই; নায্যমূল্যে নিজেদের মেহনত বিক্রয় করার স্বাধীনতাও তাহাদের নাই। প্রত্যেকটি মৌলিক অধিকার হইতেই অশ্বেতকায়দের কিছু না কিছু বঞ্চিত করা হইয়াছে!" মিসেস যোশেফকে আমার এই নিভৃত গৃহকোণে বসে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

নন্টুর বন্ধু, যাকে বলে হরিহর আত্মা সেই চন্দন বোম্বাই চলে গেল। ওর বাবা সেখানে ভাল চাকরি পেয়েছেন। আমার স্বামীর বন্ধু তিনি— ওঁরাও দুজনে হরিহর আত্মা। আবার চন্দনের মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুই বোনের মতো। ওরা চলে যাওয়াতে আমাদের সকলেরই মন খুব খারাপ হয়েছে। কিন্তু নন্টুর মতো হয়তো অতখানি নয়। সে মনের দুঃখে বোল্টুকে বলেছে- দাদাভাই আমার বড্ড মন খারাপ! ইচ্ছে করছে আমি বুকে ছুরি বসিয়ে মরে যাই!

কথাটা আমার কানে আসতে আঁৎকে উঠেছি। ছি, ছি; কি অলুক্ষুণে কাণ্ড! বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল।

ওঁর কাছে বললাম। উনি হেসে জবাব দিলেন—'দুনিয়ার বড় মানুষ গুলোরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তা ও ত ছেলেমানুষ। জানো, ইতালীর একজন সাতান্ন বছরের চাষী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কেন? না বিশ্বের মধ্যে এত অশান্তি সে সইতে পারছে না। শীর্ষ সম্মেলন ভেঙ্গে গিয়ে তার মন ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। পেরুজি লোকটার নাম সে মানুষের ওপর আস্থা হারিয়েছে। আর যে মানুষ মানুষের ওপর আস্থা হারালো তার কাছে প্রাণের কি দাম?'

—কিন্তু তোমার ওই পেরুজির সঙ্গে নন্টুর এই ব্যাপারের কি সম্পর্ক আমি ত বুঝলাম না।

'ও তুমি বুঝবে না।'

আমি বোকা, আমি ওঁর মতো বিদ্বান নই, তাই উনি একথা বললেন! মনে মনে দুঃখ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। উনি পিছন থেকে আঁচল ধরে রুখলেন 'রাগ হল?'

—নাঃ, রাগ কেন হবে।

—'তবে অমন গরগর্ করে চলে যাচ্ছো যে!'

—কি করব। বোকা, অবুঝ—

'আহা ছ্যাখো! আসলে তোমার ওই দহননগরের গল্প, মুক্তিবাবুর গল্প নিয়ে ছোটদের সামনে আলোচনা করেছি আমরা—নন্টুর ছোরা মেরে নিজেকে খুন করার কথাটা হয়তো সেই থেকেই মাথায় ঢুকে পড়েছে। বুঝলে! এসব নিয়ে ছোটদের সামনে আলোচনা করাটাই ভুল। ওদের মনে ত বাস্তব আর কল্পনার সীমানার বালাই নেই!'

বুঝলাম আমার ভুলটুকু। এবার থেকে ছোটদের সামনে কথা বলার সময় হিসেব করে চলতে হবে, বুঝলাম। অযথা ওঁর ওপর রাগ করাটা ঠিক হয়নি তাও বুঝলাম।

২০

আমাদের বাড়িতে রাজমিস্ত্রী লেগেছে কদিন। উনি বলেন,—'তোমাদের বাড়িই বটে!' যাদের বারো মাস ভাড়া-বাড়িতে বাস করে জীবন কাটাতে হয়, তাদের কাছে ভাড়া-বাড়িই 'আমাদের' হয়ে দাঁড়ায়।'

অবিশ্যি প্রায় মাসখানেক ধরে টের পাচ্ছি যে, বাড়িটা আদৌ আমাদের নয়। কেননা, সকালে উঠেও জানতে পারি না আজ কোন্ কাজটা মিস্তিরিরা করবে। হঠাৎ মিস্ত্রী এল সাড়ে সাত কি আটটার সময় —'মা আজ এই ঘর কলি হবে।' জিনিসপত্তর টানাটানি করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। মিস্ত্রাদের যদি বললাম, 'কলি কাজ ত করলে, দেয়াল ম্যাড় ম্যাড় করছে যে তবু?' 'আজ্ঞে এক-কোটে এর চেয়ে ভাল হয় না।' দু কোট দিলে কি হয়? না, হুকুম আছে এক-কোটের। অতএব ঘরদোর ধুয়ে যেখানকার জিনিস সেখানে গুছিয়ে রাখি। কিন্তু পরদিন আবার মিস্ত্রীরা এসে বলে,—'মাঃ, ও দু-কোট করেই দিতে হুকুম হয়েছে। মা, ঘরখানা খালি করে ছান।' ঘর, দালান বাথরুম সবই কলি ফেরানো হল, তারপর জানলা-দরজা রং, কড়িকাঠ আর ইলেকট্রিকের কেসিংগুলোর জন্যে দোসরা কিসমের রং। চলছে ত চলছেই। উঠোন থেকে দালানে ওঠার একটা সিমেণ্ট-জমানো ধাপ আছে, মিস্ত্রীরা সেটা ফাটিয়ে-চটিয়ে কেটে দেয়াল থেকে একদম আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে গেল একদিন। অভ্যাস না-থাকার ফলে, ওই ধাপে পা দিতে গিয়ে আমরা বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। নন্টু-বোন্টুকে ওদের বাবা সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও আছাড় খেলো।

এই দেখে মিস্ত্রীদের এক জোগাড়ে কোথা থেকে একটা কাঠের বাকসো এনে 'ধাপের' জায়গায় বসিয়ে দিল। দিব্যি সিঁড়ির কাজ চলতে লাগল। লোকটার বেশ বুদ্ধি আছে ত! তা ছাড়া ক-দিনই দেখছি এই লোকটার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের খুব ভাব হয়েছে। ওদের কাছে শুনেছি লোকটার নাম গুনগুন। কিন্তু ওইটুকু পর্যন্তই ওর ভাল —নইলে মিস্ত্রীর কাছে ওকে হরদম ধমক খেতে দেখি, ওর চেয়ে ওর মা-বাবাকেই বেশি উদ্ধার করে মিস্ত্রী। নণ্টু মাঝে মাঝে আমার কাছে সমবেদনার সুরে গুনগুনের জন্যে দুঃখ করে, বলে—"ছ্যাখো মা, মিস্ত্রীর এটা খুব অন্যায়ের কথা! ওই গুনগুন না, ওর না, নিজের একটা মুদিখানার দোকান ছিল। দোকানের ভাড়াই ছিল পঞ্চাশ টাকা। জানো মা—! তা, ওকে কি মিস্তিরির এইভাবে খারাপ-খারাপ কথা বলা ভাল?"

গুনগুনের দোকান কোন কালে ছিল, সত্যি ছিল কিনা কে জানে! তবে এটা ঠিক যে, ও একটু অন্য ধরনের মানুষ। ওই যে কাঠের বাক্‌সো এনে বসিয়ে দিয়ে আমাদের সুবিধে করল সে বাক্‌সোটা পেল কোথায়? পাশের বাড়ির লালার দোকান থেকে টেনে এনেছে। কিছুক্ষণ পরে সেটা টের পাওয়া গেল—লালার চেঁচামেচি গালিগালাজে। তার পর তুমুল কাণ্ড! লালাকে কিছু না বলেই গুনগুন কাঠের টব্‌টা তুলে এনেছে, আবার চেঁচামেচি দেখে লালাকে চড় মারবার জন্যে হাত তুলে তেড়ে গেল—'আরে, বাল্‌বাচ্চা খোঁড়া হয়ে যাবে নাকি! বেশ করেছি নিয়েছি, কাজ ফুরোলে যদি ফেরত না দিই তখন জেল দিস গুনগুন্‌কে। ব্যাটার গলাবাজি ছ্যাখো, কেরাসিন কাঠের টবটার যেন দু-দশ লাখ রুপেয়া দাম!'...গুন্‌গুনের সত্যিই মুদিখানার দোকান ছিল একদা। বড় দোকান। যার দোকান থেকে গুনগুন কাঠের বাক্‌সোটা উঠিয়ে এনেছিল, সেই লালা একদা ওর দোকানে চাকরি করত। 'তা দোকানটা উঠে গেল গুনগুন?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, অবিশ্যি সেই সঙ্গে হাতের কাজও ফেলে রেখে

গুনগুন বলতে বসে দোকান উঠে যাওয়ার গল্প ঃ 'বাবুরা ধারে মাল নিয়েছে, খেয়ে মেরে দিয়েছে। টাকা চাইলে, যারা দেবার তারা কিছু কিছু করে শোধ দেবার চেষ্টা করেছে—আর যারা না দেবার, তারা অপমান করেছে কিম্বা চক্ষু লজ্জায় অন্য পথ দিয়ে হাঁটা-চলা শুরু করেছে। আসলে কি মা, জানেন—লাভই বলুন আর যা-ই বলুন, দু-পয়সায় কিনে চার পয়সায় মাল বিক্রী করাটাও লোককে একরকম ঠকানো। তার চেয়ে গতর খাটিয়ে যা কামানো যায়, তা-ই আমার বেশ। কেউ বলতে পারবে না যে ঠকিয়ে পয়সা করছি।'...এই হল গুনগুন। বসে বসে গল্প করার জন্যে সে গালিগালাজ খেল মিস্ত্রীর কাছে। মুখ বুজে এ সব বকুনী সে হজম করে, বলে 'বড় সাহেবের মুখের ওপর কথা বলা বেয়াদপী!' বলে আর মুখ মুচকে হাসে। ও যে এককালে কাজ-কারবারের দৌলতে অবস্থাপন্ন মানুষ ছিল, তা ওকে দেখে বোঝে কার সাধ্যি। নটু-বোল্টুর মতো ছেলেমেয়ে রয়েছে ওর দেশে, তাদের কথা মনে পড়ে, দেশে যেতে ইচ্ছেও করে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। ওর গিন্নী নাকি ভীষণ দজ্জাল—গুনগুনকে দেখলেই টাকা টাকা করে ঝগড়া লাগাতে চেষ্টা করে। মুখ বুজে থাকলেও রেহাই নেই—! তাই সে দেশে যায় না, যেটুকু পারে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। জোগাড়ের কাজ ছাড়াও অন্য কাজ করে সে, বিকেলে মুড়ি, বাদাম, কিম্বা ঘুগনী বিক্রী করে। তাতেও কিছু রোজগার করে।...

রাজমিস্ত্রীদের কাজ চুকলে হাঁফছেড়ে বাঁচি।

উনি ত খুব খুশি। বলেন, 'এ বেশ ভাল হচ্ছে। দ্যাখো, এরকম ভাল বাড়িওয়ালা আজকাল দেখাই যায় না। নিজে থেকে বাড়ির রং কলি করিয়ে কজন দেয়? এই সঙ্গে তোমার আনাচে-কানাচে পুতু-পুতু করে জমানো জঞ্জালগুলো সাফ হয়ে যাচ্ছে, মশা, পিঁপড়ে কিছু কমবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে এও ঠিক, আমরাও ভাড়াটের মতো থাকি না, পরের বাড়ি বলে মনেও করি না—যত্ন করি, গোছগাছ রাখি।

ওঁর বন্ধু তিনকড়িবাবু এসেছিলেন রবিবারে মাছ-ধরার প্রোগ্রাম করার মতলবে। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে প্রসঙ্গে কথা উঠতে তিনি বললেন—'না, না, মশাই, তেমন-তেমন বেয়াড়া ভাড়াটের পাল্লায় পড়লে, বাড়িওয়ালার বাবা পর্যন্ত ভাল হয়ে যায়!'

'কি রকম!'

'রকম আর কি! আমাদের ভবানীপুরেই ত, চোখের ওপর যা কাণ্ড দেখলুম, কী আর বলব! এখন হয়েছে কি, পেনোর খুড়তুতো দাদা কেষ্টবাবু একটা চান্স পেয়ে বিলেত চলে গেল, জানেন ত?'

'হ্যাঁ! এখন ত আবার কোথায় যেন '

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই গত মে-তে মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে গ্যাছে ডিল্লী। কোয়ালিফায়েড লোক ত! ওরকম মানুষের ঠাঁই এই পোড়া ওয়েষ্ট বেঙ্গলেই কেবল হয় না, স্পষ্টবাদী যে—অন্যায় মোটে বরদাস্ত করতে পারে না। তার ফলে তোষামুদিটাও রপ্ত করতে পারে নি। ব্যস, নীচের তলায় পচতে হচ্ছিল। সে যাক, ভদ্দর লোক যখন বিলেত গিয়েছিলেন, সেই সময়ে একজন লোককে নিজের ফ্ল্যাটের কিছুটা দিয়ে গেলেন। তা সে লোকটা গত ছ-মাস ত এক পয়সাও ভাড়া দেয় নি। কেষ্টবাবুর দিল্লী যাওয়া ঠিক হতে তিনি বললেন, অন্য বাড়ি দেখে নিন মশাই, আমি এ বাড়ি ছেড়ে দেবো—সে কোন সাড়া দেয় না। এমনি করে যাবার সময় ঘনিয়ে এল। কেষ্টবাবুর বাড়িওলাও লোকটাকে অনুরোধ করল; কিন্তু লোকটার নড়বার নাম নেই। কেষ্টবাবুরা তখন এও বলল যে, বাকী ভাড়াটা দিতে হবে না, বরং আরো দেড় কি দুশো টাকা নাও, নিয়ে উঠে যাও তুমি। তাতেও লোকটা প্যাঁচ কষতে লাগল। শেষে হল কি, কেষ্টবাবুর বাড়িওয়ালা পাড়ার লোকজন ডেকে, অন্য বাড়ি ঠিক করে সেখানে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম জমা দিয়ে তবে লোকটাকে বসিয়ে দিয়ে এল। তা সর্বসাকুল্যে কেষ্টবাবু আর তার বাড়িওয়ালার শ' পাঁচেক টাকা গচ্ছা গেল। এর ওপর সে লোকটা পাড়াময় রটিয়ে দিল যে কেষ্টবাবু আর তার সাহিত্যিক শিল্পী

বন্ধুরা সকালবেলাতেই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সেই লোকটাকে মারধর করেছে, তার বাড়ির ভেতর ঢুকে শাসিয়েছে, অতএব সে উঠে চলে যাচ্ছে।

আমার স্বামী বললেন—'আচ্ছা, চমৎকার লোক ত!'

'হ্যাঁ মশাই, আজকাল এরাই হল চল্‌তা-পুর্‌জা। শুনেছি লোকটার এ-ই পেশা। আদালতের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় আর পঞ্চজনের কাছে এর-ওর নামে যাচ্ছেতাই কেচ্ছা করে।'

আমার ইচ্ছে করছিল যে তিনকড়িবাবুকে জিজ্ঞেস করি- এ সব করে লোকটার কি লাভ হয়? কিন্তু ওই মাছের আশায় ফাৎনার ডগাতে চোখ রেখে সারাটা দিন যে মানুষ নষ্ট করে তার ওপর একটুও আস্থা নেই বলে পারতপক্ষে তিনকড়িবাবুর সামনে আমি যাই নে। তার ওপর এই যুগে ও লোকটা দু-দুটো সংসার করে শুনেছি, সেও ভাবতে বিশ্রী লাগে।

নণ্টুকে দিয়ে ওঁকে এধারে ডেকে পাঠিয়ে বললাম—রবিবারে কিন্তু ঘরদোর গোছানোর কাজ আছে, তোমার বাইরে যাওয়া চলবে না। আমার কপাল ভাল যে উনি মাছ ধরার নামে নেচে ওঠেন না।...

আমাদের পাড়ায় সেদিন রাত দুপুরে দুই স্টেট বাসে মাথা ঠোকাঠুকি করে জখম হয়েছে। আজকাল এ শহরের অলি-গলি দিয়ে বাঘ মার্কা বাস ছোটে—কেউ আস্তে চলে না, আর কারুর কথা ওরা যেন ভাবতেও নারাজ। পাইকপাড়ায় যে রাস্তাটায় আগে শুধু মাত্র দুটো বাস চলত আজকাল সেই একই রাস্তায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের তাবৎ বাস, লরী, বড় বড় গাড়ি চলছে। স্বভাবতঃই এদের একটু হুঁশিয়ার থাকা উচিত। আবার এই পথের ওপরই এখন বাসের বিশ্রামের আড্ডা। রাস্তা চওড়া হল না অথচ দশগুণ গাড়ি দৌড়চ্ছে এই পথ দিয়ে। রোজই যে এ্যাকসিডেণ্ট হয় না এটা নেহাৎ আমাদের ভাগ্যের জোর বলতে হবে।...

আষাঢ়ে আকাশ ঘিরে মেঘ জমে, বৃষ্টির জলে পথঘাট দই-কাদা হয়ে ওঠে। কোথায় কবে কালিদাস আষাঢ়ের প্রথম দিনটিকে মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে অমর করে রেখে গিয়েছেন! সে কি এই দেশ? কিন্তু সে সব যেন আজ রূপকথার গল্প মনে হচ্ছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে কলের জল ছাড়া আর কোন জল এ বছর আমাদের এই কলকাতার মানুষ ছাখে নি। যা-ই হোক, আজ দ্বিতীয় দিন ছুফোঁটা চোখের জলের ছিটে পড়ে খানিকটা মানরক্ষা করলে তুমি ভগবান। জানি বর্ষাতে পথ-ঘাট ভেসে যাবে, কর্পোরেশনের কৃপায় শহরের অদ্ভুত জল নিকাশের বন্দোবস্তে ড্রেনের জল রাস্তা উপচে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়বে, আর জ্বর-জ্বারি, পেটের গোলমাল সবই বাড়বে---তবু আমরা বৃষ্টি-বিনা বাঁচতে পারছি না। এর পর বৃষ্টির অভাবে চাষাবাদও বন্ধ হবে যে। জল দাও, বৃষ্টি দাও ভগবান! গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করছে—আল্লা ম্যাঘ দেরে, প্যানি দে—।

আজ উনি বললেন—'আমি আর চাকরি করব না।'

—কেন?...অবাক হই।

'আমি গ্যারি ডেভিস হবো।'

—সে আবার কে?

'কেন! গ্যারি ডেভিসের নাম শোন নি? ফার্স্ট সিটিজেন অব দি ওয়ার্ল্ড!'

—তার মানে?

'ছুনিয়ার পয়লা নম্বরের নাগরিক।'

—সে আবার কি?

উনি নন্টুকে কাছে আসতে দেখে লজ্জা পেলেন। গম্ভীরভাবে তাকে একটা ফরমাস দিয়ে এখান থেকে সরালেন। বললেন—'ছাখো, এমন মেঘ ডাকা দিনেও যদি অফিসের ফাইলে বসে 'রেফার টু অফিস

অর্ডার নম্বর…' করতে হয়, তবে বাঁচার কি সার্থকতা। গ্যাখো দেখি গ্যারি ডেভিস-এর কাণ্ড, লোকটা আমেরিকার পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে প্যারিসে চলে যায়, তারপর সেখানে গিয়ে ঘোষণা করল যে,. 'ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট' গঠন করা হল—এবং সে অর্থাৎ গ্যারি ডেভিস হল সেই গভর্নমেন্টের প্রথম নাগরিক। তাকে সবাই পাগল সাব্যস্ত করল। আবার, আজ এই কাগজে খবর দিচ্ছে যে, ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের মোটর ভেহিকল ডিপার্টমেন্টের প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভার বহাল হয়েছে গ্যারি ডেভিস। এই বিশ্ব মোটর দপ্তরের হেড অফিস কোথায় জানো? ব্যাঙ্গালোরে। আর তার সেক্রেটারীও ওই গ্যারি ডেভিস। তাই ভাবছি কি যে, আমিও নিদেন দু নম্বর নাগরিক হয়ে যাই।'

—আচ্ছা, এই কি তোমার পাগলামীর সময়! অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে, যাও চান করো গিয়ে।

'তুমি ত বলেই খালাস। কিন্তু আজ অফিসে গেলে মারধর খেতে হয়ে আমায়, তা জানো?'

—কেন?

'ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চ্যারিটি আছে। বারোজনে টিকিটের বায়না দিয়েছিল, আর মোট তিনখানা টিকিট জোগাড় করতে পেরেছি। কাকে বাদ দিয়ে কাকে দেবো? বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো হুজুগে মত্ত, কেউ কাজ করছে না। যেন এই খেলার ওপরেই ওদের মরণবাঁচন—! দেখলে হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়। এরা আবার দোষ দেয়, ছাত্রদের 'হুজুগে' বলে। আসলে আমাদের এই যুগটাই বড় তরল মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে।'

ওঁর এই হেঁয়ালির আড়ালে গভীর একটা মর্মবেদনা আছে, যেটা সহজে কেউ ধরতে পারে না। অনেক দিন কাছাকাছি থাকার দরুন আমি সেটা কিছু কিছু বুঝতে পারি, আর সে কারণেই এই মানুষটার জন্যে নিজের স্বামী হিসেবে ছাড়াও বাড়তি একটা কষ্ট পাই—সেটা বলে বোঝাতে না পারলেও তুমি আন্দাজ করতে পারো ভগবান।

২১

এ ছেলেকে নিয়ে কি করি, বলতে পারো ভগবান! ওর জন্যে আমার কানে পর্যন্ত গহনা পরার উপায় নেই। এমন বয়স আমার হয় নি যে, সুখ-আহ্লাদ করার সাধ সাজে না। অথচ —। উনি এবার আমাদের বিয়ের তারিখে এক জোড়া কানের দুল দিয়েছেন। দিয়েছেন মানে, পুরনো ভাঙ্গাচোরা সোনার কুঁচো-কাচা কিছু ছিল, তৈরীর বানীটা কেবল ঘর থেকে দিতে হয়েছে। আগে এই বিয়ের তারিখে অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে রাত্রে নেমন্তন্ন করা হত, তা আজকাল সে সব পাট চুকিয়ে দিয়েছি। ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে ত! ওই তারিখে আমরা এবার সিনেমায় গিয়েছিলাম। আর এই দুলটা, তা ভেবে রেখেছি যে, বড় মেয়েকে এটা দিয়ে দেবো পরে। কিন্তু নণ্টু আজ সকালে হঠাৎ আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর ভাবে বলল—'মা, তুমি কানে ওটা কি পরেছ? বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। ওটা তুমি পর না মা।'

—কেন বাপী! তোমার বাবুজী যে দিয়েছেন।

এরপর আর আপত্তি করা উচিত নয় সেটা নণ্ট বোঝে, তাই চুপ করে রইল। কিন্তু মন থেকে যে তার সায় নেই, ে কু বুঝলাম।

ছোট ছেলে, ওর চোখে যেটা খারাপ লেগেছে সেটা আমার পরা উচিত নয়। দুলটার ডিজাইন উনি পছন্দ করেছেন খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু মায়ের দায়িত্বকে মেনে নিতেই হবে আমাকে। দুলটা বড় মেয়েকেই দিয়ে দেবো।

মেয়েদের স্কুল খুলেছে। আবার ওদের পিছনে 'ওঠ রে ওঠ রে' করতে হবে। সকালে বৃষ্টি হলেই খুব মুস্কিল, ওদের ছাতা নেই। মেয়ে দু-টো ভিজে ভিজে স্কুলে যাওয়া-আসা করবে। ছাতা ত কিনে দিয়েছি দু-তিন বার, কিন্তু হারিয়ে ফ্যালে। কতো আর পারি! অথচ ওদের এদিকে হুঁস নেই, বৃষ্টিতে ভিজতে পেলে যেন হাতে স্বর্গ পায়—কোথাও যে দুদণ্ড দাঁড়াবে, তা নয়। বকলে হাসে, বলে 'দেরী হয়ে যায় যে!' ওদের আর দোষ দিয়ে কি হবে, বৃষ্টিতে ভিজতে আমারই কি খারাপ লাগে! এর জন্যে ওঁর কাছে বুড়ো বয়সেও বকুনী খাই। অবিশ্যি গুরুজনকে অমান্য করে জলে ভিজি নে, আমাকে বার বার রান্নাঘরে যাওয়া আসা করতে হয়। শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝে উঠোনটুকু রোদে পোড়ায়, জলে ভেজায়, শীতে কাঁপায়- উপায় কি? তবু এই একরত্তি উঠোনখানা আছে বলেই এ বাড়িটা আমার এত ভাল লাগে। কলকাতার ভাড়াটে বাড়িতে উঠোন যেন গালের পাশের তিলটুকুর মতো বিউটি স্পট!

আজ খবরের কাগজ পড়ে মনে মনে খুব হেসেছি। তুমি নিশ্চয় জানো খবরটা, জানো না ভগবান? তবে শোন, বিহারের এক গাঁয়ের বৌ-ঝিয়েরা দল পাকিয়ে মদওয়ালাকে মেরেধরে গাঁ থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছে। গাঁয়ের পুরুষরা নিশ্চয় মদ খেয়ে বিস্তর বেলেল্লাপনা করত। তাই ওরা মদের দোকানদারকেই উৎখাত করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মেয়েদের মনের এই সাহস দেখে ইচ্ছে করছে ওদের গাল টিপে আদর করে আসি। অবিশ্যি আমি নিজে এদিক থেকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সমস্যাটা আমার একার সংসার নিয়ে তো নয়! এই যে আমাদের বিনির বর নন্দবাবু, এমনিতে অতি চমৎকার মানুষ—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে সত্যিই উঁচু দরের মানুষ। কিন্তু বেচারার একটি দোষেই সবগুলো গুণ কালো করে দিয়েছে। ভাল ভাল চাকরি পেয়েছেন, একটিও

টেকে নি —কেন না হরদম অফিস কামাই করেন, মদ খেয়ে স্যাঙ্গাৎদের নিয়ে হয়তো এক হপ্তা বেপাত্তাই রয়ে গেলেন। বেচারী বিনি বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে বড় আদরে মানুষ হয়েছিল, একথা আজ ওকে দেখলে কেউ ভাবতেই পারে না। বিনি সকালে উঠে সংসারের সব কাজ সেরে, ছেলেকে নিজেই স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অফিসে চাকরী করতে যায়। আবার সন্ধ্যেতে এসে হেঁসেলে ঢোকে। ওদের বিয়ে হয়েছিল ভালবেসে। অবিশ্যি ভালবাসা যে এখনও কিছু কম তা নয়, তবে বিনির স্বামীকে দেখলে আজ আর আমরা কেউ ভাল বলি নে। নন্দবাবুর তাতে কিছু এসে যায় কি না, কে জানে! তবে স্বামীর নিন্দে শুনলে বিনি এত বেশি খুশির ভাব দেখায় যে, তাতেই টের পাই, ও মনে মনে নিজের আসল ভাবটুকু ঢেকে-ঢুকে লুকিয়ে রেখেছে।

নন্দবাবুরা ত এক-আধজন নন, কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ওঁরা নানা নামে থাকেন। তা ছাড়া কল্‌কাতা শহরে নাকি পুরুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেদিন যেন শুনলাম পুরুষরা শতকরা পাঁচজন বাড়তি। আর, মেয়ের সংখ্যা কম বলেই নাকি সহর কলকাতায় নানা রকমের গুণ্ডামি, যৌন অপরাধ দিন দিন বেড়ে চলেছে। আচ্ছা ভগবান তুমি ত জানো যে, এর আগে কলকাতায় মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় আরো কতো কম ছিল --তখন কি এত বেশি এই ধরনের আজেবাজে উপদ্রব হতো? আসল কারণগুলোকে এভাবে ধামা চাপা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। আসল কারণ ত হচ্ছে এই যে, যারা অন্যায় করে তারা ধরা পড়ে না। আর যদি বা ধরা পড়ল তাহলে তাদের আইন আদালতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বড় বড় লোক তদ্‌বির করে থাকেন।

আমার স্বামী বলেন যে, রাজনীতি করতে গেলে, নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে গেলে নাকি হাতে গুণ্ডা রাখা দরকার। ওঁর ধারণা: পৌরসভা, রাজ্যসভা ইত্যাদির গদি দখল করার জন্যে সব ধরনের মানুষের মুখ চেয়ে চলতে হয়।

আচ্ছা, নেতাদের কাজ কি কেবল ইলেকশনে জিতে যথেচ্ছাচার করা আর যথেচ্ছাচারকে তোয়াজ করা !

দিন দিন আমি পুরুষ জাতের ওপর আস্থা হারাচ্ছি। পুরুষরা যেন মেয়েদের চেয়েও ভীরু আর মিন্‌মিনে হয়ে উঠছে। তারা আর কিছু করতে পারে না বলে, রেস্তোরাঁ আর ক্লাবে কিম্বা পার্কে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে। অবিশ্যি রোজগার-পাতি যে তারা করছে না এমন অপবাদ দিতে চাই নে। কিন্তু টাকা রোজগার করেই যদি তারা মনে করে 'রাজ্য জয় করলাম' তাহলে বুঝতে হবে তারা বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়েছে। নিজের ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হচ্ছে কিনা সেটা কে দেখবে! প্রাইভেট টিউটর? সবাই কি প্রাইভট টিউটর রাখতে পারে? তাছাড়া স্কুলেও আজকাল তেমনি পড়াশুনো হচ্ছে। ছেলেমেয়ে যদি বাড়িতেও দেখাশুনোর লোক না পায় তাহলে পরীক্ষার ফলটা ভাল হবে এ আশা করাই অন্যায়। অথচ সে কথা পুরুষেরা গভীরভাবে অনুভব করে কি?

এই সব দেখেশুনে আমার ত মনে হচ্ছে যে, মেয়েদেরই ঘাড়ে সব দায়িত্ব এসে পড়ছে। আমাদের শক্ত হতে হবে—আরো—আরো—আরো।

২২

তোমার কাছে খুব গলাবাজি করে বলেছিলাম যে, আমাদের শক্ত হতে হবে। কিন্তু আজ একটা খবর দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেছি। সত্যি কি আমরা মেয়েরা শক্তিস্বরূপিণী?

মনে মনে অনেক আশা ছিল, আমি বা আমার মতো আধাশিক্ষিত মেয়েদের দিন না হয় না-ই রইল —আগামী যুগের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে দেশের দিন বদলে দেবে নিশ্চয়। শিক্ষার হার দস্তুর মতো বেড়েছে, মেয়েদের মধ্যে ত বটেই। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বোর্ড বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখেছেন —৫৪৭ জন ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৯৩ জন ছাত্রীই ব্যাধি অথবা বৈকল্যে কবলিত। সে তুলনায় ছাত্রদের মধ্যে অসুস্থ হল শতকরা ৫৭ জন।

কলেজেই যদি এই দশা হয় স্কুলে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? পৌরসভার স্কুল মেডিক্যাল সার্ভিসের হিসেবটা দেখলেই সেটুকুও টের পাওয়া যাবে। কর্পোরেশন স্কুলগুলোর হিসেব হল: শতকরা ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রোগগ্রস্ত আর বাকী শতকরা ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৫ জন সুস্থ! বোধ হয় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দুরবস্থা দেখেই বিদেশী কোন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের লোকদের মনে দয়া হয়েছে, তাই তাঁরা কর্পোরেশনের পরিচালিত স্কুলগুলিতে সামনের অগস্ট মাস থেকে এক বছর ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে টিফিন দেবেন এই সিদ্ধান্ত করেছেন। খুব ভাল কথা। এর চেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারত না।

উনি অফিস থেকে ফিরতেই এ খবরটা দিলাম। কেন না, সারাদিনমান আজ এই খুশিতেই কেটেছে আমার কেবল একটু খচ্‌খচ্‌ করছিল যে, আমাদের দেশে পয়সাওয়ালা লোক কি কেউ নেই, না কি তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না ?

চায়ে চুমক দিয়ে উনি ছোট্ট একটু 'হুঁ' বলেই গুম্ মেরে গেলেন।

আমি বললাম—কি গো, কথাটা মনে লাগল না বুঝি ? তোমার এই বড় দোষ, আমেরিকানদের সব কিছুই তুমি সন্দেহের চোখে দ্যাখো।

উনি হাত নেড়ে বললেন—'থামো বৎসে, বলি একটা কথা মানো তো যে, ব্যাপারটা কর্পোরেশনের খর্পরে গিয়ে পড়েছে ! তারপর তার কি দশা হতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারো ? পারো না। আচ্ছা, একটা কথা ভেবে গ্ঢাখো, তোমার মেয়েদের স্কুলে টিফিন দেবার জন্যে মাসে মাসে টাকা নেয়—সেটা পূজোর ছুটি বা গরমের ছুটির মাসেও বাদ দেয় না। কিন্তু টিফিন বলতে কি দেয় ? না, ডালদায় ভাজা সিঙ্গাড়া, কিম্বা নিমকি, কিম্বা দুখানা বিস্কুট !...কোন কোন ব্যাপার সম্পর্কে আমি আমেরিকানদের অপছন্দ করি, কিন্তু ওদের সেবা বা সততাকে সন্দেহ করব এমন মূঢ় নই। খবরটা সত্যিই সুখের হত, যদি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে ওরা নিজেরা গিয়ে হাতে-হাতে টিফিন দিয়ে আসত।'

—কি জানি বাপু, এখানে কি হবে। তবে দিল্লীতে এই সমাজসেবীরা যে সব ছেলেদের টিফিন বিলোন শুরু করেছে, তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ছমাসে ফিরে গেছে—গড়ে চার পাউণ্ড করে তাদের ওজন বেড়েছে। আর সেই সব ছাত্রছাত্রীদের কেমন স্বাস্থ্য ফিরেছে সেটা দেখবার জন্যে এখানকার একদল কাউন্সিলারকে পাঠান হচ্ছে।

'তাহলেই বোঝো ! এই তালে একদল কাউন্সিলার চললেন দিল্লী। কার টাকা ? না, গৌরীসেনের টাকা। তোরা ত নিজের গাঁট থেকে খরচ করবি না টিফিনের জন্যে, তবে কেন এত মোড়লী ! অনেক দুঃখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এ হল আমাদের মাটির গুণ, এখানে কমলালেবুর

চারা পুঁতলে গোঁড়া লেবু ফলে। তা তোমার টিফিনের দশাও তাই না দাঁড়ালে বাঁচি।'

কি বলব, উনি আজকাল বড় নিরাশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

বোল্টু আর নন্টু রথের জন্যে পয়সা চাইছে। উনি বললেন—'আজ শনিবার ত রথ নয় বাবা! এত আগে পয়সা কেন?'

—আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে রথ তৈরী করছি যে! সব জিনিষ-পত্তর কিনতে হচ্ছে।

ওরা আমার কাছ থেকে কদিনই কিছু কিছু করে নিচ্ছে। আজ হাতে কিছু নেই। তা ছাড়া, কাল দুই ভায়ে প্যাণ্ট-জামায় কাঁচা রঙ মাখামাখি করে ফিরেছিল বলে খুব বকেছি, সেই জন্যে বাবুদের রাগ হয়েছে, আমার কাছে নাকি ওরা আর কোনদিন কিচ্ছু চাইবে না।

আমি যে পিছন থেকে ওদের আর্জি শুনছি সেটা আগে টের পায় নি। উনি আমার দিকে দেখিয়ে বললেন—'মায়ের কাছে চেয়ে নাও।'

নন্টুটা আস্ত শয়তান, আমাকে দেখে 'জিভ কেটে' বোল্টুকে সামলে দিল। আমি গম্ভীরভাবে বললাম—আবার পয়সা কেন?

বোল্টু বলল—'একটা মূর্তি কিনতে হবে।'

—কত লাগবে?

'আট আনা।'

আট আনায় ওরা যে মূর্তিটা কিনতে চায় সেটা এর আগে দোকান থেকে চেয়ে এনে একবার দেখিয়ে নিয়ে গেছে—ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। তাতে আমার আপত্তি আছে। রথের ওপর যেখানে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের বসবার কথা, সেখানে একেবারে যীশু? না, না, হবে না। বলে হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু ছেলেদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। রথের হিড়িকে জগন্নাথ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, বুদ্ধদেব কারুরই মূর্তি বিক্রী হতে বাকি নেই।

অনেক দিন ধরেই পড়ে আছে ও৯ যীশুর মূর্তিটা— এটা কেউ কেনে না। দোকানদার ওদের এটাই গছিয়ে দিয়েছে। পাড়ার ছোট্ট দোকান, এখানকারই কোন গরীব মূর্তিকার এই সব তৈরী করে রেখে যায়। মূর্তিগুলো মন্দ করে না, শহরের বড় দোকানে গেলে এরই দাম পাঁচ-সাত টাকা!

পাছে ওঁর সামনে যীশু-জগন্নাথ সমস্যা ওঠে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম—আমি নিজে তোমাদেব সঙ্গে গিয়ে মূর্তি কিনে দেবো। নইলে উনি হয়তো বলবেন—'কুছ পরোয়া নেই, আমি কিনে দিচ্ছি, বসাও তোমরা যীশুকেই রথে।'

রথের দিনে এক পয়সার একটি বাঁশি নিয়ে কোন্ কবি যেন একটি কবিতা লিখেছিলেন, আজ কবিতাটিও ভুলে গেছি কবির নাম ত বটেই। মাঝে মাঝে নিজেরই নামটা মনে পড়ে না, কেউ ত আমাকে নাম ধরে বড় একটা ডাকে না! আমি 'মা', আমি 'ওগো', আমি 'দিদি', 'বৌদি'— আমি সব—কিন্তু আমি বাসবী এটা যেন সবাই ভুলে যাচ্ছে! আমিই বা মনে রাখতে পারি কই! আর, রেখেই বা কি হবে। সব কিছুর মধ্যেই ত এমনি ভাবে একটু একটু করে আমি হারিয়ে যাব! নামটা আমার যেন সেই ভুলে যাওয়া কবিতার বাঁশির আবছা সুরের মতো। আমাদের ছেলেবেলার সেই রথের মেলা ফিরে ফিরে প্রতি বছর এসেছে। আর আমাকে সেই চাকায় বেঁধে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। কোন্‌দিকে ভগবান? তোমার দিকে, না, তোমার থেকে অন্য দিকে।

ভগবান, তোমার কখনো ঘামাচি হয়েছে? যার হয়েছে সে ছাড়া ঘামাচির কষ্ট কেউ বুঝবে না ভ্যাপসা গরমে রান্নাঘরে উনুনের আগুনে যখন প্রাণশক্তি ঘামের আকারে দর-দর করে ঝরে তখন ঘামাচির রাজ্যে সোরগোল পড়ে যায়, ইচ্ছে করে হাতা-খুন্তি ফেলে দিয়ে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বসে থাকি। কিন্তু তার উপায় নেই--আপিসের, ইস্কুলের ভাত দিতে হবে। তার উপরে আজ সকালে তিন দফা চায়ের চাহিদা সামলাতে হয়েছে। শুধু কি তাই, সাত-সকালে সেই গাইয়ে ভিখিরি লোকটা এসেছিল। না, তাকে সাধারণ ভিখিরি মনে করা ঠিক নয়, সত্যিই সে তা নয়। আর তা নয় বলেই ত যতো মুস্কিল হয়। ওই লোকটা আপিসের দিনে সকালবেলাতে এলে আধখানা মন থাকে গানের দিকে পড়ে, তার ফলে, হয় ডাল ধরে যায়, কিম্বা হাত ছ্যাঁকা লাগে, অথবা বঁটিতে হাত কাটে। আজ কি হয়েছিল? না, আজ অন্য কিছু হয় নি, গানের ধরতাই দেখেই তরকারীর কড়া নামিয়ে উনুনে চাড্ডি কয়লা দিয়ে এধারে চলে এসেছিলাম।

সুন্দর গাইল, গানখানির পদের বাঁধুনীও খুব গভীর, অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে। জানি না তোমাদের এই আধুনিক 'পেঁচোয়-পাওয়া পেত্নীর কান্না' শুনে যারা আহা-উহু করে তাদের কেমন লাগবে! তবে শোনোই না গানখানা ঃ

ওই ছাখ প্রেমের গাছে হেমের লতা
বেষ্টিত হয়ে আছে
শুধু হেম নয় প্রেম নীলকান্তমণি
বেষ্টিত হয়ে আছে।

ও ফুল ছাড়া তার ফলটি ধরে
ফুল থাকে আট ক্রোশ অন্তরে ;
সে ফল শীষের গুণে ধরতে পারে
নীড় থাকে তার কোন্ শহরে
ও তার মালী পরিপাটী
মাটি করে খাঁটি
নীর রেখে ক্ষীর সৃজন করেছে ।
কি আশ্চর্য ফলের ভিতরে
খাইলে সে জ্যান্তে মরে
মৃতদেহেও বাঁচাইতে পারে ;
সে ফল সুধামাখা গরল সখা
জন্মাবধি হয় না পাকা
ও-তার কাঁচাতে সুরস
রসে করে বশ
কোন রসে জগৎ মেতেছে ।
আশমানে তার গাছের গোড়া
ডালপালাহীন জমি ছাড়া
আয় নাগরী দেখে যা তোরা ।
ও তার মাঝে মাঝে রসের কলি
বিকশিত উড়ছে অলি……

আর কতো বলবো ? তোমার হয়তো ভাল লাগছে না । থাক তাহলে ! আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে । লোকটা বেশ ভালো, রমাকে দিয়ে গানটা লিখিয়ে নিয়েছি ।

মেয়ের কথা বলতেই মনে পড়ে গেল, ছোট মেয়েটা আমার দিন দিন খেয়ালী হয়ে উঠেছে । আজ সকালে সাতটা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোল । স্কুল যায় নি, বলে শরীর খারাপ । কাল স্কুলে ট্রানস্লেসনের বইখানা হারিয়ে এসেছে । ওঁর কাছে বলতে মানা করছে । কিন্তু বই ত আর একখানা দরকার হবেই, তখন— ? তা ছাড়া ওঁর কাছে

কোন কিছু লুকোনো আমার আদৌ ভালো লাগে না। পিসিমা আর পিসেমশাইয়ের মধ্যে এই নিয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হতে দেখেছি। অথচ এতো তুচ্ছ কারণ যে, ভাবলেই হাসি পায়। আমারও বিয়ের পর দু-একবার এরকম ভুল হয়েছে। হয়তো সিনেমায় গিয়েছিলাম দুপুরের শো-তে,—তখন বড্ড নেশা ছিল সিনেমা দেখার। আর উনি যখন-তখন সিনেমায় যেতেন না বা আজে-বাজে ছবি দেখতেন না। তাই ওঁর জন্যে অনেক ছবি বাদ যেতো। তখন ছেলেমেয়ের ঝক্কি ছিল না, বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগত। সেই মুখে যদি কেউ ছবি দেখার কথা বলতো ত লোভ সামলাতে পারতাম না। যেতামও। তারপর মনে হত, একজন সংসারের জন্যে আপিসে খেটে মরছে আর আমি দিব্যি ছবি দেখে কাটালাম। লজ্জা পেতাম নিজের কাছেই। ঘটনাটা চেপে যেতাম, সঙ্কোচ বশে। ভাবতাম একটু বুঝে-সমঝে সবটুকু গুছিয়ে বলা যাবে। কিন্তু যতোই সময় যায়, ততোই যেন লজ্জাটা ভয়ের মতো চেহারা নেয়। এমনি করে শেষ পর্যন্ত হয়তো বলা হল না, ভাবতাম—ভবিষ্যতে আর এমন কাজ না করলেই হল। এবারের ব্যাপারটা উনি টের না পেলেই বাঁচি।

কিন্তু কি করে যেন টের পেলেন। দুঃখ পেলেন। বললেন—'গোপনতা আমি সইতে পারি না।' ব্যস, তারপর থেকে আর কিছু গোপন করি না। আর, ছেলেমেয়েও যাতে ওই বদভ্যেস না করে সেদিকে নজর রাখতে চেষ্টা করি। ছোট কন্যেকে নিয়ে ফ্যাসাদ হয়েছে, অকারণেই ও গোপন করার দিকে ঝুঁকে থাকে। ওকে বকে-বলে-বুঝিয়েও আমি সিধে পথে আনতে পারছি না। অথচ মেয়েটার বুদ্ধির অভাব নেই—তবু—! ঠিক করেছি আজ ওকে দিয়েই ট্রানশ্লেসন বই হারানোর কথা ওঁকে বলাবো।

পাখীটা মরে গেল। সেই যে টিয়াপাখীটা একদিন এসে নন্টুর মনকে খুশী করে দিয়ে, এতদিন খাঁচায় থাকত—সে আর নেই। বেচারী

নন্টু বার বার শূন্য খাঁচাটার সামনে যায় আর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ওর দুঃখ, পাখীটা যদি কথা বলতে পারতো তাহলে ওকে ভেটেরিনারী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো যেতো। কিন্তু পাখী কথা বলে নি, এমন কি যেদিন সে দেহরক্ষা করল, সেদিন সকালেও নন্টু যখন ছোলা ভিজে দিয়েছে তখনও টিয়াপাখীটাকে দেখে নন্টুর কোন সন্দেহ জাগে নি।

ওঁর কাছে ও শুনেছে কবি সুধীন দত্ত মশাই থ্রম্বসিসে মারা গেছেন, তাই নন্টুর বিশ্বাস ওর রামদাসও 'থম্বোসি'তেই মরেছে। হয়তো নন্টুর জীবনে টিয়াপাখীটার মৃত্যু খুব স্মরণীয় একটা ধাক্কা হয়ে বেঁচে থাকবে। এমনিই হয়, আমার ছোটবেলাতে সেই 'নন্দদুদু' বেড়ালটা বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার ছবি আজও স্পষ্ট! বর্ষার দিনে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ যখন সব শব্দকে ঢেকে দিত তখনও কান খাড়া করে রাখতাম— হঠাৎ বুঝি নন্দদুদু 'মিয়াও' ডাকে সাড়া দেবে! কেন চলে গেল, বিবাগী হয়ে? কোন্ দুঃখে নন্দদুদু ঘর ছাড়া হল তা আমি ভেবে পাই নি। ওকে পরের বাড়ি চুরি করে খাওয়ার জন্যে যখন বকাবকি করেছি, ওর সহবৎ বদলাতে না-পারার দুঃখে যখন কেঁদেছি তখন বেড়ালটা ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার বেড়া-বেণী-বাঁধা টান-টান কপালের দিকে তাকিয়ে 'মিয়াও' বলত। ওই একটা শব্দে আনন্দ, বেদনা, আশা, সান্ত্বনা সবকিছুই যে লুকোনো থাকে এ রহস্য সেই ছোট্ট মেয়ে বাসবী ছাড়া আর কেউ জানত না। তাই নন্দদুদুর গৃহত্যাগে ওরা, বড়রা মোটেই উদ্বিগ্ন বা দুঃখিত নয়। অথচ বাসবীর মনের কথা 'মিয়াও' ছাড়া কেউ বোঝে না যে— !···আজ নন্টুর শোক দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। অথচ নন্টুকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো ভেবে পাচ্ছি না।

বল্টুর বিকেলবেলার খেলার সাথী মৃদুল আজ কদিন আসে না। ওরা থাকে পুকুরের ওপারে, ও পাড়ায়। নন্টু-বল্টুর একা-একা পুকুরধারে যাওয়া বারণ, তাই বল্টু ওর দিদির হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়ে

নিয়ে গেল ও-পাড়ায় মৃদুলদের বাড়ি। বল্টুর ধারণা তার বন্ধুর অসুখ-বিসুখ করেছে।

ওরা ফিরতে বড় মেয়ের কাছে মৃদুলদের বাড়ির খবর শুনে খুব অবাক হয়ে গেলাম।

অসুখ মৃদুলের নয়, ওর মায়ের। মৃদুল তার ছোট বোনকে রাখে, তার বাবা রান্না-বান্না করেন আর সে ফরমাস খাটে।

মৃদুলের মা অসুস্থ শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি অসুখ? চার-পাঁচদিন একনাগাড়ে জ্বর ভোগ করছেন। যদি তেমন কিছু বাড়াবাড়ি হয়!···ভদ্রমহিলা আমাদের মতো হাঁড়ি-ঠেলার কাজেই শুধু রপ্ত নন। উনি ছবি আঁকেন, আর্টিস্ট। শুনেছি, বইয়ের মলাট, গল্পের ছবি আরো কতো কি আঁকেন—তাতে যা রোজগার হয় তাই দিয়ে ওঁদের সংসার চলে। মৃদুলের বাবা ঘুরে ঘুরে কাজ জোগাড় করে আনেন, আদায়পত্র করেন; নিজের রোজগার বলতে মৃদুলের বাবার কিছু নেই। ওঁদের ভালবেসে বিয়ে। তাই দুজনেরই পিতৃ-মাতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এঁর ভরসা উনি, ওঁর ভরসা ইনি। ছোট্ট নীড় যেন।···কিন্তু এখন ভদ্রমহিলা যদি বেশিদিন শয্যা নিয়ে থাকেন তাহলে?

মনে পড়ল, একদিন বাসের মধ্যে দেখা হতে মৃদুলের মা আমাকে কথায় কথায় বললেন—'এবার উনি আই-এ দিলেন।' স্বামীর এই চেষ্টায় ভদ্রমহিলাকে সেদিন খুব খুশী দেখে ভাল লেগেছিল বই কি।

মৃদুলের মাকে তুমি তাড়াতাড়ি সারিয়ে দাও ভগবান নইলে কচি বাচ্ছা দুটোর কি দশা হবে ভেবে ভাখো।

আজ স্নেহদি এলেন। সারা দুপুর ধরে ওঁর গল্প আর ফুরোয় না। বেশির ভাগই হোস্টেলের মেয়েদের শয়তানির গল্প। তার মধ্যে একটা বড় সুন্দর ঘটনা বললেন যাতে মেয়েগুলোর ওপর আমার খুব শ্রদ্ধা হল।

ওঁদের হোস্টেলের পাশের বাড়ির কার্নিশে একটা বেড়াল বাচ্ছা কি করে যে গিয়ে পড়েছিল কে জানে। চারতলার কার্নিশে বেচারী আটকা

পড়ে রইল দুদিন। কেবল 'ম্যাও-ম্যাও' করে বেচারা, তাকে উদ্ধার করার কোন উপায় নেই। ওখানে বন্দী থেকে জীবটা চোখের ওপর যেন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা সবকিছু ফেলে রেখে বেড়ালটাকে ছাখে আর আকাশ-পাতাল হাঁটকে বেড়ায়, কি করে ওকে বাঁচানো যায়।

শেষ-মেস আর কিছু ভেবে না-পেয়ে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করে, ব্যাপারটা খুলে বলল, কাকুতি-মিনতি করে বলাতে দমকলের লোকেরা এসে বেড়াল বাচ্ছাটাকে উদ্ধার করল। হোস্টেলের মেয়েরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

এই হল মেয়েদের প্রকৃতি।

আচ্ছা ভগবান, এই মায়ের কাছেই ত ছেলেরা মানুষ হয়! তবে কেন ছেলেরা এমন নিষ্ঠুর হয়? তারা কেন ভুলে যায় যে, প্রত্যেকটি মানুষেরই বেঁচে থাকাটা তার নিজের মতোই প্রিয়। আমি বলছি আমাদের সরকারী বড় কর্তাদের কথা। যারা আজ এই স্বাধীন দেশের মাথায় বসে দেশ চালাচ্ছে তারা গরীব মানুষদের কথা তেমন ভাবে না-ভেবে থাকে কি করে?

আজ যখন স্নেহদি বেড়াল বাচ্ছাটার গল্প বললেন, তার আগেই পড়ছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অল্প বেতনের চাকুরেদের মাইনে না-নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর খবর। একদিকে এই খবর আর একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরেদের স্ট্রাইকের সংকল্প— সবটুকু জড়িয়ে মনে হচ্ছে, পুরুষদের স্বভাবে স্বার্থপরতা দিন দিনই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বড়রা ছোটদের কথা আদৌ ভাবতে পারে না —কেন? ওদের চিন্তায় একটু উদারতা আনার কোন উপায় কি নেই!

২৩

আজ কদিন ধরে যা বৃষ্টি নেমেছে তাতে ঘরে-বাইরে জীবন অতিষ্ঠ। ভেবেছিলাম উল্টোরথের মেলাতে ওঁর সঙ্গে গিয়ে কয়েকটা ফুল-গাছ কিনে আনব। গাছপালার শখ আমাদের দুজনেরই খুব। কিন্তু টবে গাছ বাঁচে না বলে উনি আজকাল কিনতে চান না। খালি টবগুলো উঠোনের কোণে কয়লা-গাদার পিছনে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। টিয়াপাখীটা মরে যাওয়ার পর নন্টু-বন্টু আর একটা পাখী কেনার জন্যে বায়না ধরেছিল। আমি বাতিল করে দিয়েছি। আজকালকার পাখী-গুলোও হয়েছে মহা ফাঁকিবাজ, যেন কর্পোরেশনের বাবু—বসে বসে কেবল খাবে। আগে, আমাদের ছোটবেলায় বসন্ত পানউলীর ময়নাটাকে দেখেছি, কেমন পাকা দোকানদারের মতো দাঁড়ে বসে বক্ বক্ করছে। হয়তো দুপুরে বসন্ত ঘুমুচ্ছে, সেই সময়ে কেউ বসন্তের বাড়ি গিয়ে পড়ল ; ময়নার নজর সাফ, সে হাঁক দিল 'কে, কে, কে! কি নেবে? পান নেবে? পান নেবে? পান নেবে? ও বসন্ত পান দে, বসন্ত পান দে!' আমি ত প্রথম দিন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এমন স্পষ্ট কথার বাঁধুনী যে পাখীর হতে পারে তা কি ছাই জানি! পান ত নিলাম, তারপর ময়না বুলি শুরু করল—'পয়সা দাও! পয়সা দাও! পয়সা দাও…'

কথাটা মনে হলেই হাসি পায়। মনে হয় যেন আমরা সবাই ওই বুলিটাই শিখেছি 'পয়সা দাও…।' এদিক দিয়ে গাছরা অনেক ভাল। ওরা জল আর মাটি পেলেই খুশি। জল দাও, তাহলে গাছ ফুল দেবে,

ফল দেবে—গাছরা যেন তোমারই প্রতীক ভগবান। আমার এই কথা শুনে আমার স্বামী ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তোমার ভগবান যে আস্ত গাছ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেন না, অনুনয়, অনুরোধ, প্রার্থনা কোন কিছুতেই ভগবানের যেমন সাড়া মেলে না, গাছেরও তেমনি। আমার ত মনে হয়, গাছরা ভগবানের চেয়ে এক দিক দিয়ে বড়, কেন না, গাছ ফল দেয়, ফল দেয়। তার মৃত্যুর পরও তক্তা বানানো, জ্বালানী কাঠ…' রাগ হলেও রাগ করি নি। ওঁর এই কথাটা কাজে লাগিয়েছি, বলেছি —বেশ তাহলে গাছ কিনি চলো!

কিন্তু পাখী, গাছ কিছুই কেনা হল না! উনি অফিস থেকে ফিরলেন এমন মুখের চেহারা নিয়ে, যা দেখে খুব ভয় পেলাম। ভয় পাওয়ারই কথা। ধর্মঘট ব্যাপারটা এবার আর দূরের কিছু নয়, খুব কাছে, যেন বুকের ভেতরে হাত-পা গুটিয়ে দেবার মতো সাংঘাতিক সমস্যা। রথ জগন্নাথের রথ কি চলছে? কে তার রশি টানছে? কোন্ পাণ্ডা। আমরা মূঢ়, আমাদের ম্লান মুখের দিকে তাকাবার পরও কি জগন্নাথ মূক হয়ে থাকবেন! না, না, এ আমি কি ভাবছি। হয়তো আমাদের দেহি দেহি চিৎকার এত উচ্চ রোল তুলেছে যে, অন্যের কথা শোনবার মতো অবস্থা আমাদের নেই; তাই জগন্নাথের বাণী আমাদের গোচর হচ্ছে না! স্ট্রাইক হোক বা না হোক, আমাদের মাথার ওপর যে শত-শত 'রাজার হস্ত' 'কাঙ্গালের ধন' চুরি করছে সেই সব রাজাদের হাত থেকে তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না—তুমি রক্ষা কর ভগবান।……

কাল থেকে আমার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। চালের দর চড়তে শুরু করল। শুনছি নাকি, জিনিসের দর বাড়বে—বাড়বে, আরো আরো আরো বাড়বে। তোমার সাধ্য নেই ভগবান এই সব সুবিধেবাদী চোরাবাজারী ব্যবসায়ীদের ধর্মবোধ জাগাবার, তা জানি। জানি যে এই নির্লজ্জ তস্করদের প্রশ্রয় দেওয়াও অধর্ম। আমরা যদি বাড়তি দাম দিতে রাজী না হই তাহলে ওরা জব্দ হবে। কিন্তু আমি না নিই, যুদ্ধ

আর কালোবাজারের দৌলতে যে 'পেঁচো' পঞ্চাননবাবু হয়েছে সে নির্ঘাৎ নেবে। তা ছাড়া ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করি, ওদের মুখ চেয়ে চলতে হয়। আদর্শকে তখন ভগবানের দোহাই দিয়ে সিন্দুকে (সত্যি কি আর সিন্দুক আছে ?) তুলে রাখি। ধর্মের ঘটটা একদম উপুড় করে দিয়ে নিশ্চন্ত হতে পারলে বেশ হত। কিন্তু ঘটে যে এখনো ছিটে-ফোঁটা ধর্মের অমৃত-স্পর্শ লেগে রয়েছেঃ কি করি এইটুকু নিয়ে, আমরা এত বড় দেশের এতগুলো মানুষ, কার ভোগে কতটুকু ভাগ পড়বে !

তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চোখ রগড়ে দেখি রোদ উঠেছে। কয়েকদিন পরে রোদের মুখ দেখে, ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ঘর আর দালানের দড়ি থেকে টেনেটুনে নিয়ে এলাম বাইরে। উনি ত ঘরের অবস্থা দেখে বলছেন আজকাল— 'আমোদিনী নাট্যশালার সিন-সিনারির বাহার-বরকন্দাজ !'

চারদিকের সমস্যা বুঝি আমার মাথাটা এই বয়সেই খারাপ করে দেবে। আজ সকালে দেখি বড় মেয়ের বিছানা ছেড়ে ওঠার নাম নেই। ঠেলেঠুলে যদি বা তুললাম, তিনি বললেন 'আজ স্কুলে যাবো না মা!' কেন ? কাল, পরশু রোজই দুটোর বেশি তিনটি ক্লাস হয় না। দিদিমণিদের কেউ বা বি. টি. পড়তে চলে গেছেন, কেউ অন্য কোন ভাল চাকরি পেয়ে মাস্টারী ছেড়ে দিয়েছেন, আর কারুর বা অসুখ করেছে। ব্যস, হয়ে গেল হিসেব। এদিকে পড়ানোর যা নমুনা তাতেই অস্থির ! এর ওপর আবার ক্লাস না হওয়া ! এখন উঁচু ক্লাসের পড়া, এভাবে ফাঁক পড়লে মেয়েরা শিখবে কি ! স্কুল-ফাইনালের সময় যদি প্রশ্নপত্র দেখে চোখের জল ফ্যালে মেয়ে তখন খেসারত দিতে হবে ত আমাদেরই, মানে, গার্জেনদের।

ভাবছি একবার নিজেই গিয়ে ওদের হেড্ মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে আচ্ছাসে শুনিয়ে দিয়ে আসব।

ওঁকে বললাম, তুমি মেয়েটার পড়াশুনো একটু দেখিয়ে দাও ! ক্লাসে গিয়ে কোন লাভ নেই।

মন্দাকিনীর পিসিমা এলেন আজ বিকেলের একটু আগে। ওঁকে দেখে মনে মনে আশা হল, আবার আশঙ্কাও। মাস ছয়েক হয়ে গেল, 'এই পরশু বিকেলে দোব' বলে পাঁচটা টাকা নিয়ে গেছেন। তা আর ফেরত পাই নি। তার উপর 'ভীষণ ঠ্যাকায়' পড়ে দু দফায় আরও তিন টাকা নিয়েছেন। ফেরৎ পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে বসে ছিলাম। মনটা বড় মজার জিনিস। ওঁকে দেখেই ভাবলাম, বুঝি টাকা কটা ফেরত দিতেই এসেছেন উনি। কয়লার দর বাড়ছে, যদি টাকা কটা পাই তাহলে আরো চার মণ কয়লা কিনে রাখব।

আবার ভয়ও হচ্ছে, যদি—! না, এখন আর দিচ্ছি না টাকা তা ওঁর যত ঠ্যাকাই পড়ুক না কেন? এর আগে ভাবনা ছিল যে, টাকা দিলে বাকী পাওনাটাও তাড়াতাড়ি ফেরত পাবো। এখন— তাছাড়া আমারই কিছু ধার পেলে ভাল হয়।

উনি কিন্তু টাকা পয়সার ধার দিয়ে গেলেন না। বললেন, 'মন্দার মায়ের কদিন জ্বর, তা যতীনকে একখানা পত্তর লিখে দাও দিকি নি বৌমা। ইদিকে আবার খবর যা শুনেছি তাতে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁদোচ্চে। লিখে দাও, এই পত্র টেলি মনে করিয়া অবিলম্বে এক মাসের ছুটি লইয়া চলিয়া আসিবা।'

যতীনবাবু যে গৌহাটির কাছে পাণ্ডুতে রেলে চাকরি করেন সেকথা তো এতদিন মনে পড়ে নি। পিসির কথায় চমকে উঠলাম। ওখানকার অসমীয়ারা যা অত্যাচারটা করছে বাঙ্গালীদের ওপর তাতে লোকটা আদৌ বেঁচে আছে কি না কে জানে! পিসির কথামতো চিঠি লিখলাম, এ চিঠি কোথায় পৌঁছবে তার ঠিক কি। বিশেষ করে রেলের লোকদের ওপর, পুলিসে চাকুরি বাঙ্গালীদের ওপর ওরা যা অত্যাচার করছে তাতে মনে হয় ওখানে মানুষ নেই। মানুষের রক্ত যাদের শরীরে

আছে তারা কোন বুদ্ধিতে, ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে! অপরাধ কি, না সে বাঙ্গালী। কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী আসামের আকাশের তলায় গিয়ে দুটো খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। আসাম, বাঙলা এক ভারতের সীমানাতেই রয়েছে। অসমীয়াদের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে না বাঙ্গালীরা। যোগ্যতা অর্জন না করে, কেবলমাত্র সেই সীমানার, কিম্বা সেই ধর্মের দোহাই পেড়ে যারা দল পাকায়, দাঙ্গা করে, তারা আর যাই হোক, মানুষ তাদের বলা চলে না। কিছুদিন আগে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেরও কিছু কিছু স্বার্থবাদী লোক এই হুজুক তোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখানে মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ সংখ্যায় বেশি থাকার ফলে প্রাদেশিকতার গাঁজার নেশায় বিশেষ কেউ ভেড়ে নি। কিন্তু আসামে এই তাণ্ডব কেন হচ্ছে?

এসব কথা মন্দাকিনীর পিসিকে বলার কোন মানেই হয় না। উনি হয়তো এখুনি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবেন।

একদিকে আসামে ওই হাঙ্গামা আর একদিকে দেশজোড়া ধর্মঘটের হুমকি! এ দেশের হলো কি? বলতে পারো ভগবান! আমি ত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, আমাদের কি দশা দাঁড়াবে। শেষে কি এই শহরের বুকে লাখ লাখ লোক একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে! ডাক, রেল সব বন্ধ হয়ে যাবে? অবিশ্যি এসব নিয়ে আমার মতো ঘরের মেয়েমানুষের মাথা ঘামানোর কোন অর্থ নেই সারা দেশের সেরা মাথারা নিশ্চয় ভাবছেন। অন্তত, এটা ঠিক যে আমি কিছু করতে পারব না যতোই ভাবি না কেন। কান্না? কেঁদে কি হবে! ভগবান তোমাকে জানিয়েই বা কি ফল হবে, যদি তুমি নিজে থেকে না ছাখো, আমি কি তোমার চোখে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে দেখাতে পারবো? তবু ভাবনার ভূত ঘাড়ে এমন ভাবে চেপে বসেছে যে ইচ্ছে করছে দিল্লী চলে যাই, নেহেরুর বিবেকের কাছে দরবার জানাই।

দুপুর রাতে জগনের মা এল। কি ব্যাপার? না, টিয়াপাখী। এত রাতে? রাত না হলে, সবাই ঘুমিয়ে না পড়লে ওই বা পাখী নিয়ে আসে কি করে! ওযে চুরি করেছে। হ্যাঁ, নিজের কাছে চুরি। মানে, ওর ছেলেমেয়ে, সর্বোপরি ওর স্বামী যেন টের না পায় যে পাখীটা নন্টুকে দেওয়া হয়েছে। জগনের মাকে বলে কয়ে, বকেঝকে কিছুতেই পাখী ফেরত দেওয়া গেল না। ও হাসে আর বলে—'তুমি অতো কিন্তু কর না মা। আমরা নিজেরাই খেতে পাই নে, তার ওপর আবার বাড়তি একটা পাখী। মিন্সের শখের বলিহারি যাই! পাখীটা কোন্ দিন না খেতে পেয়ে অক্কা হবে। তা কদিনই ভাবছিলাম, আকাশের জীব খাঁচা থেকে বার করে দিলে উড়ে চরে খেয়ে বাঁচবে। তা ভাগ্যে উড়িয়ে দিই নি, তাই আজ নন্টু বাবুর খাঁচায় ও আশ্রয় পেল। আহা ছেলেটা পেরায় ওই পথের ধারে কুলগাছে ঝুলনো খাঁচার দিকে তাকে থাকে! কাল সকালে উঠে দেখবে ওর পাখী আবার খাঁচায় ফিরে এসেছে। যদি বলে কোথায় পেলে ত বলো পাখী আবার বেঁচে

না, না, সে আমি পারব না। একবার মনে আছে, এমনি ধারা মিথ্যে কথা বলে কি বিপদেই পড়েছিলাম। হয়েছিল কি, একটা আরশুলা কি করে যেন চিৎ হয়ে গিয়েছিল। নন্টু তখন ছোট, বেশ ছোট। ও এসে খবর দিল, বল্টু নাকি বলেছে আরশুলাটি মরে গেছে। আমাকে টানাটানি, 'চলো মা দেখবে।' দেখে, মায়া হল, একটা কাঠি দিয়ে আরশুলাটাকে উল্টে দিতেই সে দিব্যি হেঁটে চলে গেল। নন্টু বলল, 'কি হল?' আমি বললাম, ভগবানের নাম করে ওর গায়ে কাঠি ছোঁয়ালাম তাই ও বেঁচে উঠল। তারপর, একদিন একটা টিকটিকি মরে পড়ে আছে দেখেই নন্টু দৌড়ে এল—'মা মা ওকে বাঁচিয়ে দাও! ভগবানের নাম করে বাঁচিয়ে দাও না মা!' সেদিন নিজের ওপর রাগ হয়েছিল খুব। কেন মিথ্যে বলে ভগবান তোমার বাহাদুরী জাহির করতে গিয়েছিলাম?

শিক্ষা হয়ে গেছে, সেই থেকে অকারণে মিথ্যে বলি নে। জগনের মাকে আর নিজের লজ্জার কথা বললাম না।

ও বার বার সাবধান করে দিয়ে গেল, 'দেখো মা, মুখপোড়া মিন্‌সের কানে যেন না ওঠে। তাহলে আমাকে মারধোর করবে। ইদিকে ভাতদেবার মুরোদ না থাকলে কি হয়, পুরুষের ইয়ে আছে।'

জগনের মা চলে যাবার পর সারারাত ধরে এপাশ-ওপাশ করেছি আর কতোবার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই গোটা দেশের সব মানুষই বুঝি জগনের মায়ের মতো অসহায়, সবাই বুঝি নিজের কাছ থেকে নিজেই চুরি করে আর ভয়ে ভয়ে থাকে।

ভগবান, এটাই বোধহয় তোমাকে আমার শেষ চিঠি লেখা। এর পর আর ইনিয়ে-বিনিয়ে সুখ-দুঃখের কথা তোমাকে জানিয়ে সময়ের বাজে খরচ করব না। তোমাকে লিখে কি লাভ? যেমন কোন লাভ নেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সত্যিকার দুঃখ-বেদনার জন্য দরবার করে। যেমন কোন লাভ নেই এই অদ্ভুত স্বাধীন দেশে এতটুকু শান্তি, একটু স্বাচ্ছন্দ্য আশা করে কেন না তা তোমরা কেউ দিতে পারো না। তোমরা পারো বড় বড় কথার বাহারী তোড়ায় বক্তৃতা দিতে। তোমরা বড় লোক, তোমাদের মুখের বড়াই কাজের বেলায় যদি এক কাণাকড়িও মুরোদ দেখাতে না পারে তাতে তোমাদের কীই বা এসে যায়! তুমি ভগবান, তোমার আশীর্বাদী সৌভাগ্যের দৌলতে আজ আমাদের দেশে কংগ্রেসী সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তোমার এই সরকার মহোদয় ক্রমশঃ তোমারই মতো বিস্তর উঁচুতে, আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্রমশঃ ধারণা হচ্ছে আমাদের ছোট কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় সরকারী পিতাদের নেই। তাঁদের মাথায় প্রচণ্ড গুরুদায়িত্ব, তাই তাঁরা কাশ্মীরে ব্যস্ত থাকেন যখন, তখন আসামের প্রকাশ্য রাজপথে মেয়েদের উপর অত্যাচার ঘটলেও সেদিকে তাকাবার সময় সেই দায়িত্বশীল পিতার (মহাত্মা গান্ধী যাঁকে তাঁর মানসপুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন) ছিল না। শুধুমাত্র এই নারী নির্যাতনের প্রতিবাদেই ত আসামের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা উচিত ছিল। আসামের ওই উলঙ্গ আত্মপ্রকাশের সঙ্গে যেন গোটা অসমীয়া সমাজের মনোভাবও প্রকাশ হয়েছিল। অসমীয়াদের পৈশাচিক তাণ্ডবে পনের থেকে কুড়ি হাজার বাঙ্গালী (তারাও মানুষ) ছিন্নমূল হয়েছে। তাদের কারুর সহায়-সম্বল কিছু নেই। তার পরেও কিন্তু আসাম সরকারের মন্ত্রীদের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব কেড়ে নেন্ নি। এখানে আমি কাকে বৃহন্নলা বলবো? যে রাজ্যের সরকার নিজের

অক্ষমতা প্রমাণ হবার পরও গদী আঁকড়ে সভ্যতার পরিহাস-শ্মশানে মায়াকান্না কাঁদে, সে সরকারের গায়ে মানুষের চামড়া আছে বলে আমি মনে করি না। আর সেই রাজ্য সরকারের অত্যাচার-পীড়িত মানুষেরা যে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে জেনেও যে সরকার চরম ব্যবস্থা গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব করছে, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও পুরুষ মানুষ আছে এমন কথা আমি মেয়েমানুষ হয়ে ভাবতে পারি না। এতে তুমি আমাকে যে শাস্তিই দাও না কেন, আমি মাথা পেতে নিতে রাজী আছি ভগবান, তবু তুমি এই অন্যায়, এই অলস মন্থরতার স্বপক্ষে সায় বা রায় দেওয়াতে পারবে না। জানি আমি অত্যন্ত সাধারণ ঘরের নিতান্ত অক্ষম মেয়েমানুষ, তবু এটুকু আমার জানা হয়ে গেল আসামে মানুষ নেই, সেখানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পশুরা মানুষের মতো ঘর-বাড়িতে বাস করে, আর জানা হল যে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারে যেসব বিধবা পুরুষ মানুষ কর্তৃত্ব করছেন, তাঁদের জরাবার্ধক্য পঙ্গু করেছে।···

না, না, তুমি আমার সব কথা শোনো আগে, তারপর বিচার করতে এস ন্যায়-অন্যায়ের।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছে। তাদের বেঁচে থাকার দাবিটা এমন কিছু অন্যায় দাবি নয়। তুমি বলবে যে, আমাদের দেশের যা আর্থিক অবস্থা তাতে বর্তমানে অতো মাইনে বাড়ানো চলে না। বেশ কথা, তাহলে যাতে মানুষগুলো দু-মুঠো খেয়ে পরে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা ত করবে, নাকি! দিন দিন প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে নিতান্ত প্রয়োজনীয় চাল ডাল, কাপড়-চোপড় সবকিছুই আকাশ-ছোঁয়া দরে পৌঁছে গেছে। বেশ, মাইনে যদি না বাড়ানো যায়, তাহলে জিনিসপত্রের দাম যাতে কমে সেই ব্যবস্থা করো! না এদিক, না ওদিক—এই করতে করতে শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ঘটে গেল। সরকারী শক্তির ওজন আমার মতো পুঁটি মাছের জানার কথা নয়, জানিও না। কিন্তু আমি এই

কদিনের ধর্মঘটে যা জেনেছি তাতে সামনের দিনগুলোর কথা কল্পনা করতেও বুক কেঁপে যায়। যদি দিন থেকে মাসে গিয়ে পৌঁছয় এই রেল-ডাকের গর-হাজিরা, তাহলে এই বড় শহরের মানুষগুলো, আর ছোট ছোট শহর-বাজারের মানুষগুলো উপবাস করে না খেয়ে মরবে। যতদিন হাতে পয়সা থাকবে, ততদিন না হয় চড়া দাম দিয়ে ধড়ে প্রাণটা জীইয়ে রাখতে পারবে আধ শুকনো বেগুন, জলে-হাজা পটল আর ঠাণ্ডাঘরের আলু দিয়ে। এ গেল প্রথম ধাপের কথা। কেন না এক টাকা সের বেগুন, বারো আনা সের পটল, দশ আনা সের ঝিঙে, মাছ আর চোখে দেখার বস্তু নয়। উনি বললেন 'বাজারে এখন কাঁচা বেল, তাল আর লেবু ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই।' এর ওপর আজ ১৪ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘট ; শহরে গাড়িঘোড়া পর্যন্ত বন্ধ ছিল। দিন কয়েক আগে, বিদেশের কোন্ চেতাবনীর গণনায় এই দিনেই পৃথিবী রসাতলে যাবার কথা। কিন্তু দেখছি শেষ পর্যন্ত যায় নি। অবিশ্যি পৃথিবীর সব কথা ত জানি নে, কলকাতায় কোন হাঙ্গামা বাধে নি। সব বন্ধ থেকেও আমরা প্রাণে এখনো টিকে রয়েছি। রাত্রের রেডিও সংবাদে ঘোষণা হল, সব ঠিক আছে, সরকারী ব্যবস্থায় শান্তি, শৃঙ্খলায় চিড় ত খায়ই নি, বরং বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ধর্মঘট হওয়ার ফলে গোটা দেশের কোন মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি।

এই ঘোষণাটা শুনে উনি রেডিও বন্ধ করে দিলেন, কেন না ওঁর এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে শহরে টহল দিয়ে উনি জেনে এসেছেন যে, শহরের জীবনযাত্রা তচ্‌নচ্‌—বাইরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ স্রেফ বন্ধ। উনি বললেন 'যুদ্ধের সময় যখন জার্মানীর কাছে ইংরেজরা হেরে নাস্তানাবুদ হচ্ছে তখন ইংরেজের রেডিওতে খবর দেওয়া হত যে, হিটলার যুদ্ধে গোহারান হারতে হারতে ভয় পেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে। হিটলার জুতো চিবোচ্ছে! তা আমাদের দেশেও সংবাদটা প্রচারের রং নেবে নাকি?'

রাত্রে বেলা এল। বলল—'উনি আজ কদিন বাড়ি আসেন নি, অফিসে ভীষণ চাপ পড়েছে। লোকটা ঘরে না থাকলে, ঝগড়াও করা যায় না, দুটো মনের কথাও বলা যায় না। তাই আর থাকতে না পেরে চলে এলাম।' বেলার আসার আরও একটা কারণ আছে। ওদের পাড়ার মুসলমান আর অবাঙ্গালীদের মধ্যে একটা গুজব রটেছে যে, আসামের বর্বরতার পাল্টা একটা আক্রমণ নাকি বাংলাদেশে হবে। পরশু যে আসামের অত্যাচারের প্রতিবাদে শোক-হরতাল হবে, সেই দিনেই নাকি অবাঙ্গালীদের ওপর হামলা করবে বাংলার লোকেরা।

উনি বললেন 'না, না, এসব বাজে কথায় কান দিও না।'

বেলা হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল। তারপর বলল—'আজ জানো বাসবীদি! আমাদের পাড়াতে মাছ বিক্রী হয়েছে পাঁচ সিকে সের দরে। কিন্তু ভিজে আর গুঁড়ো কয়লার ধোঁয়াতে সেই মাছ রান্না করা যে কি শাস্তি তার কি বলব!'

—পাঁচ সিকে সের মাছ?

'হ্যাঁ, মেছোরা ত বাজারে যেতে পারে নি, বড় রাস্তায় বেরলেই ফ্যাসাদ ত।'···মনে মনে আপশোষ হল বই কি।

ওঁর আশ্বাসেও কিন্তু গুজব চাপা রইল না। সেই গুজবে ভয় পেয়ে আমাদের এ পাড়ার দুই মুদিখানার মালিক লালারা পালিয়ে গেছে খিদিরপুরে। আর কাঠওয়ালা ধনেশ্বর নিজে না গেলেও ছেলে আর ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কী সর্বনেশে কাণ্ড! এখানেও কি আসামের তাণ্ডব শুরু হবে নাকি। আজকের রাতটা পেরিয়ে কাল হরতাল। আসামের অত্যাচারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ হরতাল। কিন্তু শান্তি শেষ পর্যন্ত থাকবে ত? মানুষের কাণ্ডজ্ঞান কি এমনি করেই লোপ পেয়ে যাবে! আমার এই বয়েসে এ রকম একটা বিভীষিকার ছায়া। এর আগে কখন দেখি নি। হ্যাঁ দেখেছি একবার, সেটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়। উনি অফিস থেকে ফিরে দু-তিনটের বেশি

কথা বলেন নি আমার সঙ্গে। ওঁর মন খুব খারাপ, ফেয়ারলি প্লেসের অনেক ধর্মঘটী নাকি কাজে যোগ দেবে বলে অফিসে হাজির হয়েছিল, তারা বিলম্বে হলেও নিজেদের ভুল বুঝেছে (অর্থাৎ চাকরি যাবার ভয়ে ভীত হয়েছে)—কিন্তু উপরওয়ালারা জানিয়ে দিয়েছেন তারা চাকরি থেকে বরখাস্ত, অতএব তাদের অফিসেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওঁদের অফিসেও এই রকমের কড়া নির্দেশ আছে। স্ট্রাইক যদি ভেঙে পড়ে তাহলে কি হবে? সরকারী মনোভাব খুব কঠিন। তার ওপর গুজব গোলমালের আভাষ। লালারা চলে যাওয়াতে নন্টু খুব কান্নাকাটি করল, লালারাও নাকি যাবার সময় চোখের জল মুছে শেষ করতে পারে নি।...এ কী জীবন, এ কি মনুষ্যত্বের প্রহসন তুমি আমাদের ঘাড়ে চাপালে ভগবান!

'গুজব!' উনি বললেন—'তোমার একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা আছে বাসবী। আমাদের বাংলাদেশ পুলিসে চালায় না, মন্ত্রীরাও চালান না, মানে সরকারের কথা বলছি। আমাদের সব-কিছুই গুজবের ওপর চলে। তবে আজকের হরতাল দেখে মনে হচ্ছে যে, হাওয়া বুঝি বা ফিরবে। নইলে যেভাবে গুজব ছড়িয়েছিল, তাতে হাঙ্গামা বাধতে পারত। অবিশ্যি কাল কয়েকশ গুণ্ডা-বদমাসকে হাজতে আটক করেছে বলে গোলমাল বাধে নি। আর খবরের কাগজেও শহরের মাথা মাথা লোকেদের শান্তভাবে-শোক-পালনের অনুরোধপত্র ছাপা হয়েছে। এ থেকে মনে হচ্ছে বাঙ্গালী যদি নিজের নিজের স্বার্থ আঁকড়ে না থেকে সচেতন হয় তাহলে এখনো বাঙ্গলাদেশ বাঁচতে পারে।' ওঁর কথা শুনে খোঁজ নিলাম লালারা ফিরেছে কি না। না ফেরে নি। আহা বেচারীদের জন্যে দুঃখ হয়। অথচ এই লালারাই ত পরশু দিন পাঁচ সিকে সেরের পোস্ত অনায়াসে সাত সিকে হিসেবে আদায় করেছে আমার কাছে। তা করুক, তাই বলে আমি তার অমঙ্গল চিন্তা করতে পারি না।

২৫

আজ আবার মনে হচ্ছে বুড়ো নেহরুর শাসনযন্ত্রের চাকাটা দেরিতে চললেও চলে। গুজব রটনার সেরা সম্রাট রামসওয়াল গোয়েঙ্কাকে গ্রেপ্তার করে খুব ভাল কাজই করেছে সরকার। আর এই বিলম্বিত আসামযাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিলে মন্দ হয় না। না, ধন্যবাদের যোগ্যতা তিনি হারিয়েছেন। অবশ্য এজন্য দোষ তাঁর ততটা নয় যতটা তাঁর আশপাশের নেতা-মাথা লোকের। পাঁচদিনেই কেন্দ্রীয় ধর্মঘটের দৌড় ফুরোলো। স্ট্রাইক খতম! কিন্তু তাতে করে যে মানুষগুলো দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল তাদের কি চরম দুর্দশার কিছুমাত্র অবসান হল! কী যে হবে ভগবান তুমিই জান।

আশ্চর্য আমার এই মনটা। যখন ধর্মঘট শুরু হল তখন ভয় পেয়েছিলাম, বুঝি বা না খেতে পেয়ে আমরা এই শহরে বন্দী হয়ে মরব! রাগ হয়েছিল অপদার্থ সরকারের ওপর আর হয়েছিল ধর্মঘটীদের ওপর—ওরা দুই দলে দেশের সব মানুষের ভাগ্যে দুর্ভোগ এনে দিল কেন?

কিন্তু আজ যখন আবার রেলের চাকা পুরোপুরি ঘুরল, যখন কাল পোস্ট অফিসে স্বেচ্ছাসেবিকা মহিলাদের বদলে চাকুরে কর্মচারীরা কাজ করবে তখন কি দশা দাঁড়াবে! ধর্মঘট সমস্যার সমাধান হয় নি, ধর্মঘটের অবসানে যখন আমরা নিশ্চিন্ত ভাবে বাঁচব তখন যাতে এই ধর্মঘটীরাও বাঁচে সেটা কি তুমি দেখবে না ভগবান? রাগই করি আর

ঘৃণাই করি, তুমি ছাড়া আর কোন গতি নেই—আমাকে ক্ষমা কর, আমাদের সবাইকে ভালভাবে মানুষের মতো বাঁচবার মনোবল দিয়ো। আর আসামের অত্যাচারে যারা আজ সর্বস্বান্ত, তাদের জীবনগুলো আবার মানুষের জীবন হয়ে বেঁচে উঠুক এইটুকু করো। নেহরুর চোখে অশ্রু ঝরুক দেশের দুর্দশার সমবেদনায়, এইটুকুই আমি চাই। তাহলেই তিনি চিনতে পারবেন যে ধামা-চাপা দিয়ে সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না (যা এর আগে তাঁর বন্ধুরা চেষ্টা করেছেন)। মিথ্যে গলাবাজী করে চিরকাল দেশের চেতনাকে ধমকে রাখা সম্ভব নয়।

নণ্টুবাবু আজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই বড়-গলায় বলল জানো মা, আমাদের স্কুলে এখন পিরিয়ড হচ্ছে।

সে আবার কিরে ?

—জানো না, তুমি কিচ্ছু জানো না মা! প্রত্যেক ক্লাসে আলাদা আলাদা টিচার পড়াচ্ছেন। এই ধরো আমাদের ক্লাসে যদি মীরা পিসি পড়ায় ত ক্লাস টুতে ডলি দি, আবার ফোরে হয়তো শোভনা পিসি আর ওয়ানে গীতা মাসি। জানো প্রত্যেক পিরিয়ডের পর ঘণ্টা পড়ে।

—কে ঘণ্টা বাজায় ?

-কেউ-না কেউ বাজায়। মীরা পিসিও—না, তার ঠিক নেই

আসলে নণ্টুর খুব সাধ বড়-বড় ইস্কুলের মতো ওদের ছোট ইস্কুলে সব কিছুই ঘটুক। তা, ততখানি না-হলেও আগের চেয়ে ইস্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রথম যখন দীনেশবাবুর সিঁড়ির নীচে পড়ে থাকা আধখানা ঘরে, মাত্র বারোটি ছেলেমেয়ে নিয়ে শোভনা আর বন্ধুরা স্কুল খুলল, তখন কেউ আশা করে নি যে, সেই স্কুল মাথা তুলে দাঁড়াবে। দীনেশবাবু যখন স্কুলকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন রীতিমত ভাবনা হয়েছিল —এই বুঝি গেল উঠে। কিন্তু ওঠে নি, শ্যামলের বাবা তাঁদের টালির ঘরই স্কুল করার জন্য ছেড়ে দিলেন, সেটা তাঁদের শোবার ঘর। অথচ দীনেশবাবুর তিনতলা অত বড় বাড়ি ত: সংসারে তাঁরা

স্বামী-স্ত্রী আর একটা কুকুর ছাড়া কেউ নেই। একতলা আর দোতলায় ভাড়াটেও বসিয়েছেন দীনেশবাবু। তা ভাড়াটেদের কারুর কোন আপত্তিই ছিল না, শোভনা-মীরারা ত নিজেরাই ওই বাড়ির দোতলার ভাড়াটে। তবু দীনেশবাবু গরমের ছুটির ফাঁকে দরজা বসিয়ে, তালা লাগিয়ে স্কুল বসা বন্ধ করলেন। কি আশ্চর্য মনোবৃত্তি! সে যা-ই হোক, শ্যামলের বাবা গরীব এবং উদার—তিনি যতটা পাঁচজনের সুবিধে অসুবিধে বোঝেন, দীনেশবাবু যদি তার সিকি সিকিও বুঝতেন! দীনেশবাবু বলে নয়, পাড়ার পয়সাওয়ালা লোক কানাইবাবু, বলাইবাবু কেউ কুটোটি নেড়ে উপকার করেন নি। কিছু না, ওঁদের যে দালানটা পড়ে থাকে সেখানে ক্লাস বসানোর কথা বলেছিলাম, কিন্তু-না, ওটা ওঁদের দরকার। এই কলকাতা শহরেই খান তিন-চার প্যালেসের মতো বাড়ি আছে ওঁদের। তবু পড়ে থাকা ঠাকুর দালানটা শুধু ফেলে রাখার জন্যেই দরকার।

এই রকমই হয়! ভাগ্যে পিসিমা আর পিসেমশাইকে বলে কয়ে মহাদেববাবুর বাবা পঁচিশ টাকায় খোলার ঘর দুখানা পাইয়ে দিলেন তাই এখন স্কুলে পিরিয়ড হচ্ছে, পিরিয়ডের পর ঘণ্টা পড়ছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বেড়েছে, শিক্ষিকাও আগের তুলনায় বেশি। ওরা সবাই স্কুলকে ভালবাসে। এখানে যারা পড়ায় তারা বিদ্যায় বড় না হলেও, মনের দিক দিয়ে সেটা পুষিয়ে দেয়। গরীব-মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষে এ ধরণের স্কুল (পাঠশালা বললে নন্টু মনে কষ্ট পাবে বলে ওদের পাঠশালাকে আমরা স্কুলই বলি) যে কতো সুবিধের তা আমি বেশ বুঝি।

নন্টুর কাছে স্কুলের নিন্দে এতটুকু করবার জো নেই। কিন্তু ওর ছোটদি ফট করে বলল - হ্যাঃ আমাদের ইস্কুলে ত দরোয়ানে ঘণ্টা বাজায়।

ভেংচী-কেটে আঁচড়ে কেঁদে-কেটে ছেলে অনর্থ বাধিয়ে দিল। কিছুতেই ওকে সামলানো যায় না। শেষে আমি বলি—তুই ত আচ্ছা বোকা! বল না, যে কাজ নিজেরাই করা যায় তার জন্যে অন্য লোকের

ওপর ভরসা করার কি দরকার! তা নন্টু বরং এক কাজ করো তোমরা, ঘন্টা বাজানোর কাজটা টিচারদের কাছ থেকে তোমরা চেয়ে নিয়ো!

—হ্যাঁ মা, তুমি বলো না শোভনা পিসিকে একটু! আমরা ত ছোট, তা বলে কি কোন কাজই পারব না!

চোখের জল মুছে নন্টু আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

উনি অফিসের ব্যাপার নিয়ে আজ কদিনই খুব ভেতরে ভেতরে অশান্তিতে আছেন। দিল্লীর দপ্তর থেকে আগের হুকুমনাফিক যাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের এখন বহাল করার নির্দেশ এলেও, এখানকার ওপরওয়ালার ওপরওয়ালা এসেছেন দিল্লী থেকে। তিনি নিজের খেয়ালখুশি মতো অনেকের ওপর বরখাস্তনামা বজায় রাখছেন। এই নিয়ে এঁদের সকলেরই মনে খচখচানী, কিন্তু স্পষ্টভাবে স্থানীয়-ওপরওয়ালার কেন্দ্রীয়-ওপরওয়ালাকে অমান্য করার উপায় এঁদের হাতে নেই। এই লোকটি এর আগে যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন যে-সব কেরানীর ওপর রাগ পুষে রেখেছিলেন সেই রাগের উসুল এখন করছেন আর কি!

উনি দুঃখ করে বলছিলেন চাকরি ছেড়ে দেবো। এইভাবে দাসত্বের পায়ে সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু খেয়ে পরে প্রাণে টিকে থাকার নাম বাঁচা নয়।

হঠাৎ এক-এক সময়ে আমার ওপর ক্ষেপে যান উনি, বলেন - তোমাদের জন্যেই আমার হয়েছে যতো জ্বালা!

তা বটে, দোষ ত আমারই! আমি আর আমার ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব যদি ওঁকে বইতে না-হত তাহলে ওঁকে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে হত না।

আজ শ্যামবাজারের মোড় থেকে চার আনায় একজোড়া কেয়াফুল

এনে ঘরে যখন সাজিয়ে রেখেছিলাম তখন মনে মনে একটা তৃপ্তির আশা গুন্ গুন্ করে উঠেছিল। গেয়েছিলাম—'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে···'। কেয়াফুল উনি ভালবাসেন। মনে মনে আশা ছিল হঠাৎ ফুল দেখে খুব অবাক আর খুশি হবেন। সেই অবাক-হবার ছবিটা আগেকার দিনের খুশির ছবির সঙ্গে মেলাবার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল।···তার বদলে কিনা পেলাম একরাশ বিরক্তি আর আক্ষেপের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। ফুলগুলো হাতে ধরে বাসে আনবার সময় অনেকবার কেয়ার কাঁটা ফুটেছিল, হাত ছড়েছিল, রক্ত ঝরেছিল কিন্তু সে সব আমি আমলই দিই নি।

এমনই হয়, তাই না ভগবান! যার জন্যে চুরি করি সে-ই আমাকে সবার আগে চোর অপবাদ দেয়।

না, ওঁকে কথা শুনিয়ে কি লাভ। আমি ত জানি যে, এটা ওঁর একটা সাময়িক মনোভাব। হজম করে নিয়ে বললাম জানো! আমাদের মৃদুলের বাবা সেকেণ্ড ডিভিশনে আই.এ. পাস করেছেন!

ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'কে? মৃদুল কে!'

—ওই যে, যে ভদ্রমহিলা ছবি এঁকে সংসার চালান, আর্টিস্ট গো! যাঁর খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। আহা ভদ্রমহিলাকে কাল দেখতে গিয়েছিলাম, একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছেন।

'অঃ।'

বলে উনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে কতকটা যেন নিজেকেই শোনালেন—'আই. এ.-র রেজাল্ট বেরুলো বটে। আমাদের ট্রামখানা কলুটোলা থেকে আর এগোয় না। জাম মেরে গেল। ওখান থেকে হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত পৌঁছতে পাক্কা আধ ঘণ্টা পুইয়ে গেল। লোকে-লোকে রাস্তা ফুটপাথ বোঝাই, মাঝে মাঝে পুলিসের লাল পাগড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। দোকানগুলোর সামনে ত মানুষের মাথায় মানুষ চড়ে পড়েছে। এরই মধ্যে ডাকাবুকো গুণ্ডা ছোকরারা ব্যাফ্‌ল ওয়ালের মাথায় চড়ে বসেছে। ওখান থেকে হাত বাড়িয়ে পয়সা নিচ্ছে

আর রেজাল্টের বই দিচ্ছে এমনভাবে যেন নেহাত দয়া করে পাসই করিয়ে দিল। লোকগুলোও এমন আহাম্মক যেন রেজাল্টের বই পেলেই স্বর্গের ইন্দ্র বনে' যাবে! একটি প্রৌঢ় বললেন, আরে মশাই, বই একখানা কিনলাম, কিন্তু হাতে ধরবার আগেই এধার ওধার থেকে টেনেটুনে ছিঁড়েকুটে এ্যাক্সা করে দিল। আরে হতভাগা, তাতে কার কি লাভ হল! এমন ডোক্‌লা-হাঘরের দেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে, আসামীরা তোদের মেরেছে। খুব উত্তম কাজ করেছে। এর পর কোন দিন বাঙলাদেশ থেকেই তোদের মেরে তাড়াবে। রেজাল্ট বার করার ছিরিও যেমন! সব ব্যাপারেই এমন অব্যবস্থা আর কোথাও কি ঘটে?'

ওঁর নিজেকে শোনানো কথাগুলো শুনতে শুনতে বুঝলাম যে, ফুলের গন্ধে উতলা হওয়ার মন আমরা হারিয়েছি। আমাদের জীবনে সমস্যার হাজারো জাপ্‌টাজাপ্‌টি ছাড়া আর আশ্রয় বলতে কিছুই হয়তো থাকবে না।

কিন্তু এত জেনেও কেন স্বপ্নের নেশা ছাড়তে পারি না বলতে পারো ভগবান?

আজকের দিনটির তারিখ তোমার কাছে লিখে পাঠাচ্ছি আজ ১৯৬০-এর ২২শে জুলাই, এই দিনটি মেয়েদের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না ভগবান, একবার তোমায় লিখেছিলাম যে, পুরুষেরা যে-হারে পিছিয়ে পড়ছে, না, বরং বলা ভাল যে, মেয়েরা যে হারে এগিয়ে আসছে, (কেন না, পুরুষদের ওপর কর্তৃত্ব করার দখল ষোল আনা পাই নি এখনো) তাতে একদিন মেয়েরা এগিয়ে এসে সুষ্ঠুভাবে দেশ চালাবার দায়িত্ব নিয়ে নেবে। তা আমার সেই চাওয়াটা আজকে খানিক পাওয়ার আকারে রূপ পেল। সিরিমা (শ্রীমা) বন্দরনায়েক সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হলেন। সিরিমার স্বামীকে যে-সব চক্রান্তকারীরা হত্যা করেছিল আট মাস আগে, তারা কি স্বপ্নেও কল্পনা

করেছিল যে, নিহত প্রধানমন্ত্রীর বিধবা পত্নী (তিনটি সন্তানের জননী) এইভাবে দুর্জনের দুরভিপ্রায়ের জবাব দেবেন। সিরিমা বন্দরনায়েকের এই সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজীর খাড়া করল যা এর আগে কখনো ঘটে নি। রাজার মেয়ে, রাজার স্ত্রী বা ওইরকম কোন সুবিধা-জনক অবস্থানের দৌলতে অনেক মেয়েই রানী বা সাম্রাজ্ঞী হয়েছেন। কিন্তু একটা দেশের নির্বাচনী যুদ্ধে লড়াই করে (তাও জীবনের সবচেয়ে ভরসা-সম্পদ স্বামীটি খুন হবার পর, যখন অন্য যে কোনও মেয়ে মুহ্যমান হতাশায় তলিয়ে যেতো) প্রধানমন্ত্রী হওয়া কোন মেয়ের পক্ষে এ-ই প্রথম। একদা ভারতবর্ষ থেকে সিংহলে অভিযান ঘটেছিল, আর আজ অথবা আগামী কোনদিন সিংহল থেকে যদি আদর্শের উদ্দীপনা ভারতে আসে তাহলে বুঝবো আমরা মেয়েরা সত্যিই 'শক্তি' !

আর এর পাশে আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থার কথাটা একবার ভাবো দেখি ভগবান : আজকেরই কাগজে রয়েছে কেরলের শিক্ষামন্ত্রী ওখানকার এ্যাসেমব্লিতে স্বীকার করেছেন যে, একজন শিক্ষয়িত্রী সর্বস্বার্থ ত্যাগ করে শিক্ষার কাজে নিজেকে ব্রতী করেছিলেন বলে সরকার যখন তাঁকে উচ্চতর পদে বহালের হুকুমনামা পাঠালেন, তখন ভদ্র-মহিলার মৃত্যুর বয়স এক বছর পেরিয়ে গেছে। তিনি মরবার এক বছর পরে তাঁর পদোন্নতি হল। কেমন সুন্দর আমাদের দেশের কর্ম-তৎপরতা বলো তো !

আজ শনিবার—না সে আমল আর নেই, যখন মনটা শনিবারের এই বিকেলটুকুর জন্যে সারা সপ্তাহ ধরে হাঁ করে চেয়ে থাকত। এখন শনিতে আর সোমে কোন ফারাক নেই।

দুপুরে খবরের কাগজ খুলে দেখি যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই চিঠি লিখেছেন নেহরুজীকে প্রসঙ্গ : আসাম ও বাঙালী। তারাশঙ্করের মানসচক্ষুতে যে সন্দেহ আর সংশয় জেগেছে, প্রধানমন্ত্রীরও

সেটা জাগা উচিত ছিল। নেহরুজী তিন সপ্তাহের মধ্যে আসামকে যাবতীয় উৎপীড়িত পলাতক বাঙালীদের ফিরে যাওয়ার মতো মনোভাব সৃষ্টির হুকুম দিয়ে খালাস! তারাশঙ্কর অসুস্থ: রোগশয্যা থেকে তিনি এই চিঠি লিখেছেন। তাছাড়া লোকমুখে শুনেছি যে, আসামে বাঙালীর সর্বনাশা নির্যাতন আর লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভাপতিত্ব করবার পরই তিনি বিছানা নিয়েছেন।...তারাশঙ্করের বক্তব্য খুব স্পষ্ট: ১৯৫১-র আদমসুমারীতে দেখা যায় আসামবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন অসমিয়াভাষী (এবং আদমসুমারী আদৌ নির্ভরযোগ্য কিনা সন্দেহ আছে) আর বাংলা ভাষাভাষী সেখানে ২৮ জন। এই বাঙলা ভাষাকে উৎখাত করার জন্যে আসামের শিক্ষিত সমাজ, ছাত্র-সমাজ যে বর্বর পন্থা অবলম্বন করল, তার বিচার কে করবে? নেহরু! নেহরুজীর বিচারে কি এই রায় হল যে, মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে গৃহহারা, আত্মীয়বান্ধববর্জিত মানুষগুলিকে জঘন্য বিদ্বেষময় পরিবেশে ফেরত পাঠাও! আর যারা খুন করল, যাদের পাশবিক অত্যাচারে বাঙালী নারীজীবন অবমাননার চরমে পৌঁছলো, যারা হাজার হাজার ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল তাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে সাহস করলেন না ভারতের হর্তাকর্তা দুঃখত্রাতা! তারাশঙ্করের সঙ্গে (যদিও আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীর এই স্পর্ধা মানায় না) আমি বাঙলাদেশের নারীসমাজের মর্মবেদনা উৎসারিত করে দিয়ে নেহরুজীর বিবেকের দ্বারে করাঘাত করে বলছি: কংগ্রেস একদা আদর্শের জন্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই কংগ্রেসের শুধুমাত্র নামটুকু রাখবার জন্য আদর্শকে বর্জন করো না, করো না। পার্টির চেয়ে দেশ অনেক বড়ো, গদীর চেয়ে আদর্শ অনেক উঁচুতে। হে আচ্ছন্নদৃষ্টি নেহরু, তুমি গান্ধীজীকে স্মরণ করে সত্যের পথকে আশ্রয় করো। তাতে গদী যাবে? যাক! কিন্তু মানুষ হিসেবে তুমি সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২৬

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই আস্তে আস্তে কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠলাম, দরজা খুলে দেখি বিমলা! কি ব্যাপার? সাত-সকালে ছেলে ট্যাকে নিয়ে ও হাজির হল কেন? বছর দুই আগে হলে অবিশ্যি আদৌ অবাক হতাম না। তখন এটাই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিমলা আসত প্রথম দফা চায়ের সময়। চা খেত। এটা-ওটা টুকি-টাকি কাজ করে দিয়ে চলে যেত। ওর স্বামীর জন্যে রান্না করে দিয়ে—স্বামী কারখানাতে কাজে বেরিয়ে গেলে আবার বাড়ি থেকে বেরুতো। যখন অন্য বাড়িতে বাসন মাজার চাকরি থাকত তখন তবু দুটো খেতে পেত। আর যখন চাকরি না থাকত তখন অন্ন ছিল অনিশ্চিত। ওর স্বামী সেই জাতের, যারা 'ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।' ভাত সত্যিই দিত না বিমলার স্বামী আর বেধড়ক প্রহারও দিত। আমার সাধ্যমতো ওকে দেখবার চেষ্টা করতাম—তা আমারই বা সাধ্য কতটুকু। একদিন বিমলার কপাল ফিরল যখন ওর ছেলে হল। ছেলে হবার পর থেকে ওর স্বামী ওকে খেতে-পরতে দিতে সুরু করল। বিমলার চেহারাও ফিরে গেল।

এ বাড়িতে ওর আসাও কমে গিয়েছিল। তা গেলেও বিমলার ছেলের মুখে-ভাত আমার এখানেই করতে হয়েছে, এই-ত কমাস আগে। ওর বড় সাধ যে ছেলের অন্নপ্রাশন হয়,—ঘটাছটা না হলেও পাঁচ-রকম সাজিয়ে ছেলের সামনে ধরে দেওয়া হল। ভেবেছিলাম ছেলের দৌলতে বুঝি বিমলার ভাগ্য ফিরে গেল।

কিন্তু আজ সাতসকালে ছেলে নিয়ে আসতে দেখেই বুঝলাম হাওয়া খারাপ। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কাল রাতে স্বামী ওকে মারধোর করে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। কেন? ছেলেটার জ্বর হয়েছে, কান্নাকাটি করছে খুব—হাজার চেষ্টা করেও বিমলা তার কান্না থামাতে পারে নি। বিরক্ত হয়ে ওর বর বকুনি দিয়েছে 'ছেলে থামাতে পারিস নে, ত মা হয়েছিস কেন?'

বিমলাও মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি, ছেলেকে 'খস্মুনী' দিতে সে ডুকরে কেঁদেছে। আর যায় কোথা। ত্বদ্দাড়িয়ে মেরে, শির দাঁড়া তুমড়ে দিয়েছে বিমলার। বেচারী!······

কিন্তু বিমলা আমাকে সান্ত্বনা দিল, বলল 'তুমি কিছু ভেবো না দিদিমণি, মিন্সে মায়ায় মরেছে। তেজ মরতে দেরি হবে না, কারখানায় যাবার আগে ছেলেকে আদর না করে যেতে পারে না। এক-একদিন হাপ্ খেটে পালিয়ে আসে, ছেলের জন্যে মন কেমন করে ত! দ্যাখো না, এই এল বলে।'

আহা তাই যেন হয়।

বিমলা তখনো যায় নি, উমেশবাবু এলেন। কি খবর? এ পাড়ায় রোগী দেখতে এসেছিলেন তাই একবার—। ওর খবর ভাল নয়, ওঁর যে-ছেলেটির মৃগী আছে সে এবারেও আই.এ. পাশ করতে না পেরে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। দু-দিন ধরে খোঁজ করেও তার কোনো হদিস মেলে নি। হাওড়ার বামুনগাছি কেবিনের কাছে তাকে রেললাইনের ওপর মাথা পেতে শুয়ে থাকতে দেখে এক ভদ্রলোক তুলে আনেন। তারপর তাকে যদি বা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, যৌথ পরিবারের নানা-কর্তার একজন তাকে এমন প্রহার দিল যে ছেলেটি আবার পালালো। দ্বিতীয় বার সে ধরা পড়ল বোলপুরের কাছে, এবারেও রেল লাইনের ওপর। এমন ব্যর্থ প্রাণ সে আর রাখতে চায় না। এখন তাকে বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। উমেশবাবুর এই ছেলেটিকে আমরা দেখেছি। এমনিতে

তার কথাবার্তা খুব মিষ্টি, ভারি নম্র স্বভাবের ছেলে। উমেশবাবুর মনের ইচ্ছাটা আমার স্বামী অনুমান করে নিয়ে বললেন—'আমি এসবের কিছুই জানি নে। অফিসে কিছুদিন ধরে যা তাণ্ডব চলেছে! যাই হোক আজ সন্ধ্যের দিকে আপনার বাড়ি নিশ্চয় যাবো।' বুড়ো বয়সে উমেশবাবুর মতো ভাল লোকের ভাগ্যে এই উদ্বেগ জমা ছিল তা কে জানতো! আমাদের পরিচিতদের মধ্যে উমেশবাবুর খবরটাই জানি, কিন্তু দেশজোড়া কতো মা-বাপ এই রকম উদ্বেগে, দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন তার হিসেব ত আমার জানা নেই। আমার নিজের ছেলেমেয়েও বড় হচ্ছে, ওরা কি-করবে সেই ভাবনাতেই বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে সুরু করি, নিজেদের মানুষ করার পদ্ধতিতে কোন গাফিলতী হচ্ছে কি না! হ্যাঁ হচ্ছে বই কি, আমার স্বামী এত কম ফুরসৎ পান যে, আজকাল ওদের পড়াশুনো নিয়ে বসতেই পারেন না। আমার সাধ্য আর কতটুকু! বিশেষ করে অঙ্কটা যে একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি।

যাই হোক ওঁকে বলতে হবে, এখন থেকে সাবধান না হলে, শেষে ছেলেমেয়ের মেধার ত্রুটি আর স্কুলের টিচারদের ফাঁকিকে দায়ী করে দায় সারা যাবে না -খেসারৎ আমাদের দিতেই হবে!

রাত্রে খেতে বসে উনি খুব রেগে গেলেন। আমার আজ পঞ্চমী। দিনের বেলায় পরটা খেয়েছি। এবেলার ব্যবস্থার কথা মনে ছিল না। আর যখন মনে পড়ল তখন রাত হয়ে গেছে। নিজের জন্যে কাউকে কিছু ফরমাস করা যেন বড়ই লজ্জার, তাই আর বলি নি। তার ফল ভুগতে হল। উনি রাগ করে উঠে যাচ্ছিলেন। অনেক কষ্টে, মাথার দিব্যি দিয়ে সামলানো গেল। এখন বেচারীকে মিষ্টি কিনতে দোকানে ছুটতে হল। এটা ওঁর বাড়াবাড়ি, কেন না আমি দেখেছি, একবার যদি মনে করি ক্ষিদে নেই, তাহলে সত্যিই আর খেতে ইচ্ছেই করে না। আর উনি বলেন—এটা আমার গোঁ!

দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে ফিরে বললেন –'সেই বাসটাকে ক্রেন এনে তুলে নিয়ে গেল।'

আজ বিকেলে বড় রাস্তায় একখানা দু-নম্বর দোতলা বাস গর্তে পড়ে গিয়েছিল। রাস্তার একটা পাশ খোঁড়া হয়েছে, গাড়ি চালাবার সময় ড্রাইভার সেটা ত্যাখে না কেন! এর আগেও এই পথের গর্তে বাস পড়েছে দু-তিন বার। তবু এরা সাবধান হয় না।

রাত্রে শুয়ে ঘুম আসতে চায় না। ওই যে ওঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছি তাতেই মনটা খারাপ।

জেগে থাকলে যা হয়, রাজ্যের কথা এসে মগজকে উত্যক্ত করছে। আজ নন্টু, বন্টুদের স্কুলে ছুটি হয়েছিল, সকাল-সকাল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মদিন বলে। নন্টুর খুব অবাক লাগে যে, বর্ণ পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ এই সব বই লিখেছিলেন যে মানুষটি তাঁর এত নাম কি করে হল! ওকে অনেক চেষ্টা করেও ঠিক বোঝাতে পারি নি, বিদ্যাসাগর কত বড় মানুষ ছিলেন। বলেছি সবই 'সদা সত্য কথা বলিবে' এ কথা বিদ্যাসাগর মশাই আমাদের শিখিয়ে গেছেন। তার জবাবে উল্টো প্রশ্ন- 'আচ্ছা মা! বিদ্যাসাগরের আগে কেউ সত্যি কথা বলতে জানত না?' এই ছেলেই আমাকে জব্দ করে এসেছে। বরাবর ওর এই রকম বেকায়দায় ফেলা স্বভাব! মনে পড়ে, ও যখন আধ আধ গলায় প্রথম ভাগ পড়ত তখন নিত্য দিন আমার কান্না পেত। প্রতিটি কথার মানে জানা চাই। অজ, আম, কর, খল সবই পড়িয়েছি। কিন্তু 'নদী'র পর 'যদি'-তে এসে পড়া আটকে গিয়েছিল। 'যদি'র মানে আমি ওকে বোঝাতে পারি নি বলে সেদিন পড়া ওখানেই ইতি হয়ে গেল।

আজকে যারা কাজের কাজ ছেড়ে কেবল 'ভাঙো-ভাঙো' বলে দাপট ফলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাও ত আমার নন্টু-বন্টুরই মতো ছোট ছিল। তাদের প্রকৃতিতে কোন অস্বাভাবিক কিছু ছিল না কি। কিন্তু কোথায়, কার কাছে কোন শিক্ষা পেল যার ফলে ভাঙার তাণ্ডবে তাদের

এত উৎসাহ। এই যে আজ ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচু, কাল মেয়োর স্ট্যাচু ভেঙে বেড়ানোর বাজে ব্যাপারে অযথা সময় আর মেহনতের অপব্যয় করছে -- ওরা এতে কি খুব সার্থক কিছু করতে পারছে! আচ্ছা, ওদের কি সুবুদ্ধি দেবার মতো মানুষ একটিও এদেশে নেই? আমার ত ইচ্ছে করছে গিয়ে বলি—ইতিহাসের পাতা থেকে আমাদের পরাধীনতার অধ্যায়টা তোমরা মুছতে পারো? পারো না। তোমাদের মধ্যে এমন কোন পাষণ্ড আছে যে আগ্রার তাজমহল ভাঙতে পারে? আছে? নেই! যদি বা থাকে, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করব আর একটা তাজমহল গড়তে পারো? কিম্বা উট্রাম, মেয়ো, ভিক্টোরিয়া যাদের স্ট্যাচু তোমার চক্ষুশূল হয়েছে, তাদের জায়গায় বসাবার মতো অনুরূপ মর্যাদা-সম্পন্ন মানুষের, অনুরূপ শিল্প-সার্থক স্ট্যাচু গড়ে তোলো, তারপর ভাঙতে এসো এ সব।

আশ্চর্য নীচ ও অনুদার আমাদের দৃষ্টি মানে আমাদের দেশের তথাকথিত নেতাদের দৃষ্টির কথা বলছি। এই রকম অপরিণামদর্শীরাই গোয়েঙ্কার মুক্তির দাবীতে হরতাল করে। এঁরা একটা কোনো হুজুগ চান, সেই হুজুগে কিছু হৈ-হল্লা করে পার্টির নাম খবরের কাগজে হাজির করে দেশবাসীর নজরে পড়তে চান। এটা প্রচারের যুগ। সবাই পাবলিসিটি চায়। আচ্ছা ভগবান, তুমি পাবলিসিটি চাও না? তুমি কি খবরের কাগজের সম্পাদক বা রিপোর্টারের দরজায় ধর্ণা দিয়ে বলো যে, এই আমার বাণী এটা তোমাদের কাগজে ছেপো।

আবোল-তাবোল কতো কীই যে ভাবনায় মাথা গরম হয়ে উঠেছিল তার ঠিক নেই। শেষ রাতের দিকে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

দেশে ওঁদের একটুকরো বাগান আছে। বাগান মানে, বিলের ওপারে ডাঙা জমিতে কয়েকটা আম গাছ, একটা বেল আর দুটো আতা গাছ। বছর-বছর খাজনা গোণা ছাড়া সে জমি থেকে উশুল কিছু হয়

না। একজনকে ভার দেওয়া আছে, তিনি বুড়োমানুষ সব সময় দেখতে পারেন না। মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন, 'বাগানের আম কে যে পাড়িয়া লইয়া গিয়াছে জানি না। গিয়া দেখি যে, একটি দানাও আম নাই।'

আজ চিঠি এল, যাদের কাছ থেকে এই বাগান খাজনা করে নেওয়া হয়েছিল (অন্ততঃ তিরিশ বছর আগে) তারা বাগানের জমিতে 'বেগুন লাগাইয়া বসিয়া আছে। উহাদের মতলব ভাল নয়।'

কর্তা অফিস থেকে ফিরে এই পত্র দেখলে ত ক্ষেপে আগুন হবেন। আজই রাতের গাড়িতে দেশে রওনা হয়ে হেস্তনেস্ত করে তবে ফিরবেন। যাতায়াতে কম করে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ হবে, তার ওপর হায়রানি। যদি বলি—কি দরকার? বেচে দিলেই পারো বাগানটা। তাতে আর কিছু না হোক খরচটা ত বাঁচে!

অমনি জবাব দেবেন 'বাসাড়ে যারা তারা একথা বলতে পারে!'

আমার বাপের বাড়ির ত জমি বলতে ছিটেফোঁটাও নেই, সেই-টুকুকেই কটাক্ষ করা হল।

ওসব সৎযুক্তি এখানে খাটবে না, এখন দেখা দরকার ধোয়া কাপড়-জামা কর্তার আছে কি না, টর্চটা খুঁজে রাখতে হবে। উনি যাবেন নির্ঘাৎ। বেআইনী বেগুন চাষের দফা নিকেশ করাই হবে ওঁর এখন পবিত্র ব্রত।

সকালে আজ মেজাজটা বেশ শরীফ দেখে ভেবেছিলাম এ মাসে কিছু বেশি টাকা চাইব সামনে পূজো আসছে ত, এখন থেকে তার দফা গয়া হয়ে গেল।

এমন শরীফ-মেজাজ অনেকদিন পরে দেখলাম। ডেকে বললেন, 'কোন দুর্ভাবনা কোর না পো-পোয়াতী ভাল আছে।'

—তার মানে?

'মানে আবার কি! আমাদের পরম বন্ধু রুশেরা যে সাইবেরিয়ান

বাঘ আর বাঘিনী উপহার দিয়েছিলেন, আটাশে জুন প্রাতঃকালে তাদের চারটি বাচ্চা হয়েছে।'

—আ আমার কপাল। তা আমার সে খোঁজে কি দরকার।

'তোমাদের খবরের কাগজে ত আজকাল আসাম আর কেন্দ্রীয় ধর্মঘট ছাড়া আর কোন খবর থাকে না, তাই আমাদের স্টেটস্‌ম্যান থেকে তাজা খবর অনুবাদ করে দিলাম, জ্ঞাতার্থে।'

তারপর আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে ছিলেন, সত্যি লজ্জা পেয়েছিলাম। অনেক অনেকদিন পরে স্বামীকে দেখে লজ্জা পেলাম আজ।

এ-সব কথা তোমাকে লেখাও পাপ! কিন্তু মনের অগোচর পাপ নেই, তোমার কাছেও কিছু লুকোনোর উপায় নেই।

সকালে যেদিনটা এমন মধুর ভাবে শুরু হয়েছিল হঠাৎ বেগুন বাগানের দুঃসংবাদ এসে সেটা তচ্‌নচ্‌ করে দেবে!

অফিস থেকে ফিরেই বললেন- 'আজই দেশে যেতে হবে।'

চিঠি তখনো দ্যাখেন'নি। তবে কি কোথাও খবরটা শুনে এলেন বেগুন বাগানের জমিদারবাবু!

না, ব্যাপার অন্য, হরিপদবাবুর বিয়ে। ওঁদের অফিসের হরিপদ-- তাঁর বয়েস কম হয় নি। বয়েস পেরিয়ে বিয়ে হলেও তা বিয়ে। মেয়ের বাড়ি আমার শ্বশুর বাড়ির দেশে-- কাজেই ওঁকেও সঙ্গে যেতে হবে, খুব ন্যাটাপ্যাটা করে ধরেছে।

বললাম--তাহলে বাগানের ব্যাপারটাও ফয়সালা করে এস।

চিঠি পড়লেন।

আমি নিজে থেকে বাগানের ওপর মমতা দেখিয়েছি, এতে উনি খুব প্রসন্ন। বললেন—'দেশ-গাঁয়ের ওপর টান থাকা ভাল। আগে আমারও তেমন ছিল না--ওটা বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আসে, বুঝলে।'

১৭

বোধ হয় এ যুগের হাওয়াতেই কোন গোলমাল ঘটেছে। নইলে পোশাক পরিচ্ছদের দিকে আমাদের এত নজর পড়ল কেন? আজকাল পথেঘাটে যখনই ঘোরাফেরা করি, যে কোন অল্পবয়সী মেয়ে দেখি, ভাল লাগে। দূর থেকে মনে হয়, বাঃ কেমন সুন্দর। আর একটু কাছে গেলে সন্দেহ জাগে—না, যতটা সুন্দরী মনে হয়েছিল ঠিক অতোখানি নয়। তারপর, খুব কাছাকাছি পৌঁছে গোড়ার আলিফটার রং চটে চুপসে যা-তা হয়ে যায়! তা বলে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়ে কি আমাদের দেশে একেবারে নেই? না, তা বলছি না। এই সেদিন ওঁর এক বড়লোক বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম সেখানে গিজ-গিজ করছে অপ্সরী-কিন্নরী ঊর্বশী সুচিত্রা-নার্গিসের 'জামা-কাপড়ভুতো' বোনেরা। আমার আবার পাপ মন, হয়তো মেয়েদের মনই এই রকম। তাই বসে বসে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো তাদের মন দিয়ে দেখলাম—চটকদার পোশাক, তা সেই চুলের চূড়ো থেকে শুরু করে সায়ার লেস্ পর্যন্ত নির্বাচনে যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এর ভেতর থেকে আসল সুশ্রী মেয়ে, যার স্বাস্থ্যও ভাল এমনটি দুয়ের বেশি তিনটি পেলাম না।

আমি অবিশ্যি শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো লাবণ্যের নিছক এ্যানাটমি বিশ্লেষণের জন্যে এ কাজে মন দিই নি। হাতে কোন কাজ নেই, দেখা আর শোনা ছাড়া—তাছাড়া সদ্য বইখানা পড়েছি বলে হয়তো তার ছাপও মনে রয়ে গেছে! ভদ্রলোকের হিসেবটা আমার

খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে। তাঁর হিসেবে মোট লাবণ্যের যদি একশ নম্বর থেকে থাকে তাহলে লাবণ্যকে চিরে চিরে ভাগ করলে দাঁড়ায়ঃ যে দেখছে তার মনের কল্পনা ৫০, যে দেখছে তার চোখের ধাঁধাঁ ১৫, যে দেখছে তার বয়সের দোষ ১০, যাকে দেখছে তার চোখের কটাক্ষ ১০, মেদ-মজ্জার প্রকরণ ৮, রঙের প্রলেপ ৫, ভঙ্গিমার চাতুর্য ১, রূপবৈদগ্ধ্য, ½, দেহাবরণের চাকচিক্য ½।

অবিশ্যি আমি এতখানি নারীবিদ্বেষী নই। সাজগোজ করতে আমারও যে কোনকালে ভাল লাগত না এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলতে পারব না। তবে সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে ত। পুরুষের চোখে পড়ার চেয়ে আমি দেখেছি সাজ-পোশাকের কেরামতিটা মেয়েদের চোখেই বেশি পড়ে। বিয়েবাড়ির ভিড়ের গরমে ঘামতে ঘামতে দেখলাম দু-একটি প্রতিমার রঙ চটতে সুরু করেছে। পুরু পাউডারের প্রলেপকে ছাপিয়ে ঘাম যখন নামে তখন খানিকটা সেই মেয়ের আসল রং বেরিয়ে পড়ে—জায়গায় জায়গায় তখনো পাউডারের ছোপ থেকে গিয়ে সে যা মজাদার চেহারা দাঁড়ায় মুখের তা কি ওরা দেখতে পায় না? ওদের দশা দেখে হাসির চেয়ে কান্না পায় আমার, ভাবি যে, পুরুষজাত এদের দেখে মেয়ে জাতের ওপর কি ধারণা করবে!

সব মেয়েই দেখতে সুরূপা হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে বয়স-কালে প্রত্যেক মেয়েরই একটা শ্রী আছে যেটা তার নিজস্ব—সেটুকু পুঁজিও ফ্যালনা নয়। কিন্তু আমাদের এই যুগের হাওয়াটা এমন যে, স্বাস্থ্যের দিকটা ভুলে গিয়ে আমরা সবটুকু জোর দিই সৌন্দর্য প্রসাধন পারিপাট্যে। তার ফলে বয়সে একটু ভাঁটা পড়লে দেখা দেয় এনিমিয়া, লো-প্রেশার, সবার ওপর জরায়ুর জটলা ত থাকতেই হবে! যদি অল্পবয়সী মেয়েদের মুখে ব্রণ হয় তারা তখনই সেটা চাপা দেবার জন্যে ল্যাকটো-ক্যালামাইন বা ওই ধরনের ধামা-চাপা দেবার দাওয়াই ধরবে, ভুলেও ভাববে না যে, হজমের গোলমালটা বন্ধ করার দিকে নজর দেওয়াটা ক্যালামাইনের চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কর্তব্য।

সৌন্দর্য চর্চার দিকে নজরের, অর্থের, সময়ের সবটুকু খরচ না করে তার খানিকটা যদি স্বাস্থ্য চর্চায় প্রয়োগ করে ত সৌন্দর্য, ক্লান্তি সবকিছুই দীর্ঘ দিন বজায় রাখতে পারবে—এটুকু এরা কেন বোঝে না? কেন এরা গায়ে তেল মাখে না! কেন এরা সর ময়দা দিয়ে মুখ মাজে না!

আগে আগে সাজ-পোশাকের ঘটা ছিল কুমারী মেয়েদের বিয়ের তাগিদে, তাছাড়া তখন ঘরে ঘরে লেখাপড়া-শেখা মেয়ে ত থাকতো না। হয়তো বা তখনকার সাজ-গোজের বাড়াবাড়িকে অশিক্ষার অন্ধ কুরুচি বলে এড়িয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু আজকাল লেখাপড়া-শিখিয়ে মেয়েদের কেন এই রুচি-বিকার ঘটবে? আজকের দিনে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদি বলেন যে, এবছরে যুব-উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হোক, কেন না যুব-উৎসবের মাধ্যমে আমরা আশা করেছিলাম যে: ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিত হয়ে পরস্পরের ঐক্যের নৈকট্য, শিক্ষা-বিনিময়ের বিশেষ অন্তরঙ্গ ক্ষেত্র রচনায় পারগ হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্যের ধার কাছ দিয়ে যাচ্ছে না তারা। পরন্তু বিপরীত ফল দাঁড়াচ্ছে, মেয়েদের চটকদার বেশ-বিন্যাস, ঢং-ঢাং অল্পবয়সী ছেলেদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে: তাহলে? তাহলে কার ওপর ভরসা করবে তুমি বাসবদত্তা! পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ-কী সন্ন্যাসী! বিশ্বময় (বিশ্ববিদ্যালয় ময়!) দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

না, থাক অনেক করেছি নিজের জাতের নিন্দে—আর করব না। শুধু এইটুকু বলব যে, যে দেশের বেশির ভাগ মানুষ দু-বেলা দু-মুঠো পেটের অন্ন জোটাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছে সেই দেশে যারা শিক্ষিত-শিক্ষিতা হচ্ছে তাদের দায়িত্ববোধ কি স্ট্রাইক, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন ভাবে তৈরী করা যার ফলে পরীক্ষার হলে হল্লাবাজী অনিবার্য, প্রাদেশিক ভাষার প্রাধান্যের জন্যে মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, খুন করা আর পার্কে-ময়দানে বক্তৃতা দেওয়াতে সীমিত! তাদের কি মানুষের মতো মানুষ তৈরী করা দায়িত্ব নয়? আজ যে ভাইস-চ্যান্সেলারের মুখ থেকে মেয়েদের বেহায়াপনার নিন্দের বিষ উগরে উপছে পড়ছে

সেই ভাইস-চ্যান্সেলারের কি কর্তব্য নয় তাঁর তাঁবে যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলিতে যাতে যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা কায়েম হয় সেদিকে কড়া নজর দেওয়া !

জানি না, আমি সামান্য মেয়ে-মানুষ, তা-বড় দিক্‌পালেরা এই ধরণের কথা বলে ওপর-ওপর সমালোচনা করে কতটুকু কর্তব্য সম্পাদন করছেন। তুমি জানো ভগবান ?

এ-যুগ এমনই যুগ, যে আমলে মা নিজের সন্তানকে লোকের চোখের আড়ালে বছরের পর বছর লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। কেন ? না, ছটা ছেলেমেয়ে হয়েছে একথা জানলে কোনো বাড়িওয়ালা সে পরিবারকে ঘর ভাড়া দিতে রাজী হবে না। আর, ছ-ছটা ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে যে মেয়ে তাকে সমাজের সভ্য, শিক্ষিত মানুষেরা ছোট-চোখে দেখবে ! ছেলে-মেয়ে হওয়ার আগে যে মা বা যে বাবা এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি, তাদের বিবেচনা শক্তির কেউ প্রশংসা করবে না। তা বলে, এই রকম অবস্থায় তাদের পড়তে হচ্ছে, এ যে ভাবাই যায় না ! আমাদের দেশেও এই মার্কিনী হাওয়া আসছে। যাকে ঘরোয়াভাবে বলা যায় ধামা-চাপা দেওয়ার যুগ, যে সমাজে সত্যকে আড়ালে রেখে লোক-দেখানো ঠাট-ঠমক জাঁক-জমকই ফলাও করে দেখানোই সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা সে সমাজ কি আমাদেরও হবে ! হ্যাঁ, যন্ত্র-সভ্যতার এ-ই নাকি পরিণাম ! সত্যি, কি সর্বনেশে অবস্থা সেটা ভাবতে পারো ভগবান ?

আজ সকালে শ্রীমান নন্টু এক কাণ্ড করে বসেছে। ওর বাবা বাড়ি ফিরলে কথাটা বলতেই হবে। আমার বড় মেয়ে ওকে পাঠিয়েছিল, ওর ক্লাসের একটি মেয়ের কাছ থেকে একখানা বই আনবার জন্যে এই গলিতেই। শ্রীমান বই নিয়ে হাজির হল রিক্‌শায় চড়ে। আমাকে বলল—'দাও তো মা দুটো আনা !'

—কেন ?

'রিক্‌শাবালাকে দিতে হবে।'

ব্যাপার দেখে আমি হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই নে। কী সর্বনেশে ছেলে হয়েছে! গম্ভীর হয়ে বকুনী দিলাম খুব। তখন ও আস্তে আস্তে বলল—'খুব ইচ্ছে করল, আর ও লোকটা ত চুপচাপ বসেই ছিল। আমাকে ডেকে বলল, দু-আনা দিলে ও রিক্‌শা চড়াবে! সেদিন বিশুকাকা ত আট আনায় রিক্‌শা চড়েছিলেন। এ লোকটা কতো ভাল, মাত্তর দু আনা! না, মা?'

ছেলে ধরার ভয় দেখালাম, কিন্তু তাতে খুব যে ভয় পেল তা মনে হচ্ছে না। অবশেষে যখন বললাম—ঝুলনের পুতুল কেনার পয়সা বন্ধ। তখন কেঁদে ফেলল। তবে কথা দিয়েছে যে, আর এরকম কাজ সে করবে না, কখ্‌খনো না।

এ পাড়ার একদল ছেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দু-তিনবার এসে ফিরে গিয়েছিল। উনি যখন বাড়ি ঢুকলেন, ওরা সঙ্গে এল। কি ব্যাপার? উনি দেখলাম খুব জোরে জোরে কথা বলছেন। কি হয়েছে? আসাম। পাড়ার ছেলেরা ঠিক করেছে একটা কমিটি তৈরী করবে, তাতে ওঁকেও থাকতে হবে। উনি বললেন 'কি ভাবে কাজ করবে, সেটা আগে স্থির করো।'

'আজ্ঞে সে আমরা স্থির করে ফেলেছি। টাকা-পয়সা তুলব। পার্কে, পথের মোড়ে-মোড়ে মিটিং করব, পোস্টার শাঁটব, প্যাম্‌ফ্লেট ছড়াবো। তাতে একটা টেনশন তৈরী হবে।'

'টেন্‌শন! টেন্‌শন, এ্যাজিটেশন দিয়ে কোন্ উপকারটা হবে? যাদের ঘর জ্বলেছে, প্রাণ গিয়েছে তারা সেগুলো ফেরত পাবে?'

'আজ্ঞে, তাহলে আমরা অশোক সেনের মতো সেবা করব!'

'সেবা করতে হয় করো। সেবা-কার্যটার কোনো ব্র্যাণ্ড নেই। তা ছাড়া অশোক সেনের মতো সেবা করতে গেলে ত তাঁর মতো মন্ত্রীর গদী পেতে হবে। ভ্যাখো কি চমৎকার সেবার নমুনা। জুনের শেষ থেকে শুরু করে আগষ্টের প্রথম হপ্তা কাবার হতে চলেছে—দীর্ঘকাল

ধরে আমাদের আইনমন্ত্রী গভীর চিন্তায় সমাধিস্থ থেকে শেষে নবদ্বীপের নিমাই সেজে আসামীদের ফরিয়াদী বানাতে যাবার সংকল্প নিয়েছেন। এদিকে আইন-শৃঙ্খলা জাহান্নামে গেলেই বা কি যায় আসে! আর তোমরা তাল ঠুকছো টেন্‌শান বানাবে, এ্যাজিটেশন করবে! আমি এসবের মধ্যে নেই। বলি কি, বরং এক কাজ করো, আইন-মন্ত্রী অশোকবাবুর কেত্তনের দলে ভিড়ে পড়ো—একটা চাকরী-বাকরীও হয়তো জুটে যাবে আখেরে।'

ওরা শুকনো মুখে ফিরে গেল।

ওঁকে বললাম—বেচারাদের অমন কড়া কড়া কথাগুলো শোনাতে গেলে কেন!

উনি প্রায় ধমক দিলেন—'তুমি থামো। আমি ওদের কড়া কথা বলি নি। ওদের যেসব দাদারা তাতাচ্ছে, নাচাচ্ছে তাদের বলেছি। তারা হুজুগ চায়। নাম চায়। সামনের ইলেকশনে দাঁড়াবার জন্যে এখন থেকে তারা আসর গরম করছে। মাঝখান থেকে এই ছেলে-গুলোকে ক্ষেপিয়ে, এখানে' গোলমাল পাকানোর কোনো মানে হয়? পাড়াতুতো কমিটির হাতে টাকা-পয়সার দায়িত্ব! কে যে কোনখান থেকে কি মেরে দেবে তার ঠিক কি! আমি গরীব মানুষ, আমার যেটুকু সামর্থ্য সেটা সরকারী ফণ্ডে দিয়ে দেবো এই যেমন দিয়েছে চেতলা স্কুলের ছাত্ররা! আমাদের প্রত্যেকেরই এদিকে এগিয়ে আসা দরকার। তোমার-আমার মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে এর বেশি কিছু করার নেই।

'হ্যাঁ আছে, পলিটিক্যাল পার্টিদের। তা, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস স্বাধীনতা উৎসব বন্ধ করেছে, এটা খুব যোগ্য কাজ হয়েছে। ওই দিনে উৎসবের বদলে উদ্বাস্তু সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হোক। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো মন্ত্রীর হাওয়াই-সফরে কোনো কাজ হবে না। তিনি এবং তাঁর কাছাকাছি মর্যাদার পদস্থ ব্যক্তিরা উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে থাকুন। যতদিন পর্যন্ত এই সব এলাকার অবস্থা স্বাভাবিক না হচ্ছে ততদিন তাঁদের থাকতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাদের

ওপর রয়েছে তারা যদি দায়িত্বের মর্যাদায় খিলাফ হয়ে থাকে তবে তাদের শাস্তি দিতে হবে। এবং সে শাস্তি এমন হওয়া চাই যা দেখে এই ধরণের মনোভাবাপন্ন মানুষেরা অপরাধের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হবে। আসামের হাওয়ায় এখনো বিষের গলদ আছে—সেটা সম্পূর্ণ নির্মূল না করতে পারলে এই বিষ সারা ভারতে এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া আনবে, আজ না-হয়, দু-দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এ কথাটা এঁরা কেন বুঝছেন না? আসাম হল একটা বিশ্রী রোগের প্রথম লক্ষণ, এই অবস্থায় ধামাচাপা দিলে, এ ব্যাধি তলে তলে বিস্তার লাভ করবে তখন আমাদের বাঁচবার পথ নষ্ট হয়ে যাবে। দেশের এতবড় বিপদের সময় সব রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে যেতে হবে। কেন না, যখন আসামে সর্বনাশা কাণ্ডটা ঘটেছিল তখন দাঙ্গাবাজীর নেশায় অসমীয়া রাজনৈতিক বিবাদ ভুলে ছিল, তাই তারা এই টেনশন আর এ্যাজিটেশন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তারা যদি সর্বনেশে স্বার্থের খাতিরে ঐক্য সৃষ্টি করতে পেরে থাকে ত, বাকী ভারতবর্ষের বাছাবাছা মাথাগুলো সংগঠন সংস্কার আর পুনর্বাসনের জন্য এক হতে পারবে না কেন?'

২৮

আজ একটি মেয়ের কথা বলব তোমায় ভগবান। পার তো মেয়েটির মাথার দোষটুকু যাতে সেরে যায় সে ব্যবস্থা কর। না, না, পার তো বলে তোমায় ছোট করছি কেন! তুমি ইচ্ছে করলেই পারো—এটা তোমায় করতেই হবে। অনেকদিন আগে, আজ থেকে ধরো বিশ বছর আগে যিনি একেবারে হারিয়ে গিয়েছিলেন —তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। না, মাত্র এটুকুই নয়—ওই বয়সে তাঁর কণ্ঠ, বড় বড় নামজাদা ওস্তাদদের খ্যাতিকে অনায়াসেই ম্লান করে দিত। খেয়ালে ইনি বাদল খাঁ-র ছাত্রী, আর ঠুংরীতে জমিরুদ্দিন খাঁর ছাত্রী। সে সময় এঁর নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরত। এক-এক রাতের মুজরোতে হাজার টাকা (তখনকার দিনে) ত পেতেনই। হঠাৎ নিরুদ্দেশ।

তারপর আর তাঁর খবর কেউ জানে না। সবাই ধরে নিয়েছিল তিনি মারা গেছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে একজন সমঝদার এক প্রৌঢ়া পাগলী পথের ভিখারিণীকে গভীর রাতে একা-একা গাইতে শুনে থমকে দাঁড়ালেন। এ ত যে-সে পাগল নয়। ওস্তাদী ঘরানার সঙ্গে ভদ্রলোকের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই সেই পাগলীকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বেশ কিছু দিন ধরে চিকিৎসাপত্র করানোর পর এখন মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছেন ভদ্রমহিলা। এখনো গান করেন। এপাড়ায় সেদিন ওঁকে এক বাড়িতে আনা হয়েছিল। গাইবার সময় মনেই হয় না যে মহিলার মাথার কোনো দোষ

আছে। অপূর্ব সে গান। আমি গানের কিছু বুঝি না, তবে শুনে মুগ্ধ হতে পারি, সে মন আমার আছে। যাঁরা গান বোঝেন তাঁরা বললেন 'এসব জিনিস এর পর আর থাকবে না। আশ্চর্য-আশ্চর্য!' গান-ছাড়া অন্য সময়ে কিন্তু ওই মহিলার চোখ দুটো দেখলে বোঝা যায় যে স্বাভাবিক নয়। যে ভদ্রলোক এঁকে কুড়িয়ে এনেছেন তিনি বাঙালী নন, হিন্দুও নন। তাঁর এখন চেষ্টা ভদ্রমহিলাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা। আজকের দিনেও এমন মানুষ আমাদের এই দেশেই রয়েছে, যাঁরা গুণকে বড় বলে বিশ্বাস করেন, মর্যাদা দিতে পারেন। দেখে ভালো লাগে, ভেবেও আনন্দ পাই। তাই সেই অবাঙ্গালী, অহিন্দু মানুষটির সঙ্গে আমারও প্রার্থনাটুকু যোগ করে তোমার দরবারে পাঠাচ্ছি।

দুদিন আগে তোমাকে আসামের ব্যাপারে যে-কথা বলেছিলাম, না-না আমি নিজে ত অতোখানি তলিয়ে দেশের রাজনীতির গতি বুঝিনে। তাই আমার স্বামী যা বলেছেন সেটাই তোমাকে জানিয়েছি- দেখছি সেই পথেই কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা শুরু করেছেন। নয়জন পার্লামেন্টের সদস্যকে আসামের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার জন্য পাঠানো স্থির হয়েছে। ভালো কথা, তবে তাঁরা যদি আসামে গিয়ে 'কণ্ডাকটেড ট্যুর'-এর ওপর ভরসা করেন তাহলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ওই ছ্যাখো, তোমায় চিঠি লিখতে লিখতে খেয়ালই ছিল না যে, হঠাৎ আকাশের মুখে আঁধার নেমেছে। যাই, আজ আবার বালিশের ওয়াড়-টোয়াড় সব সেদ্ধ করা হয়েছে, ধোপা আসছে না দিন পনেরো, তাই ওঁর জামা-কাপড়ও কেচেছি,—সেগুলো শুকোতে দিয়েছিলাম উঠোনে, তুলতে হবে। এখন আসি আজ।

'আনন্দময়ীর আগমনে গিয়েছে দেশ ছেয়ে!' সে কোন দেশ ভগবান? আমাদের এই দেশ? যেখানে গ্রাম ছেড়ে শহরে-শহরে

মানুষ দৌড়ে আসে পয়সা রোজগারের জন্যে। ছোট শহর থেকে মানুষ ছোটে বড় শহরে—বড় বড় শহরের কারবারীরা পাল্লা দিয়ে দিল্লী চলে। কী জিগিরই দিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র 'দিল্লী চলো'। যাদের দৌড় দিল্লী ছাড়িয়ে তুনিয়ার দিকবিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তারা উড়ে যায় বাহির বিশ্বের বৃহৎ সমুদ্রে—সে সমুদ্র আকাশে, সে সমুদ্র দরিয়ায়, সে সমুদ্র তাদের আশেপাশে। কিন্তু সেই বাইরের তুনিয়ায় যারা যেতে পারে না, যাদের কাছে দিল্লী কেন, কলকাতাও অনেক দূর তাদের কি অবস্থা? না, আমি কোনো নিন্দের গ্লানি মনে নিয়ে আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসি নি ভগবান। তবু একথা মনে না হয়ে যায় না যে, আজকের এই যে বাঁচা এটা যেন আমাদের সকলের কাছে মরে-মরে বেঁচে যাওয়া। এই যে বিরাট দেশের কোটি কোটি মানুষের মহাসমুদ্র প্রতি মুহূর্তের তুঃখ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্যের তুলুনির মধ্য দিয়ে বেঁচে চলেছে এই বাঁচাটা আমার কাছে এক বিরাট রহস্যময় বিস্ময় মনে হয়। আমি এই অসংখ্য জনের মধ্যে একটি সংখ্যা হিসেবে নিজেকে দেখতে গিয়ে টের পাই কতো অসহায়, কতো সামান্য, কী নগণ্য আমার এই অস্তিত্ব। কিন্তু যখনই আমি নিজেকে একটু ছড়িয়ে দিই, দিয়ে দেখি—আমার স্বামী, আমার সংসার, আমার পাড়া, আরও একটু মনের প্রসারতা বাড়ালে পাই আমার এই কলকাতা শহরকে, পাই আমার বাংলাদেশকে। ভারতবর্ষকে ভাবতে গেলে আমাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। তবু সেটা কল্পনা দিয়ে আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি পারি নে। তখনই তোমাকে ডাকি, হে বিশ্ববিধাতা তুমি দেখো আমরা সবাই, সবাই মানে এই পৃথিবীর মানুষেরা, যেন তোমার আশ্রয়স্নেহে সুখ, শান্তি, সব পাই। ভগবান, রাগ যদি না করো তাহলে একটা কথা বলি। তোমাকে যেন বড্ড বেশি বড় মনে হয়। তার চেয়ে বিশ্বজননীকে ঘরোয়া গিন্নী-বান্নী আপন-আপন ভাবাটা অনেকখানি সহজ!

তাই তুর্গা যখন তুর্গতিবিনাশের বরাভয় নিয়ে আসেন, তখন শান্তি

স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়ার আমেজে মনটা জুড়োয়। আনন্দময়ীর আগমনে এ পাড়ার ভিখারীরা কেউ আগমনী গায় না, অন্তত: আমার কানে এবছরে (এক রেডিও ছাড়া) আগমনী গানের সুর এসে পৌঁছোয় নি। যে সব ডাক কানে রোজ আসে তা হল 'বাসন লেবে গা', 'ঘুটে চাই ঘুঁটে', 'কাপ্‌ড়ে বালা...', 'দয়া করো মা ', রাতে কুকুরের ডাক আর দিনরাত যখন-তখন মুদিখানার বুড়ো লালার 'এ রাধেোয়া-- রাধেোয়া রে-এ' —এ ছাড়া মাঝেসাঝে ডিমওয়ালা-ফলওয়ালা, 'ইলেকটি্‌ক সাপ্লাই-এর মিটারটা দেখব',—ওই যাঃ কাণ্ড দেখেচ, চাঁদা সাধার দলের তাগাদার ডাকের কথাটা বলাই হয় নি। এ শহরের এই পল্লীতে মায়ের আগমনের খবর তেমন-ভাবে এ বছরে টেরই পেলাম না।

অবিশ্যি ছেলেমেয়েদের মনে যে আনন্দের দোলা লেগেছে এটুকু টের পাচ্ছি। ওরা পরীক্ষা কাবারের পর রোজ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে জুতোর ছবি ছ্যাখে আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, কে কোন্‌টা নেবে। বড় মেয়ে সেদিন কার হাতে 'মুঘলে আজম' চুড়ি দেখে এসেছে—তা-ই ওর চাই। আর নন্টু মুহুর্মুহু খবর দিচ্ছে যথাশক্তির প্রতিমায় কি কি পরিবর্তন এসেছে। আসলে আমি আনন্দের মনটা হারিয়ে ফেলেছি: আমার কাছে সরকারী চাকুরে রাজেশ্বর চাটুয্যের আত্মহত্যার খবরটা বড় হয়ে দেখা দেয়। যে লোকটা সরকারী নিয়ম না-মানার জন্য সাসপেণ্ডেড হয়ে সংসারে চলবার পথ হারালো, স্ত্রী আর সন্তানদের দুঃখদুর্দশা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে পালালো, আত্মহত্যাকে নিষ্কৃতির মোক্ষ হিসেবে বেছে নিল সে লোকটার বিধবা আর সন্তানদের দিকেই আমি ঝুঁকে পড়ি। আমার তখনই মনে হয় আমরা, মানুষেরা কতো বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি--নইলে, যদি পরের কথাটা একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখতাম, ভাবতাম, তাহলে অন্ধকার এইভাবে আমাদের গ্রাস করতে পারতো না।

অতো কথায় দরকার নেই, তুমি ছ্যাখো না এক-একটি নজির

তোমার সামনে হাজির করি তাহলেই বুঝবে আমরা কিরকম স্বার্থ-কেন্দ্রিক বা আত্মকেন্দ্রিক হয়েছি।

আমার এক ভাই ; চাকরীর জন্যে তার বি-কম-এর মার্কশীট দরকার। ১৯৫২তে সে পরীক্ষা দিয়েছিল। মার্কশীটের জন্যে ৯ সেপ্টেম্বর সে বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা জমা দিল। দশদিন পরে তার সেই মার্কশীট পাওয়ার কথা আইনতঃ, কিন্তু আজ মাসের চব্বিশ তারিখ হয়ে গেল সেটা সে আজও পেল না। কেরানীবাবুদের নাকি ভীষণ কাজের চাপ তাঁরা পূজোর ছুটির আগে ছুটো ঝামেলা পোহাতে পারবেন না। অথচ এই মার্কশীটের ওপর একটা গোটা পরিবারের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে --একথা তাঁদের বিবেকে ঘা মেরেও বোঝানো যাবে না।

তুমি বলবে যে, আমার ভাইয়ের স্বার্থে ঘা লেগেছে বলে এটা আমার কাছে এত বড় মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি নিজেকে দিয়ে আমাদের সবারই দশা বুঝতে পারছি।

আর একটা ব্যাপার খ্যাখো, সামনের অক্টোবর মাস থেকে দশমিক ওজন চালু হবার কথা ছিল। একটু বাঁচোয়া তা চালু হচ্ছে না। আজ না-হোক ছুদিন বাদে হবেই। দশমিকের একটা ধাক্কা নয়া পয়সার ব্যাপারে এতদিন পুইয়েছি আমরা, এবার বাজারের ওজনের ওপর সেই দশমিক প্রথা চালু হবে। তার জন্যে যা তুর্ভোগ সে ত কপালে মজুত রইলই। কিন্তু আপাততঃ এ প্রথা কেন চালু হল না তা জানো ? ওজনের বাটখারা সরবরাহ করবার জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, তারা সরকারী বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে অনেক বেশি দাম হাঁকছে বলে খরিদ্দার, ব্যবসায়ীরা বাটখারা কিনতে পারছে না। যে ওজন বাটখারার দাম হওয়ার কথা পঁয়শট্টি টাকা তার দাম নিচ্ছে একশ টাকা। সরকার এখন আইন জারী করুক, তারপর লাইসেন্স পাওয়া প্রতিষ্ঠানেরা সিধে হয়ে কম দামে বাটখারা বেচবে। অথচ শুনলাম যে, এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য রাজ্যে কম দামে দশমিকের বাটখারা বিক্রী হচ্ছে। নতুন ওজনের ওই দামী বাটখারা আমাদের

বুড়ি মাছওয়ালী কেনবার পয়সা পাবে কোথায় ?···আগে আগে আইন-কানুন নিয়ম সবকিছুই মোটামুটি সাধারণ মানুষের দিকে নজর রেখে তৈরী হতো। তাদের সুবিধে-সুযোগের কথাটা আগে চিন্তা করা হতো। কিন্তু এখন আইনটা আগে তৈরী করে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমাদের এইভাবে চলতে হবে! ফাইল মাফিক মানুষ চলুক—মানুষের সুবিধে অসুবিধে ভাবার দায়টা সম্পর্কে ঔদাসীন্য সরকার থেকে সংক্রমিত হয়ে সাধারণ সকলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। তা যদি না হত তবে রাজেশ্বর চাটুয্যেকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হত না। রাজ্যেশ্বর এখানে একটি প্রতীক তার মতো আরো কতো মানুষ এই ধরণের অবিচারের ধকলে ভুগে মরছে তা কে বলতে পারে!

অথচ পৃথিবীটা এরকম ভাবে চলার কথা নয়। মানুষ বাঁচুক, সবাই বাঁচুক--এটাই ত সব মানুষের মনের কথা হবে!

খবরের কাগজে ক'দিন ধরে এই একটি অপমৃত্যুর খবর যেন আমার মনের সব আলো, সব আনন্দ নিংড়ে কেড়ে নিয়েছে, তাই ভগবান তোমার কাছে আবোল-তাবোল ভাষায় মনের দুঃখ জানালাম, আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

এবার আমাদের কোথাও নড়াচড়া হবে না। ছুটি ত মোটে চারদিন। উনি ঠাট্টা করে বললেন—'কনশেসনে কাশ্মীর ঘুরে আসার ব্যবস্থা করা গেছে। বুঝলে, ট্যুরিস্ট ব্যুরো থেকে একখানা চমৎকার ছবিওয়ালা বই এনেছি--হোল্ ফ্যামিলি সেই ছবিগুলো বসে বসে দেখা যাবে। ছেলেমেয়েদের জুতো জামাতে যা খরচা গেল!'

আমি বললাম—বিনিপয়সার ওপর কাজ গুছোলে চলবে না। দু-চারখানা পুজো সংখ্যা অন্ততঃ কেনো। তবু গল্প-উপন্যাসগুলো পড়া যাবে।

--তা মন্দ বলো নি। পুজো সংখ্যা অন্ততঃ বইয়ের চেয়ে দামে সস্তা।

সস্তার কথায় মনে পড়ল, সামনের বছরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে পঁচাত্তর টাকাতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাবলী কিনতে পারা যাবে। ওঁকে বললাম যেমন করে হোক ওটা আমাদের একখানা কিনতেই হবে। এখন থেকে টাকা জমানো চাই।

উনি হাসলেন, বললেন—'দাঁড়াও বই ত বেশি ছাপা হবে না। আর তোমার মতো সবাই ভাবছে ওই বই কেনার কথা। অন্যদিকে কারবারী শকুনেরা ওৎ পেতে থাকবে, তারা পাইকারীভাবে গ্রাস করবে যতগুলো পারে। তারপর ব্ল্যাকমার্কেটে ওই বই কি দামে বিক্রী হবে দেখো। আমাদের যা দেশ, তাতে জনসাধারণের জন্যে যতো ভালো ভালো পরিকল্পনা ফাঁদা হয়েছে তার সবই বানচাল করে দিয়েছে চারশো-বিশ বাবুরা!'

ওঁর কথায় ধোকা লাগল। তবু বললাম—না, বইয়ের ব্যাপারে অন্ততঃ এটা হবে না।

'তুমি কি বলছ? কিশলয়ের কথা মনে পড়ছে না।'

আমাদের কথার মাঝে নন্টু আর বোল্টু এসে বাধা দিল, ওদের একটি আর্জি আছে, পূজোর ক'দিন ত কলকাতার মধ্যে কোনো জায়গায় শান্তিতে ঠাকুর দেখা যাবে না—তাই আজ উনি ওদের নিয়ে বেরুবেন যতগুলো পারা যাবে প্রতিমা দর্শন করিয়ে আনবেন। ওদের চোখেমুখে খুশি ঝলমল করছে। ওইদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে আনন্দময়ীর আগমনে ওই ওদের দেশই আনন্দে ভেসেছে! আমরা যারা বড় হয়েছি যাদের মনের মধ্যে বিস্তর ছোট ছোট ঘর তারা সেই আনন্দলোকের সন্ধান আর বুঝি পাবে না আমাদের দেশে। ওই ওদের দিকে তাকিয়ে আনন্দের স্বাদ পেতে হবে আমাদের।

পঞ্জিকার পাতায় চোখ পড়তে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল জানো ভগবান, পণ্ডিতেরা লিখেছেন দেবীর ঘোটকে আগমন, ফল ছত্রভঙ্গ! মনে মনে আশঙ্কার শূল বিঁধেছিল। আসামের অত্যাচার ছত্রভঙ্গের চরম নমুনাই বটে। আজ এই পবিত্র দুর্গা সপ্তমীর দিনে ওসব কথা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টাই করছি। আকাশে যে দুর্যোগের চিহ্ন আঁকা, তাতে ভালোয় ভালোয় মায়ের পূজোর ক'টা দিন পার হলে বাঁচি।

উনি মনমরা হয়ে ঘরে বসে রয়েছেন। ওঁর যারা প্রিয় বন্ধু তাঁরা কেউ সিমলে গিয়েছেন, কেউ গেছেন বালুরঘাট, কাশ্মীরেও একটা দল গতকাল রওনা হয়েছে। আমার স্বামীর মনে মনে কাশ্মীর দেখার বড় শখ। উনি আমাকে না জানিয়ে বন্ধুর কাছে মাসে মাসে দশ টাকা করে জমা রেখে দিতেন, কাল হঠাৎ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বললেন 'এই নাও!'

অবাক্ হয়ে বলি, এ আবার কোথা থেকে পেলে?

বললেন 'কাশ্মীর ব্যাঙ্ক-এ জমা ছিল মহিমের কাছে। তা, পঞ্চাশ টাকায় ত কাশ্মীর হয় না! পূজোর বাজারে তোমার কাজেই লাগুক।'

...বেচারী! সংসারের আখমাড়াই কল, ওঁর সব সাধে বাদ সেধেছে। দুঃখ হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই, আমিই বা কি করতে পারি? শুধু শুধু নিজেকে অপরাধী করেও কোনো লাভ নেই। আমারই কি

সব সাধ মেটে ? অবিশ্যি আমার সাধের গণ্ডীকে আগে থেকে গুটিয়ে ফেলেছি বলেই হয়তো নিজের সুখ-সাধ বলে তেমন কিছু নেই।

পাড়ার বারোয়ারীর এটা রজত-জয়ন্তী বর্ষ। সেইজন্যে এবারে বাড়তি ধুমধামের আয়োজন। পঁচিশ বছর ধরে এই পূজো হয়ে আসছে। ছোট্ট পল্লী। মাঝে এর মধ্যে দলাদলিও ঢুকে পড়েছিল, আলাদা আরও একটা পূজো হত। এখন অবিশ্যি সেই মনোমালিন্য ঘুচে গেছে, একটাই বারোয়ারী এবং পূজোটা সত্যিই সার্বজনীন। মাইকের উপদ্রবও নেই। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি, ফটোগ্রাফ আর হাতের কাজ দিয়ে ছোট্ট একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়েছে। ছোটদের মধ্যে মহা উৎসাহ। নণ্টুবাবু, বোল্টুবাবু সবাই ভলান্টিয়ার। বোল্টু ওরই মধ্যে একটু বেশি মাতব্বরী করছে। মেয়েরা পূজোতলা থেকে ঘুরে এসে খুব হাসাহাসি! কি হয়েছে রে ?

ক্ষমা বলল—'আর বলো না মা! বোল্টু এমন ভলান্টিয়ারী করছে যে, আমাদের বলে, খুকী দঁড়িতে হাত দিয়ো না লাইনের এপার দিয়ে যাও! ওদিকে প্যাণ্টের বোতাম খোলা। আমি সেকথা বলতেই খুব ক্ষেপে গেছে।'

বিকেলবেলা নণ্টু একটু সকাল সকাল বাড়ি চলে এল। দেখে আমি অবাক্। জিজ্ঞেস করতে বলল 'ভাল লাগছিল না। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। চলো না মা, তুমি দেখবে।'

আসল কথাটা একটু পরে টের পেলাম। নণ্টুর ভলান্টিয়ারীর ব্যাজ দেখে একটি বাচ্চা মেয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছিল, তারও ব্যাজ চাই। তা নণ্টু ব্যাজ খুলে মেয়েটির ফ্রকে এঁটে দিয়েছে। এতে ওদের ক্ষুদে ভলান্টিয়ার-কর্তা চটে গিয়ে, বরখাস্ত করেছে নণ্টুকে। নণ্টুর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি—'পূজোর দিনে ছেলেমানুষ কাঁদবে—সেটা বুঝি ভালো লাগে ? তুমিই বলো মা।'

পূজোর সময়, আজ নতুন নয়, 'অনেক বছর ধরেই দেখি, মনে কেমন

যেন একটা দুঃখের ভার আমাকে বিষণ্ণ করে রাখে। অন্য সবাই আনন্দ করে। আমিও যে দলে পড়ে ঠাকুর দেখতে না বেরিয়েছি তা নয় তবু থেকে থেকে কান্না গুম্‌রে ওঠে বুকের ভেতরে। সে কান্নায় অশ্রু ঝরে না, শুকনো দম আটকে আসার মতো একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। আজকাল অবিশ্যি ভিড়ের ভয়ে পাড়ার আশপাশ ছাড়া ঠাকুর দেখতে বেরুই না। এর ওর মুখে ঠাকুর দেখার গল্প শুনি। এই বেলারা কাদের একখানা জীপ জোগাড় করে ফায়ারব্রিগেড, সঙ্ঘশ্রী, বিডন স্কোয়ার আরও কতো কতো ঠাকুর দেখে এলো।

তার মধ্যে বেলার মতে বিডন স্কোয়ারের ঠাকুরই নাকি সবচেয়ে ভালো হয়েছে। পুরণো আমলের ঢঙে এই ঠাকুরের পরিকল্পনা। আরও কতো কতো বিবরণ যে দিল আমার ঠিক মনে পড়ছে না। রোজই খবরের কাগজ খুলে ডজন-ডজন প্রতিমার ফোটোগ্রাফ দেখি। দেখে দেখে একটা কথা মনে হয়েছে, তোমাকে চুপি চুপি বলি আচ্ছা মা দুর্গাও কি ফিল্মষ্টারদের মতো নানা জায়গায় এক-এক রকম পোজ নিয়ে হাজির হয়েছেন?

ওঁর এক বন্ধু নিজে কস্মিনকালে সোজা করে রেখা টানতে পারেন না কিন্তু শিল্প সমঝ্‌দারীর নাকি ঝানু বুঝদার। তিনি রায় দিলেন হঠাৎ—'আমার ত মনে হয়। আজকাল যেসব প্রতিমা এখান-ওখানে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে বেশ কিছু কিছু উঁচুদরের আর্টের নজির। আমাদের সরকারের উচিত এর ভেতর থেকে বাছাই করে অন্ততঃ হাফ এ ডজন্ কিনে নিয়ে ন্যাশনাল মিউজিয়মে রেখে দেওয়া; তা ত করবে না—'

উনি বললেন—'কয়েক বছর আগে আমি শুনেছিলাম যে, আশুতোষ মিউজিয়মে এই প্রথা চালু হয়েছিল—'সরস্বতী প্রতিমা' কিনে রাখা হতো। কিন্তু শেষে আর জায়গায় কুলোয় না দেখে—। আসলে আমাদের এই প্রতিমা গড়া আর পূজোর পর বিসর্জন দেওয়ার পিছনে যে দার্শনিক মনোভাব কাজ করে সেটুকু যদি অনুধাবন করা যায়

তাহলে দেখবে যে আর্টের নজিরকে মিউজিয়ামে এভাবে রাখার কোনো দরকার নেই।'

সমঝদার মশাই বললেন—'তোমার ওই ফিলজফি আমার জানা আছে। তুমি বলবে, সবই অনিত্য '

উনি বাধা দিয়ে মাথা নাড়লেন—'উঁহুঁ! আমাদের হিন্দু ফিলজফির বাস্তব দিকটাও কম পুষ্ট নয়। ধরো এই সব প্রতিমা, যা গড়তে অনেক টাকা খরচ হয়েছে সেগুলো যদি ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে না দিয়ে সবাই ঘরে রেখে দেয়, তাহলে নতুন ঠাকুর গড়ার দরকার কতো কমে যাবে। তখন এই সব মৃত্তিকার আর তাদের পরিজনরা কি করবে? তাহলে তাদের ত পেট চালাতে গেলে, বাঁচতে গেলে অন্য বৃত্তি নিতে হবে? তাতে তাদের এই বিশেষ গুণপনার দিকটা ক্রমে নষ্ট হতে বাধ্য। সামাজিক দিক দিয়ে এই পূজো পার্বণের আসল ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায় সেটা ভক্তির চেয়ে কম দামী কিছু নয়।'

ওঁর এই বন্ধুর অনুরোধের চাপে পড়েই আমরা নবমীর দুপুরে পাড়ার বাইরে ঠাকুর দেখতে বেরুলাম। কলকাতা সহরের হরেক রকম ঠাকুর দেখার মতলবে নয়, বসুমল্লিকদের বাড়ির পূজো দেখতে। পুরনো আমলের বিরাট বাড়িঃ শরীকে শরীকে টুকরোটাকরা হয়ে গিয়েও যা রয়েছে তা-ই আমার মতো মানুষের চোখে আলাদীনের দৌলতখানা। পূজো-মণ্ডপের চত্বর হোমের ধোঁয়ায় ভরপুর ভুর্‌ভুর্। ওরই মধ্যে এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের ইংরাজ আনুগত্যের নজীর সব ঢাল-তলোয়ার সাজানো—রাজা খেতাব আর এই উপহারগুলি আমার কাছে আজব, অদ্ভুত লাগে।

প্রতিমার টানা-টানা চোখ আর সেকেলে ঢঙের মুখের আদল ভারি মিষ্টি লাগল। প্রণাম করবার সময় মনে গভীর তৃপ্তির স্বাদ পেলাম। যেটা আমাদের পাড়ার বারোয়ারীর মূর্তির মধ্যে খুঁজে পাই নি সেটুকু যেন এখানে আপনিই ধ্যানে এল। রাজেনবাবু নিজে আমাদের অনেক আদর যত্ন করলেন। ওপরতলায় নাচঘরে পুরনো কতো ছবি রয়েছে,

ঝাড়লণ্ঠনগুলো ঝুলছে, তাতে এখন মোমবাতির বদলে নীচে ইলেকট্রিক বাল্ব লাগানো। রাজেনবাবুর মা পুজোর কাজে খুব ব্যস্ত,—ওরই মধ্যে এত ভালো ভাবে কথা বললেন যে তাতেই খুশির আনন্দ পেলাম। আসলে হুটো মিষ্টি কথা, একটু আপন-করা ব্যবহার এসব দিয়ে যেমন মানুষের মনকে জয় করা যায় তেমনটি আর কিছুতে নয়, এটুকু হয়তো এঁরা বোঝেন। বারোয়ারীর ব্যাপারে এই আন্তরিক বিশিষ্টতা ত মেলে না।

ফিরতি পথে বসু মল্লিকদেরই হয়তো আর এক শরীকের বাড়ির প্রতিমা পথ থেকে দেখে ভালো লাগলো তাই ভেতরে ঢুকলাম—প্রতিমার ডাকের সাজ আজকাল চোখেই পড়ে না, কাছে গিয়ে বুঝলাম ওই সাজই আমাকে কাছে ডেকেছে। ছোটবেলার চাপাপড়া স্মৃতি থেকে অনেক টুকরো ঘটনা কথা কয়ে উঠল আমার ভেতরে। কিন্তু এ কী, প্রতিমার কাছে, বা আশপাশে একটিও মানুষ ত দেখছি না! এখানে কে কার পুজো করছে? কান্না চেপে বেরিয়ে এলাম. মনে মনে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

সেদিন রাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বুঝি বা বিজয়া দশমীর বিদায়-বেদনাই মেঘলোক থেকে জলের ধারায় ঝরে পড়ছে। সে কী বৃষ্টি!

দশমীর সকালে শুনি বীরেশ্বরবাবুর ছোট ছেলেটি কাল রাতে ফিরতে পারে নি। ঠাকুর দেখার ঝোঁকে কালীঘাটে গিয়ে পড়েছিল, সেখান থেকে বুদ্ধি করে ফোনে খবর দিয়েছে তাই রক্ষে। এ পাড়ায় সকাল এল বন্যার প্লাবন নিয়ে। বাস বন্ধ!

নারকেলের যা দাম, তার চেয়ে চিনির আরো বেশি। তাই বুদ্ধি করে জিভে-গজা আর বরবটির ঘুগনী করে রাখলাম। রান্নাঘরেই হুপুরটা কাটলো। উনি বাজারের খাবার কেনার বিরোধী, আর তাতে খরচও বেশি পড়ে। তা ছাড়া কেনা খাবার হাতে করে ধরে দিয়ে যেন

তৃপ্তি পাই না আমি। ওতে হাতের ছোঁয়াটুকুই সব, অন্তরের ছোঁয়া নেই-নেই মনে হয়, আমার নিজের হাতে তৈরী জিনিষ প্রিয়জনের সামনে হাজির করার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। অবিশ্যি বিকেলের দিকে সারাদিন আগুন তাতে থাকার দরুণ মাথাটা কিছু ধরেছে, তা ধরুক—ওঁর, ছেলেমেয়েদের, আমার চেনা-জানা মানুষকে ত গোঁজামিল দেওয়া আপ্যায়ন করতে হবে না।

সারা বছর ধরে যে দুর্গাপুজোর দিকে মনটা আশা করে চেয়ে থাকে আজ সেটা ফুরোলো। আশা নাকি ফুরোয় না, তাই মানুষ বাঁচে। বিজয়া দশমী দুর্গতিনাশিনী দুর্গার বিজয়োৎসব, কিন্তু পূজো ফুরিয়ে বিসর্জনের মধ্যে এমন একটা শূন্য-শূন্য অনুভূতি মনকে অবসন্ন করে রাখে যে আমরা বিজয়াতে আনন্দের চেয়ে বেদনাই বেশি বোধ করি। তবে সেটাও চাপা পড়ে যায় যখন প্রিয়জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে।

আজ আর কোথাও নড়াচড়া করা যাবে না। তবে কাল থেকে আমাদের বিজয়ার নমস্কার-যাত্রা শুরু হবে। আর ওঁকে তাগিদ দিতে হবে—ওগো বিজয়ার চিঠিগুলো সব লেখো, তোমার লেখা না হলে সেই সঙ্গে আমাকেও যে অপরাধী হতে হবে।

পঞ্জিকায় লিখছে দেবীর দোলায় গমন: ফল মড়ক! কি জানি ভবিষ্যতের গর্ভে আবার কি দুঃখের ইতিহাস তৈরী হচ্ছে!

এক নাগাড়ে কদিন বিজয়ার প্রণাম, নমস্কার, আশীর্বাদের অনবরত ঢেউ লেগে আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক দিনযাত্রা যেন তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেছে। সকাল-তুপুর-বিকেল-সন্ধ্যে সব সময়ই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি কেউ এল, ওই হয়তো কড়া নাড়ছে কে! আর যখনই হাত একটু ফাঁকা হয়েছে, তু-দণ্ড নিজের মনে বসে আছি অমনি মনে পড়ে যায়—নিমাই বাবুদের বাড়ি বিজয়া সারতে যাওয়া হয় নি, যোগেশরা প্রত্যেকবার একাদশীতে আসে এবার এখনো এলো না কেন? ভালো-মন্দ কিছু হয় নি ত ওদের! সুনীল ঠাকুরপো দশমীর দিনই 'বৌদি বৌদি' করে বাড়ি মাথায় তোলে তারও পাত্তা নেই!—অবিশ্যি সে সদ্য বিয়ে করেছে—তার কাছে আগের মতো ব্যবহার আশা করা চলে না।

কিন্তু জবা পাড়ারমুখীর ব্যাভারটা কেমনতর! রবিবার ত ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন খুব বড়ো-মুখ করে বললো, 'না, না, দিদি-ভাই তোমরা কেন বাড়ি বয়ে এসে পেন্নাম নেবে? আমি গিয়ে তোমাদের প্রণাম করে আসবো।' তা সে আজও আসছে কালও আসছে! এদিকে আমার নাড়ুর স্টক কাবার হয়ে গেছে। কাল ক্ষীরের লুচি করেছিলাম—তার অর্ধেক ত ছেলেমেয়ে আর তাদের পূর্বপুরুষের কৃপাতেই কাবার হয়েছে।

পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল: অবিশ্যি শুধুই গেল না; তাদের পার্বণীর কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল। একটা টাকা জীইয়ে রেখেছিলাম। হাতে পেয়ে খুব খুশী। দেখেই বোঝা যায় ভদ্রঘরের ছেলে। তু-চার

কথার পরেই সুখদুঃখের পসরা মেলে বসল। সুখের কথা এমনিতে কেউ কাউকে বলে না। সুখের স্বাদ পেলে যেন দুঃখের কথাগুলোই ঠেলা মেরে বাইরে বেরিয়ে আসে।—তা-ই হল। লোকটি বলল—'জানেন না দিদিমণি—এই পার্বণীর টাকা আমাদের তিন ভাগে বাঁটা হবে। তা যদি আপনার মতো সববাই কিছু কিছু করে দিতেন তবু টোটালে গিয়ে মন্দ দাঁড়াত না। সেটি আর আজকাল হবার জো নেই। কেউ বলে, খেতেই কুলোয় না তা পরকে কি দিই।—তাদের কারুর বাড়িতে গাড়ি আছে, কোন বাড়িতে বা চার-পাঁচজন চাকরি করে, কেউ ডাক্তার—এমনি সব না-খেতে-পাওয়ার নমুনা। যাক, আমরা পিওন। হরদম আমাদেরই হাত দিয়ে চিঠি, টাকা সবকিছু আসছে, তাতে অবস্থা যে কার কি রকম খানিকটা ত টের পেতে বাকী নেই। বকশিসই বলুন আর পার্বণীই বলুন, সেটা খুশির ব্যাপার। তা নিয়ে ত বেশি আবদার সাজে না। আর তা দিয়েই কি আমাদের অভাব ঘুচবে! কিছু বলা মানেই চাকরিতে টান-পড়া—জানেন না দিদিমণি, এবারের স্ট্রাইকের পর থেকে আমাদের সবারই মনে ভয় ঢুকে গেছে। এর মধ্যে একজন রীতিমত লেখাপড়া জানা লীডার, বকশীসের কথা মুখে উচ্চারণ করতেই তেড়ে এলেন, কেন মাইনে পাও না?—এসব বে-আইনী উঞ্ছবৃত্তি দেশটাকে গোল্লায় পাঠাবে! ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা তাবৎ ভাষায় যাচ্ছেতাই করলেন। কবে কোথায় কোন্ বদমায়েসদের কারসাজিতে চিঠিগুলো বাড়ি বাড়ি বিলি না হয়ে নর্দমায় আর গঙ্গার জলে গিয়েছে এই সব অনেক কথা। তিনি শাসিয়ে দিয়েছেন, যদি কোথাও পার্বণী চেয়েছ ত তোমাদের নামে রিপোর্ট করে চাকরি খেয়ে দেবো। অথচ দেখুন দিদিমণি, এই বাজারে যা মাইনে পাই তা দিয়ে কলকাতা শহরে খেয়েপরে বাঁচা—কচি-কাঁচা, অসুখ-বিসুখ, সবই ত আছে!'

ক্ষীরের লুচি দুখানা পেয়ে মহা খুশী, বলল—'এ দুটো বাড়ি নিয়ে যাই। কতোকাল যে চোখে দেখি নি, কি বলব দিদিমণি।

আমার বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে আসতে চায়, আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম—তাহলে দাঁড়ান আর তুখানা দিই।

সন্ধ্যের মুখে-মুখে নণ্টু-বণ্টু সেজেগুজে বলল—'মা আমরা বারোয়ারী-তলায় যাচ্ছি।'

—হঠাৎ কি ব্যাপার?

'কেন, বিজয়া সম্মেলন আছে তুমি জানো না?'

হঠাৎ মায়ের জন্যে নণ্টুর আদর উথ্‌লে উঠল, আবদার ধরল—'চলো না মা, তুমি গেলে খুব মজা হবে।'

—আমি? আমি কি করে যাবো। উনি এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি। তাছাড়া, কখন কে আসে, তার ঠিক কি!

হলো ও তাই। সন্ধ্যে বাঁওড়াতে-না-বাঁওড়াতে সুনীল ঠাকুরপো এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে হাজির। সঙ্গে তার বৌ। তার দিকে একনজর চোখ বুলিয়েই ব্যাপারখানা পরিষ্কার হয়ে গেল। হাসতে হাসতে বললাম—ঠাকুরপো ছেলে হওয়ার আগেই মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন?

সুনীলের বৌ লেখাপড়া জানা আপ-টু-ডেট মেয়ে হলে কি হয়, স্বভাবটা খুব লাজুক। আমার মুখে হাত-চাপা দিয়ে ব্যগ্রভাবে বলল—'আপনার পায়ে পড়ি দিদি, ভাসুরঠাকুরের সামনে যেন এসব ফাঁস করবেন না।'

গম্ভীরভাবে সুনীল বলল—'বা রে, আমি যে তোমাকে ওই জন্যে সঙ্গে নিয়ে এলুম। এখন থেকে হাসপাতালে একটা বন্দোবস্ত না করে রাখলে শেষকালে ফ্যাসাদে পড়তে হবে। দাদার তু-তিনজন বন্ধু আছেন মেডিক্যাল কলেজে। আমাদের অবিশ্যি আর-জি-করটাই কাছে। কিন্তু সেখানে যা অবস্থা! শুনি নাকি সেখানে নার্স খুব কম, রোগীরাই রোগীদের দেখাশুনো করার ভরসা। এসব জেনেশুনে ত একেবারে নিজের বিয়ে-করা বৌকে ওখানে ভর্তি করা চলে না।'

স্বামী-স্ত্রীতে একপত্তন বচসা হয়ে গেল। অবশেষে আমি মধ্যস্থ

হয়ে ওদের তক্‌রার মেটালাম, বললাম—তোমরা চলে গেলে পরে, আমি ওঁকে বলে কয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখব।

সুনীল ঠাকুরপো সংসারে এতকাল একেবারে একলা ছিল। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে। কেরানীগিরি করে, খেয়ে, না-খেয়ে কলকাতার কাছে একটু পাড়াগাঁয়ের দিকে একরত্তি মাথা-গোঁজার ঠাঁই করে তবে গিয়ে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করল। সংসারে ওরা দুটি জোটের পায়রা বেশ আছে।

উনি অফিস থেকে ফিরতেই সুনীলের চাকরির দুখ্‌কান্না শুরু হল — 'জানেন দাদা! ওই স্ট্রাইকে আমাদের আধমরা করে দিয়ে গেছে। ওপর-ওয়ালারা এখন আমাদের মাথায় পা দিয়ে চলে। মাইনে কাটা গেল, সার্ভিসে ব্রেক হলো, ইনক্রিমেণ্ট, প্রমোশন সব ঘুচেছে। আমাদের নেহাৎ কই মাছের প্রাণ তাই বেঁচে আছি। দেখবেন রাজ্যেশ্বর চাটুয্যের মতো আরও কতো লোক সুইসাইড করে।'

হাসপাতালের কথা উঠতেই উনি বললেন—'আর বলো না, কোন্ হাসপাতালই বা ভাল? এই ত পি-জিতে কোন্ মিতুয়াকে ট্রান্সফার করা নিয়ে স্ট্রাইকই হয়ে গেছে।'

সুনীলের বৌয়ের কথা সে নিজেই তুলল, তাতে উনি বললেন—'ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। কিন্তু আমি কি ভাবি জানো সুনীল, তোমার-আমার মতো চেনা-জানা যাদের নেই তাদের কি দুরবস্থা বলো। অবিশ্যি আজকের দিনে সর্বত্রই সুপারিশ-তদবির ছাড়া কোন কিছু হবার উপায় নেই। আগে কথা ছিল বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, কিন্তু এখন হয়েছে তদ্‌বিরভোগ্যা! নিজের বিবেকের কাছে কৈফিয়ত দিতে না পেরে এক-এক সময় বোকা বনে যাই।'

সুনীলের মুখখানা অপমানে কেমন থমথমে হয়ে ওঠে, সে হঠাৎ বলল—'থাক দাদা তোমাকে আমার জন্যে তদ্‌বির করতে হবে না।'

উনি হো-হো করে হেসে সুনীলের পিঠ চাপড়ে বলেন—'আচ্ছা সুনীল তুমিও শেষে আত্মায় হয়ে উঠলে?'

'তার মানে ?'

'মানে জানো না! যারা তোমার বিপদে এসে পাশে দাঁড়াবে না অথচ তাদের প্রতি তোমার কর্তব্য ব্যাপারে পান-থেকে-চুনটুকু-খসা বরদাস্ত করে না তাদের আমি আত্মীয় বলি। আরে তুমি আমার রক্তের সম্পর্কে ভাই নও, মনের যোগসূত্রে আমরা বাঁধা। তাই ভরসা করে একটু চেঁচিয়ে সামনা-সামনি চিন্তা করে ফেলেছি—। এই আমার অপরাধ। দাঁড়াও আমার সোচ্চার চিন্তাটা কমপ্লিট করি তাহলেই দেখবে যে আমি একটুও বাঁকা কথা বলি নি। আসলে, আমাদের দেশে যদি জনসাধারণের সংখ্যার চাহিদা মেটাবার মতো যথেষ্ট হাসপাতাল বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে মানুষকে তদ্‌বির-ঘুষ ইত্যাদির চোরা-গলিতে হাঁটতে হতো না। আমরা সবাই আধাশিক্ষিত, অর্ধসভ্য, আধপেটা খেতে পাওয়া, অর্ধস্বাধীন জীব। আমাদের সমাজের কোনো দিকই পূর্ণাঙ্গ নয়; তাই এই অর্ধব্যবস্থার কুপাকে ঘোল খাই আমরা। এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি যে অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও নিরুপায় হয়ে আমাদের বাঁকা আঙ্গুল দিয়ে ঘি তোলার চেষ্টা করতে হয়। আরে বাপু সবাই চায় যে বেঁচে থাকি এটা সর্বসত্য—তাই। অন্যের মুখের দিকে না তাকিয়ে নিজেই আগে গ্রাস করি। যাক, আমার চিন্তার জন্য দুঃখ কর না, বৌমার যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।'

এখান থেকে বেরুবার আগে সুনীলের বৌ বার বার বলে গেল—'যাবেন দিদি! বাপের বাড়ির বলতে ত আমার তেমন কেউ নেই। এ সময়ের নিয়মকানুন বই পড়ে, আর কতোটুকু জানা যায়—আপনিই ভরসা।'

জবা এল। এসেই সাত সকালে ওঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। তর্ক আর কি, উনি বুঝি বলেছিলেন—'বেশ আছ, সপ্তাহের ছদিন থাকো অফিসে ফ্যানের হাওয়ায়। আজ রবিবার, পাছে বাড়িতে থাকলে

সংসারের কাজকর্ম করতে হয় তাই বুঝি দিদির বাড়ি বিজয়ার কর্তব্যের অছিলা নিয়ে কেটে পড়েছ ?'

জবা ত আর আমার মতো নিছক গৃহপালিত অবলা মেয়ে নয়। ও বলল—'রাখুন মশাই। সে-সব জমানা আর নেই। আমরা আপনাদের স্বরূপ চিনে ফেলেছি। পুরুষ মানেই ঘুষখোর, পুরুষেরা মেয়েদের ঠকায়, বখায়, ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের সুবিধেটুকু হাসিল করে।'

'কেন, হঠাৎ এসব চার্জ ? মেয়েরা বুঝি ঘুষ খায় না ?'

'নজীর দেখাতে পারেন ?'

'পারি, যথা নির্মলা যোশী।'

আমি ওদের তর্কের মধ্যে নেই, জবাকে দু-একবার এদিকে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ও নাছোড়বান্দা, বলল—'দু-একটা ব্যতিক্রম ধরে বসে থাকলে ত চলবে না! আমি সদ্য সেদিন কাকদ্বীপ ঘুরে এসেছি। জানেন এখন ওখানকার পথঘাট কি রকম সুন্দর হয়েছে। গাঁয়ে গাঁয়ে টিউবওয়েল বসেছে। গান্ধী-জয়ন্তীর দিনে মায়া ব্যানার্জি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। ওখানে এই যে উন্নতি হল এর মূলে ত আপনারা নন, একটি মেয়ের চেষ্টা আর আন্তরিকতাই এর মূল। আপনারা পুরুষেরা যারা দেশের লোকের কাছে খবর পরিবেশন করেন খবরের কাগজে, তা সব পুরুষ মানুষের। যাঁরা বক্তৃতায় কাগজ বোঝাই করেন তাঁরা কই এই মেয়ের কৃতিত্বের কথা লেখেন না। কেবল যতো সব মেয়েদের কেলেঙ্কারীর ছিদ্র খুঁজে খুঁজে বেড়ান। আপনাদের গুণের বিজ্ঞাপন, আর মেয়েদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কার এইভাবে ভাগ করে নিয়ে দিব্যি চালাচ্ছেন নিউজ পেপার! সত্যি জামাইবাবু মেয়েরা আস্তে আস্তে আপনাদের চালাকী ধরে ফেলেছে। দেড় টাকা জোড়ার গড়ে-মালার শেকল দিয়ে তাদের বেঁধে রেখে বাঁদীগিরি করানোর দিন গন্!'

উনি হেসে বললেন—'ব্রেভো! তোমার স্পিরিট দেখে ইচ্ছে করছে কোলাকুলি করি, কিন্তু তোমার দিদি পার্মিশন দেবে না। জানো মালার বাঁধন বড় বিশ্রী, ওতে পুরুষেরাও কম বাঁধা পড়ে না।'

কিছুদিন আগে একটি ছেলেকে শ্মশানঘাটে চিতায় তুলে টের পাওয়া গিয়েছিল যে, সে বেঁচে আছে। ছেলেটি চিতার আগুনের তাত পেয়ে সোজা খাড়া হয়ে বসেছিল, তারপর তাকে চিতা থেকে উদ্ধার করে যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা হল, তখন সে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে সত্যি-সত্যিই মারা গেল—আর কিছুতেই বাঁচল না। সেই ছেলেটির জন্যে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম—তাকে কোন দিন চোখে দেখি নি, তার তিনকুলের কাউকে চিনি নে, তবু তার জন্যে মনে মনে কেঁদেছিলাম।

আজ এ কথা কেন বলছি? খবরের কাগজে দেখলাম কি না, মৈসুরের কোন 'কালিয়া' তার বৌয়ের শবদেহ সৎকার করবার জন্য শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে দেখল যে, হাসপাতাল থেকে যে শবদেহটি তাকে দেওয়া হয়েছে সেটি কালিয়ার স্ত্রীর শবদেহ মোটেই নয়। "...কালিয়ার আত্মীয়-স্বজনেরা শবযাত্রার জন্য হাসপাতাল হইতে আনীত বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিলে এই ভুল ধরা পড়ে। ঠিক এই সময়ে কালিয়ার পুত্রকন্যারা হাসপাতাল হইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া খবর দেয় যে, তাহাদের মাতা মারা তো যানই নাই বরং দ্রুত আরোগ্যের দিকে যাইতেছেন।......হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই এই ভুল ঘটিয়াছে।...কাগজপত্র বদলাবদলি হওয়াতেই এই ভুল হয়।" এক্ষেত্রে কালিয়ার বৌটি মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে যে সত্যি-সত্যিই মরে নি সেই যা রক্ষে। নইলে ছেলেমেয়েগুলোর কি দশা হত!

হাসপাতালের লোকেদের কি আশ্চর্য ভুল করার ক্ষমতা! তারা অপারেশনের পর রোগীর পেটের মধ্যে ছুরি-কাঁচি-তোয়ালে রেখে দিয়ে সেলাই করতে পারে, তারা আরও কতো রকমের বিড়ম্বনা এনে দিচ্ছে আজকাল—অথচ আমরা হাসপাতালের ওপর কতোখানি ভরসা রাখি! আগেকার কালের লোকেরা পারতপক্ষে কাউকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইত না। নেহাৎ মরণাপন্ন রোগীকেই হাসপাতালে পাঠিয়ে কান্নাকাটি করত (মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদনের কথা!)—অথচ হাসপাতালে সে আমলে চিকিৎসাপত্র বাড়ির হিসেবে ভাল হোত। কিন্তু আজকাল চাকা উল্টোদিকে পাক খাচ্ছে। এখন একটু কঠিন রোগ হলেই লোকে হাসপাতালে যেতে চায়, আত্মীয়স্বজনেরাও চিকিৎসার অধুনাতম পদ্ধতির সুযোগের ভরসায় রোগীকে হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু—হাসপাতালের কর্মচারীরা এখন সেবাব্রত করে না, চাকরি করে। দায়-সারা কাজও করতে তাদের বিবেকে আটকায় না।

উনি বলেছিলেন—'আমাদের পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে অসুস্থতার সূচনা দেখে ডাক্তার বিধান রায় হাল ধরলেন, ধরলেন ত ধরলেনই : ছাড়বার নাম নেই, নিরাময় না হলে ছাড়া চলে না। এবার গ্যাখো বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথার ওপরও এসে বসলেন আর এক ডাক্তার, তিনি ক্যান্সারের বিশেষজ্ঞ। বোধহয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছে। অবিশ্যি ডাক্তার আসবার আগেই অপারেশন সুরু করে গেছেন সিদ্ধান্ত।'

আমি পুরনো কাঁথার ওয়াড় সেলাই করছিলাম, সামনে শীত আসছে, অল্প শীতে কাঁথা গায়ে বেশ আরাম হয়। সেলাই থামিয়ে বললাম—তোমার হেঁয়ালি রেখে বাংলায় বলো না বাপু।

'বাংলা এখন প্রাদেশিক ভাষা, জানো। ত্রিপুরার এরোড্রোমে চাকুরি যারা করে তাদের ওপর হুকুম হয়ে গেছে, ডিউটির সময় বাংলায় কথা বলা চলবে না। কোনদিন হয়তো হুকুম হবে রাষ্ট্রভাষায় প্রেমালাপ

করতে হবে! তা যাক, অপারেশনের কথা হচ্ছিল, সিদ্ধান্তের আমলে সেনেট হাউসটা ভেঙ্গে ভূমিস্মাৎ করা হল। আসলে এ যুগটা ভারি বিচিত্র ঃ শিক্ষাবিদ সুনীতিবাবু গেলেন রাজনীতি করতে, ডাক্তার করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি, এই রকম সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার চারদিকেই ঘটে চলেছে, তার ফলে কোন দিকেই তেমন নিটোল-নিখুঁত কিছু গড়ে উঠছে না।'

আমি অতো বড়ো করে ভাবতে পারি না ওঁর মতো। তবে চারিদিকে যে একটা নিটোল বিশৃঙ্খলার ঢেউ উঠেছে এটা টের না পেয়ে উপায় নেই। এই ধরো না পূজোর পর পোস্ট অফিসে পোস্টকার্ড না পেয়ে কি অসুবিধেতেই পড়েছিলাম। শুনলাম বালীগঞ্জ পোস্টঅফিসে মণিঅর্ডারের ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে না বলে লোকে সেখান থেকে টাকা পাঠাতে পারছে না। আর একটা পোস্ট অফিস সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে যে, নতুন মেট্রিক ওজনের অনুপাতে টিকিটের কি হার হবে তার কোন তালিকা তাদের হাতে এসে পৌঁছায় নি অতএব পোস্ট অফিসে ইন্সিওরই বন্ধ।

এই অক্টোবর মাস থেকে শাদা দু-আনি আর দু-পয়সার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেছে ঃ সেই সুবাদে মফঃস্বলের চতুর লোকেরা বোকা-বোকা বেকুবদের কাছ থেকে সস্তায় সেই সব মুদ্রা কিনে নিচ্ছে। বোকা লোকেরা জানে না যে, সরকারী দপ্তরে এই সব মুদ্রা এখনো কিছুদিন বদলে নতুন মুদ্রা দিচ্ছে। অবিশ্যি অনেক পোস্টঅফিসের বাবু আইনের বেড়া ডিঙিয়ে স্বচ্ছন্দে এইসব দু-আনি, দু-পয়সা অচল বলে ফেরতও দিচ্ছেন এমন খবরের অভাব নেই। এর সঙ্গে পুরনো আনিকেও অনেকে অচল বলে ধরে নিচ্ছে, অথচ আনির গায়ে আইন এখনো হাত দেয় নি।

ওঁর কথার কোন জবাব দিই নি, তাতে হয়তো উনি একটু বিরক্ত হয়েই জামা চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবেন আর কোথায়, কালীপূজোয় এ পাড়ায় ব্রীজ খেলার যে প্রতিযোগিতা হয় উনি তার এক পাণ্ডা, সেখানেই গেলেন।

আজ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি : জলবিষুব সংক্রান্তি। ছোট বেলায় দেখেছি আমাদের দেশে বড়লোকদের বাড়িতে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হত আজ প্রথম, সারাটা কার্তিক মাস আকাশ-প্রদীপ জ্বলত। আর আমরা ছোট-ছোট মেয়েরা গঙ্গা থেকে মাটি এনে প্রদীপ গড়তাম। রোজ সন্ধ্যেবেলা সেই প্রদীপ কলার পেটোতে কিম্বা নারকেলের মালাতে চড়িয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতাম! হেলে দুলে সেই ভেসে যাওয়া প্রদীপের আলো হাতছানি দিয়ে ডাকত : আকাশের গায়ে ও-ই উঁচুতে তারাগুলো জ্বলজ্বল্ করছে, দেখে, মনে হতো আমার হাতে-গড়া ওই প্রদীপের আলো বুঝিবা আকাশের তারার মতোই উজ্জ্বল। আকাশের তারা হয়ে জ্বলছে যেন সেই প্রদীপগুলো আজও। আজ সন্ধ্যেবেলা সেই সব কথাই মনে পড়ছে। আমার ছেলেমেয়েরা হয়েছে শহুরে, তারা প্রকৃতির স্বাদটুকুই টের পেল না। এদিক দিয়ে ওরা বঞ্চিত। ওদের জন্য দুঃখ হয়। বলো ভগবান, ওদের এইভাবে বঞ্চিত করে কি লাভ হয়েছে তোমার।

সেই বঞ্চনার প্রতিশোধই কি ওরা নিচ্ছে ছুঁচো-বাজী, হাতবোমা, চট্পটি উড়নতুব্‌ড়ির বাজী খেলায়! বছর বছর কতো ছেলেমেয়ে জখম হয়, কী পয়সা বাজীর পেছনে পুড়ে ছাই হয় তার হিসেব করতে গেলে মাথার ঘিলু গলে যাবার দাখিল হয়। শুনলাম নাকি, এক এই কলকাতা শহরেই কালীপূজোতে এক কোটি টাকার বাজী পোড়ে। এ-ছাড়া আর যেগুলো পোড়ে, যেমন : হাত-পা, শাড়ী-ধুতি, জামা-কাপড় এমন কি বাজীর আগুনে বাড়িঘরও পোড়ে তার কে হিসেব দেবে!

ফি বছর, পুলিস বিপদজনক বাজীর বিরুদ্ধে আইন জারী করে, কিন্তু আইন মেনে চলার মতো আহাম্মক অল্পই আছে—ফলে, দুর্ঘটনার উৎপীড়ন শান্তভাবে গৃহস্থদের মুখ বুজে হজম করতেই হয়। তবু রক্ষে যে এবার পুলিস কড়া হাতে রাশ ধরেছে। এরই মধ্যে দুলক্ষ টাকার

বাজী আর বাজীর মশলা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিছু ধরপাকড়ও হয়েছে। এইসব খবর শুনে নণ্টু আর বণ্টু একটু মুষড়ে পড়েছে। ফুলঝুরি ছাড়া অন্য কিছু ওদের কিনে দেওয়া হবে না। উনি বলেছেন, 'তার বদলে তোমরা এবার বেশি বেশি করে মোমবাতি কিনে ছাদের ওপর দেওয়ালী করো!'

হঠাৎ বাজীর কথা থেকে নণ্টু ছিট্‌কে গিয়ে বললে—'তা কেন, আমাদের ভাল কিছু খাওয়ানো হোক!'

আমি বললাম—কি এমন মন্দ খাচ্ছ বাবা, বলো?

'হ্যাঁঃ! আমাদের বাড়ি ঝিঙে পোড়া হয়? কখ্‌খনো আমি ঝিঙে পোড়া খাই নি।'

গালে হাত দিই থ হয়ে গিয়ে—সে কি রে, পটল-বেগুনই লোকে পুড়িয়ে খায়। ঝিঙে আবার কে কবে পোড়ায়? বাপের কালে এমন কথা শুনি নি।

বণ্টু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে বলল—'ওই বিন্দাবনদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আমরা দেখে এসেছি। জানো মা, ওরা সেদিন ঝিঙে পোড়া দিয়ে মুড়ি খেয়ে সারা রাত ছিল। বিন্দাবনের বাবা ত বলেন যে এ হলো দেবভোগ্য আহার।'

উনি না বুঝলেও আমি টের পেলাম। বৃন্দাবনের বাপের কি যেন কারবার আছে, তাতে খুব চোট খেয়েছেন ভদ্রলোক। এখন দিন চলা দায়, অথচ সে কথা বাইরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ হতে দেন না।

আমিও সেই সম্মানটুকু ভদ্রলোককে দিয়ে বললাম—তোমাদের যখন এত ইচ্ছে হয়েছে তখন ঝিঙে পোড়া করব। একটা নতুন জিনিসও খাওয়া হয়ে যাবে।

মেয়েরা যেমন মেয়েদের চরিত্র বোঝে তেমনটি পুরুষের সাধ্য কি! আমাদের কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বিকানীরের মহারানী সুদর্শন কলেজের বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে কি বলেছেন

জানো ভগবান? বলেছেন: অধিকাংশ পিতামাতার নিকট মহিলা কলেজগুলি শিক্ষার স্থান নহে, বিজ্ঞাপনের কেন্দ্র। কারণ, তাঁহারা মেয়েদের যে লেখাপড়া শিখাইতেছেন তাহা পরে জাতীয় সেবায় নামিবার জন্য নহে, ভাল স্বামী ধরার উদ্দেশ্যে।

আচ্ছা বলো ত ভগবান, কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত হয়েছে কি এ কথাটা? দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে এদেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার। যদি মেনন এই বিকৃত শিক্ষার জন্য কাউকে দায়ী করতে চান তবে সব আগে ত শিক্ষা বিভাগকেই করা উচিত তাঁর। তা না করে তিনি মা-বাপকে ধরে টানাটানি করছেন। তবে কি তাঁর উপদেশ মেনে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করে তাদের মূর্খ করে রাখতে হবে? তাহলেই কি দেশসেবার কাজে নামবার যোগ্যতা অর্জন করবে মেয়েরা? আমরা জানি যে, ইংরেজরা কেরানী বানানোর জন্যে যে শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল আজ সে পদ্ধতি অনুপযুক্ত। এবং সেটা বোঝবার দরুনই আমাদের দেশে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা সুরু হয়েছে, এই ক্রান্তিকালে দুম্ করে যা-তা একটা মন্তব্য করে শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন খুব বড় কিছু দায়িত্ব পালন করেছেন কি? আর দেশসেবা বলতে তিনি কি বোঝেন যে, বিয়ে-থা না করে, স্বামীরঘর না করে, কেবল বক্তৃতা মেরে দেশের মানুষকে ফাঁকা বুক্‌নীর ফুলঝুরি দেখিয়ে বেড়ানো? কোন্ আজব দেশে এমন সেবিকা আছে!

উনি খেতে বসে বললেন—'ভেবে দেখছি এদেশে থাকা ডাহা লোকসান। চলো কিউবাতে চলে যাই।'

—হঠাৎ কেন কিউবাতে যাবার বাই উঠলো?

'আরে আজকের কাগজে খবর আছে যে সেখানে ভাড়াটেরাই এর পর থেকে বাড়ির মালিক হয়ে যাবে। তা এখানে মাসে মাসে এতগুলো টাকা ভাড়া না গুনে সেখানে গিয়ে থাকলেই ল্যাঠা চুকে যায়।'

আমি বললাম—তা তোমার দেশের বাড়ি কি দোষ করল, সেখানে গিয়ে থাকলেও ত ভাড়া লাগে না।

'হুঁ! চাকরি?'

ছোট্ট বেলায় নন্টু বল্‌ত—'আমার জন্মদিনের কথা পাঁজীতে লিখেছে?' চৈতন্যদেব বিবেকানন্দ এঁদের সবারই জন্মদিন ছাপার অক্ষরে দেখে এই ওর ধারণা হয়েছিল। ভগবান এমন করে ওকে যেন মানুষ করতে পারি যাতে ওর নাম সত্যিই ছাপা হয়। হয়তো আমি তখন থাকব না, দেখতে আসব না, তবু যেন ওর এই আশা পূর্ণ হয়—টাকা দিয়ে নাম ছাপার গ্লানি যেন ওর ভাগ্যে না আসে।

আসছে কাল ভাইফোঁটা। উনি বলেছেন, ছেলেমেয়েদের জন্যে ভালো সন্দেশ আর ফুলকপি আনবেন, ননদের শাড়ীও উনি কিনবেন। ক'দিন আমার জ্বর হয়ে বড় কাহিল করে দিয়ে গেছে, নইলে যা পারি ঘরেই খাবারপত্র তৈরী করি। এবার উনি মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছেন। নিজেই বাজার পত্র করেছেন—তার মানে, টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে। এমনি দরদস্তুর করা ওঁকে দিয়ে হয় না, কিন্তু হিসেবে যদি কেউ একটি নয়া পয়সা এধার-ওধার করেছে ত আর রক্ষে নেই—অযথা তার পিছনে একটি ঘণ্টা তর্কে নষ্ট করে মেজাজ তুঙ্গী করে বাড়ি ফিরবেন, আর সেই ঝাল আমার ওপর ঝাড়বেন। বাড়ি ফিরতে বড্ডই দেরী হচ্ছে। এদিকে নন্টু, বন্টু, রমা, ক্ষমা বার বার দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর হতাশ মুখে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

মশাই ত ফিরলেন প্রায় দশটা বাজিয়ে। বাইরে ঠুং শব্দ, তারপরই হাঁক দিলেন—'শুন্‌ছো! এ্যাই রমি, শোন, তোর মাকে সাঁইত্রিশ নয়া পয়সা দিতে বল।'

ব্যাজার মুখে ঘরে ঢুকে বললেন—তাই কবি গাহিয়াছেন, ভগবান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে।

—কি হল ? দূতকে ভূত বানাচ্ছ কেন গো !

—'আর বল না। তোমার ছোটদির শাড়ী কিনতে কলেজ স্ট্রীটে গিয়েই সব তালগোল পাকাল। এমনিতে কাপড়ের দোকানে ভিড় নেই, কিন্তু এক-এক খদ্দের সাত-খানা করে কাপড় কিনছে। ভাই-ফোঁটাতেই টের পাওয়া যায় ফ্যামিলি প্লানিং-এর সাফল্য। সে যাক, তারপর পথে নেমে দেখি সার সার ট্রামগুলো বন্ধ ঃ ইয়া একখানা ত্রিশূল বাগিয়ে ডেকরেটরের দোকানের ভাড়া-করা জটা-বাঘছাল লাগিয়ে শিবঠাকুর ট্রাফিক রুখে প্রশেসনের আগে আগে চলেছেন। তা মনে করো ওটা ত শিবেরই ভূত !'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উনি সিগারেট ধরিয়ে যে বক-বক সুরু করলেন তার জের চলল—'ভূতের উপদ্রবে গোটা দেশটা তচ্‌নচ্‌ হবার দাখিল। আগে, আমাদের ছেলেবেলায় কালীপুজো সহজে কেউ সাহস করে করতে চাইতো না। সে পূজোর চেহারাই ছিল অন্য রকমের। কিন্তু এখন কলকাতার কানা-গলিতে পর্যন্ত কালীর পূজো চলে। পূজোর আগে জুটেছে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন ! কি সাংঘাতিক কথা। পুরোহিতের পূজোর আগেই উৎসবের অধিবাস হিসেবে কোনো রাজনীতির চাঁই কিম্বা ওই ধরণের কাউকে ডেকে এনে অনুষ্ঠানের গাজন সুরু হয়। এই ধরণের অনুষ্ঠান যা পূজো উপলক্ষে করা হয় তাকে অমর্যাদা করবার ইচ্ছে একটুও আমার মেই। আমি শুধু বলতে চাই যে, পুজো নিয়ে তামাশার কোনো অর্থ নেই।'

—তামাশা বলছো কেন ? এই উপলক্ষে সবাই মিলিত হয়ে কিছু বক্তৃতা শুনল। বক্তৃতায় যে কথাগুলো বলা হয় সেগুলো তো সবই ভালো কথা।

—'ভালো কথা শোনা বা বলার সময় যা ক্ষেত্র আছে ত ! আমি নিজে ঠাকুর পূজোয় আস্থাবান নই, কিন্তু যারা সত্যিকার ভক্তিবাদী তারা দেখছে যে ধর্মের মন্দিরে রাজনীতির আখড়া বসে গেছে। মায়ের পূজোর আগেই—না, না, আগেই বলছি কেন, পরেও যাচ্ছেতাই

তাণ্ডব সুরু" হয়ে গেছে। আমাদের রাষ্ট্র কারুর ধর্মীয় মতে হস্তক্ষেপ করে না, তাই বলে তারই সুযোগ নিয়ে কিছু খামখেয়ালী চ্যাংড়া-স্বভাবের মানুষ গোটা সমাজের জীবনযাত্রাকে ওলট-পালট করে দেবে, আর আমরা মুখ বুজে সয়ে যাবো? এর মধ্যে একটাই লক্ষণ প্রকট, তা হল জাতীয় উচ্ছৃঙ্খলতা! শিবকে নিয়ে তামাশা করছ তোমরা ঘরে করো, তার দাপটে হাজার হাজার লোকের অসুবিধে সৃষ্টি করার তোমার কোনো অধিকার নেই। তুমি ত বেরোও নি, তাহলে দেখতে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মূর্তি খাড়া করে দেওয়া হয়েছে মণ্ডপের পাশে। আমাদের আধুনিক পণ্ডিত বলবেন, এটা জনমনে ইতিহাস-চেতনার প্রতীক, আমার মনে হয় এও সেই ভূত। কেন না যে সব মহাপুরুষের প্রতিমূর্তি তোমরা খাড়া করে রেখেছ তোমাদের আচার-আচরণে তাঁদের জীবনাদর্শের প্রভাব ছিটেফোঁটাও পড়ে নি— আমার দুঃখ সেইখানে। আমরা সেই প্রতিষ্ঠানের পুজো দেখতে দৌড়োই যেখানে কালীর চারপাশে শেয়াল ঘুরোনো হচ্ছে, যেখানে ডাকিনী-যোগিনীর মুখ দিয়ে আগুন বেরোনো দেখাচ্ছে। এগুলো কি পুজোর অঙ্গ বলে তুমি মনে করো?'

যেন আমিই উদ্যোক্তাদের পাণ্ডা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে উনি কৈফিয়ৎ তলব করলেন। বেচারী আমি, অপরাধের মধ্যে বলে ফেলেছি— তা পুজোয় একটু আমোদ, কিছু বৈচিত্র্যও ত অপরাধ নয়!

—'কে বলেছে অপরাধ! কিন্তু ওজন করে দেখ, আমোদবাজীর পাল্লাই ভারি হচ্ছে দিন দিন। তার নমুনা তুমি হাসপাতালে গেলেই টের পাবে। এই যে পুলিশে এবার এত কড়াকড়ি করল, কই বিপদজনক বাজী তৈরী বন্ধ করতে পেরেছে? গত বছর যেখানে বাজীর আগুনে পঁয়তাল্লিশ জন জখম হয়েছিল এবার সেখানে পৌনে দুশো জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। আর পুলিশের হেফাজতেও আগের চেয়ে অনেক বেশী লোককে পুরতে হয়েছে: বারোশোর ওপর লোককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, সে তুলনায় গত বছরে মোট

গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল তিনশোর কাছাকাছি। আনন্দ করা মানে তুমি নিশ্চয় পরের সর্বনাশ করাকে বলতে চাও না! আজকাল হয়তো চারদিক থেকে চাপ খেয়ে মানুষের মনই বদলে গেছে, পরের পিছনে কাঠি দিয়েই খুব মজা পায় তারা। কি জানি!'

ওঁর মনের মূলে ব্যথা লেগেছে। মাঝে মাঝে এই রকম ক্ষেপে যান। শুধু উনিই যে ক্ষেপে ওঠেন তা নয়, যারা পথেঘাটে চলাফেরা করে তাদেরই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। এই কালীপুজোর বিসর্জনের পর্ব কতদিন ধরে চলবে কে জানে! অসুবিধে যারা ভোগ করছে তারা নিরুপায়। প্রতিবাদ করতে গিয়েছ কি বিপদের ঝুঁকি তোমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। ভগবান, তোমার নাম নিয়ে এরা যে এত অনাচার চালাচ্ছে তাতে তোমার গায়ে কাদা লাগছে না?

আজ সকাল থেকে নণ্টু আর বোল্টু চান সেরে নিয়ে দিদিদের তাগাদা লাগাচ্ছে—বেচারাদের উপোস করা অভ্যাস নেই ত! রমা, ক্ষমার কাজ অনেক: শিশির চাই, দই চাই, চন্দন চাই, ফোঁটার জন্যে। ন'টার মধ্যে ফোঁটা-পর্ব চুকলো। উনি আগেই বেরিয়ে গেছেন, ননদের কাছে ফোঁটা নিয়ে আপিস যাবেন।

মাসিমারা বেনারস যাচ্ছেন। ওঁদের খুব ইচ্ছে, আমিও সঙ্গে যাই। উনিই খবরটা আনলেন, আর বললেন—'আমার কাছে মত চাইলেন তোমার মেশোমশাই, তা আমি খুব সাপোর্ট করে এলাম। সত্যি কতোকাল এক নাগাড়ে তুমি রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেল্‌ছ!—যাও, ঘুরে এস।'

আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল—তোমার সংসার কে সামলাবে?

—'আরে বাপু, সংসারের ইণ্টারেষ্টেই ত আরো দরকার। এই যে তোমার প্রায়ই শরীর খারাপ করছে, যদি বড় রকমের কিছু হঠাৎ হয়ে যায় তখন কি হবে! তার চেয়ে কিছুদিন রেষ্ট নিয়ে ঘুরে এসো। এদিকে এক রকম করে চলে যাবে। ধরো বাসন মাজার জন্যে একজন

ঝি রাখা গেল, আর কিরণ রান্নাবাড়ি করল। তোমার সঙ্গে নণ্টুবাবু যাক, বোল্টু, রমা এদের পরীক্ষা এসে যাচ্ছে, স্কুল খুলে যাচ্ছে—ওরা কিরণের কাছে বেশ থাকতে পারবে।'

কাশী কখনো যাই নি। কাশী যাবো! ভাবতেই ভালো লাগছে। কিন্তু এখানে সবাইকে ফেলে রেখে স্বর্গে গিয়েও আমার শান্তি নেই। ছেলেমেয়েদের জন্যে যতো না ভাবনা ওঁর জন্যেই বড় ভাবনা। খেয়ালী মানুষ, সব দিকের এত ঝামেলা পোহানো ওঁকে দিয়ে হবে না। যখন যা দরকার তা মুখ-ফুটে চাইবেন না, আমি দেখে দেখে জেনে ফেলেছি ওঁর কখন কি চাই। বেচারী, আমি না থাকলে সাত আতান্তরে পড়বেন। কিন্তু যে রকম ওঁর স্বভাব, মাসিমাদের কাছে রাজী হয়ে এসেছেন এর পর আমি যেতে না চাইলেও জোর করে পাঠাবেন।

তবু শেষ চেষ্টা করে দেখি। বললাম—যাক বাবা! ক'টা দিন হাঁফ-ছেড়ে বাঁচবো। বাজার-হাট, রান্না-পাট কোনো ঝামেলাই থাকবে না।

মতলব এই যে, আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছে দেখিয়ে একে-একে অসুবিধের দিক এমনভাবে দেখাবো, শেষে উনি ঘাবড়ে গিয়ে বলবেন, 'তবে থাক তোমার এখন গিয়ে কাজ নেই।'

কিন্তু আমি ডালে ডালে চলি ত উনি চলেন পাতায়-পাতায়। আমার কথার জের টেনে বললেন 'তোমার কথা শুনে বিভূতিবাবুর সেই 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেটা যেন কর না!'

—তার মানে?

—'কেন, দ্রবময়ী কাশীতে গেলেন শেষ জীবন কাটাবার জন্যে, কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি কেবল গাঁয়ের কথাই ভাবেন। ঝিঙে গাছে ফুলফোটা দেখে এসেছিলেন, কেমন ফলন হল, পুকুরে হাঁস চরছে তার সেই 'কুৎলী-কুৎলী, ক্যাঁ-ক্যাঁ' ডাক ইষ্টমন্ত্রের জপের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। শেষে ধ্যাত্তোর বলে দ্রবময়ী কাশী থেকে পালিয়ে গাঁয়ে এলেন।'

হাসি চাপবার জন্যে ওঁর দিকে পিছন ফিরে টেবিলের বইপত্তর গোছাতে গোছাতে বললাম—অতোটা ইয়ে মনে কর না। বলো যে যেতে দেবার ইচ্ছে তোমার নেই। তা আমি কি সেধে-সেধে যেতে চেয়েছি। শরীরে আমার এমন কিছু ঘুণ ধরে নি যে, অম্বুলে রুগীর মতো চেপে যেতে হবে।

ধমক দিলেন—'ওসব মতলব ছাড়ো। গোছ-গাছ করো। বাইরে যাবার জন্যে যা-যা লাগবে তার একটা ফর্দ আমাকে দিয়ো। হাতে মাত্তর আর মোট ছ'টি দিন সময় আছে, বুঝলে!'

যাক, বাঁচা গেল: হাতে ত এখনো ক'টা দিন রইল, এর মধ্যে চেষ্টা করলে ওঁর মত পাল্টে ফেলা যাবে, তুমি একটু সহায় হয়োভগবান।

বেলা এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেল; ওদের বাড়ীর পাশে থিয়েটার হচ্ছে। আসল কথা, ওর স্বামীও অভিনয়ে নামছেন, সেটা দিদিকে না দেখালে ত ওর মন ভরবে না। আসরে লোকজন খুব জমেছে, কাচ্ছা-বাচ্ছাদের হৈ-চৈ। পর্দা উঠতেই গোলমাল থেমে গেল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে গণ্ডগোল বাধল, প্লে আটকে রইল। কি ব্যাপার, প্রম্পটার বইয়ের পাতা খুঁজে পাচ্ছে না। খোঁজ-খোঁজ। শেষে অন্য একটা বই যোগাড় করে আবার সুরু হল পালা।

উনি বললেন—'কাকে পার্ট দেয় নি, নির্ঘাত এ তারই কীর্তি।'

আমাদের দায়িত্ববোধ দিন দিন যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে, নইলে ছাখো ভগবান একজন স্টেটবাসের কর্মচারী জখম হয়েছে (সে কণ্ডাক্টরও নয় ড্রাইভারও নয়) বলে গোটা বাসের তাবৎ প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়ে বাসখানা চলে গেল মেডিকেল কলেজে তাঁকে নিয়ে। যাত্রীদের বলা হল বাসের কল বিগড়েছে, আপনারা নেমে যান। চারজন যাত্রী নামল না, তারা বসে বসে সমস্ত কাণ্ডটা দেখল। আহত কর্মচারীকে মেডিকেল কলেজে নামিয়ে দিয়ে বাসখানা আবার

লাইনে চালু হল। আহত ব্যক্তিকে অন্য কোন গাড়িতে (ট্রাক্সি, কিম্বা কাছাকাছি কোথাও থেকে ফোন করে এ্যাম্বুল্যান্সের গাড়ি এনে তাতে) করে হাসপাতালে না পাঠিয়ে এ কি রকম ব্যবস্থা! জনসাধারণ এমনিতেই যানবাহনের অসুবিধাতে উপদ্রুত—তার ওপর এই ধরণের অবিবেচনা, অত্যাচার তাদের ওপর চাপানোর কোনো হেতু আছে কি? অবিশ্যি যাত্রীদেরও প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু কথাটা মনে হতেই দেখলাম তারও বিপদ কম নয়, এই ত কালই ট্রেণ থেকে কারা সব পাখা চুরি করছিল—যাত্রীরা আপত্তি করার ফলে মারধর খেল।

মারধরের ওপর দিয়ে তারা পার পেলেও মুরারী ঘোষাল পেলেন না। হাওড়াতে চোরাই চোলাই ধরতে গিয়ে বেচারীর প্রাণটাই গেল। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে চাকরী বজায় রাখতে প্রাণ দিতে হল।

কতো আর আমাদের দেশের মানুষের গুণপনার কথা বলি, শ্রীরামপুরের গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে গাড়িগুলোর পথ আগলে চাঁদা আদায়ের পালা সুরু হয়ে গেল - তখন অবিশ্যি প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেছে। যারা চাঁদা দিতে রাজী হয় নি তাদের ধরে প্রহার করে 'ধর্মের জয়' জিগির দিল যে সব কীর্তিমান তারা আমাদের এই দেশেরই লোক: তারা আমাদেরই মতো পরিবারের ভাই-দাদা ছাড়া অন্য কেউ নয়।

চারদিকের এই অনাচার দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমাদের দেখেও দেখছ না। আসলে আমাদের সবাইকেই শক্ত হতে হবে, নইলে—। নইলে যা হবে তা আর ভাবতে পারি না।

৩২

অন্যায় দেখলেই ঠাকুমা বলতেন—'মহারাণীর রাজত্বে ভগবান এত অত্যেচার সইবেন না।' মহারাণী অবিশ্যি রাজদরবার ছেড়ে তার অনেক যুগ আগেই সাধনোচিত ধামে যাত্রা করেছেন। আবার আমাদের এ যুগে আসছেন ইংলণ্ডের রাণী এ দেশে, একেবারে সশরীরে। এখন অবিশ্যি আমরা স্বাধীন হয়েছি—আর ইংরাজদের শাসনের শেকল পরে নেই। তাই রাণী আসবার আগে ভারত সরকারের টনক নড়েছে তের বছর আগে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এই যুগ ধরে আমরা দেশের চেহারা কতো সুন্দর আর সুশ্রী করতে পেরেছি সেটা রাণীকে বোঝানো চাই বই কি। দিল্লীর খবর আমার জানা নেই, তবে কলকাতার মাতা-পিতারা যে রীতিমত সামাল-সামাল ডাক ছাড়ছেন সেটা ঘরে বসেও টের পাওয়া যাচ্ছে। যেন, বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, বরের বাড়ির লোকেরা মেয়ে দেখতে আসবে—জানালার ময়লা পর্দা ফর্সা করো, বিছানার চাদর থেকে আরম্ভ করে ঘুলঘুলির ঝুল, দেয়ালের মাকড়যার জাল সব সাফ করো। সবই ত হল, কিন্তু মেয়ের চেহারা-সুরৎ কি পাল্টানো যাবে! তেমনি হাল দম্‌দম্ বিমান বন্দর থেকে যে শড়ক সোজা এসে শহরে ঢুকেছে তার দুপাশের ওই বাহারী খোলা-নর্দমা হাড়-জিরজিরে টিন আর হোগ্‌লার দোকানঘর, বস্‌তি—এগুলোর সংস্কার কি করে সম্ভব! তবু বাড়তি আলো, খোয়া-ওঠা ঘেয়ো কুকুরের মতো পথঘাটগুলো চিপি-চাপা পড়ে কিছুদিন অন্ততঃ সুশ্রী হবে এইটুকুই দেশের জনসাধারণের উপরি পাওনা। এই জন্যেই ইচ্ছে করছে বলি—

তুমি আয়ুষ্মতী হয়ে বেঁচে থাকো ভাই। বছরে দশবার করে কলকাতায় বেড়াতে এসো। তাহলে নিশ্চয় কাঁচা-পাঁকের গন্ধ ওঠা নর্দমার হাত থেকে আমারা মাঝে মাঝে নিষ্কৃতি পাবো।

আজ সকালে এ পাড়ায় খুব হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। পুলিশের একটা গাড়ি দু-বার চক্কর দিল—'একটা ছেলে পাওয়া গিয়েছে।' কার ছেলে? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে একবার দেখে নিলাম নণ্টুটা কি করছে। নাঃ, ও অতো বোকা নয়, ছোটও নয়। ও-ই ত এসে বলল—'জান মা, এই এত্তোটুকু বাচ্চা ছেলেটা। কি কান্না কাঁদছে। আচ্ছা মা, ওর মা কেমন? যদি পুলিশে খুঁজে না পায়, তাহলে কি হবে?'

দুপুরবেলা জগনের মায়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জানা গেল। ওই যে ছেলেটাকে পুলিশে নিয়ে ঘুরছিল তার মা ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই বাজারে আনাজ বিক্রী করতে গিয়েছিল। এদিকে খদ্দের সামলাবে, না ছেলে দেখবে! ছেলেটা আপন মনে খেলা করতে করতে এক সময়ে রাস্তায় এসে পড়ে। তারপর সে পথ হারিয়ে মা-মা করে কান্না জুড়ে দেয়। সেই সময়ে যাচ্ছিল পুলিশের গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে। পুলিশ তার কর্তব্য করেছে। আর এদিকে ছেলেটার মা ছেলেকে না দেখতে পেয়ে আনাজের বাজ্‌রা বাজারে ফেলে রেখে চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজল। পেল না। জগনের মা তখন বাজারের দোকানে মনিববাড়ির রেশন তুলতে গেছে। ওকেও জিজ্ঞেস করল সেই মা। লোকে বলল, পুলিশে ধরে নিয়ে গেল যে, তোমার ছেলেকে। রব উঠল, 'আমার ওইটুকু দুধের ছেলে ও তো কারুর কোনো অন্যায় করে নি, ওর গায়ে হাত দেয় পুলিশের এতবড় আস্পদ্দা! রাজার পেয়াদা বলে যা খুশি তাই করবে!'

...মাকে সবাই বোঝালো—'পুলিশে জেলে দেবার জন্যে ত আর ছেলেকে নিয়ে যায় নি। বেওয়ারিশের মতো কেঁদে বেড়াচ্ছিল

তাই তার গার্জেনকে খুঁজে গার্জেনের কাছে জিম্মা করে দেবে বলেই পুলিশ ছেলেটাকে নিয়ে গেছে। তুমি থানায় যাও গো মেয়ে।'...

'গার্জেন? সে আবার কোন্ মুখ-পোড়া। ও আমার ছেলে, পথে ঘুরুক, মাঠে চরুক তাতে পুলিশেরই বা মাথাব্যথা কেন, আর গার্জেন হতভাগাই বা এর মধ্যে আসে কি করে।'—এইসব বলছে আর কাঁদছে। তাকে কিছুতেই কেউ বোঝাতে পারে না যে, ছেলে সে ফেরৎ পাবে, ছেলের বাবাকে নিয়ে সে থানাতে গিয়ে বললেই তারা দিয়ে দেবে।

জগনের মা 'গার্জেন' বলে আর হাসে। বলে—'আচ্ছা কথা দিদি-মণি। ওই গার্জেন শুনে পেথমে আমিও বেশ ঘাবড়ে গিইছুনু।'

বস্তি তুলে দিয়ে আমাদের সরকার নাকি বস্তির বাসিন্দাদের সব গেরস্ত করবে, পাকা দালানে তাদের সুখে রাখবে। এ শহরে আর বস্তি থাকবে না।

তবে—'সরকার' আর 'দরকার' দুটো কথা এই দেশে কিছুতেই মিলে-মিশে এক হতে পারছে না। উনি বলছিলেন যে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড আর দম্‌দম্ রোডের উপর বিরাট বিরাট বাড়ি তৈরী হয়েছে। মোটমাট আট-শো পরিবার সেখানে বসবাস করতে পারে। এক একটি পরিবারের জন্যে একখানা করে ঘর, একফালি বারান্দা সব রকম নাগরিক ব্যবস্থায় কম্‌প্লিট—ভাড়া পঁচিশ থেকে সাতাশ টাকা। কিন্তু বস্তিতে যারা থাকে তাদের মাসিক আয় ষাট-সত্তরের চেয়ে বড় বেশি নয়। তা থেকে যদি পঁচিশ টাকা ঘর ভাড়াতেই চলে যায়, তবে সারাটা মাস চালাবে কি দিয়ে তারা! তা ছাড়া আরো অনেক সমস্যা আছে। সাধারণতঃ কর্মস্থলের কাছাকাছি কোনো বস্তিতে এরা আস্তানা পাতে—তাতে যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া এবং সময় দুই-ই বাঁচে। ফ্ল্যাটে থাকতে গেলে তেরো-চৌদ্দ টাকায় মাথা গোঁজা চলে না, যাতায়াতের খরচ ঘাড়ে চাপে, আবার সময়ও বেশি খরচ হয়। তার চেয়ে এ আমরা বেশ আছি, সরকারী উপকারের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে। এই

শহরে যেখানে মানুষ মাথা-গোঁজার ঠাঁই পায় না—সেখানে সাতশ'র ওপর ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে পড়ে হাওয়া খাচ্ছে! সত্যি যদি সরকার বস্তিবাসীদের দরকারের দিকে নজর রেখে তাদের উপকারের দিকে দৃষ্টি দিতেন তাহলে আজ এই বিপুল অর্থ ব্যয় ব্যর্থতার পরিহাসমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত না। দোতলা-তিনতলা-চারতলা বাড়িতে বাস করতে চায় না মানুষ—সে চায় স্বাচ্ছন্দ্য। বেঁচে থাকার জন্য খানিকটা জমি তার দরকার। যদি কিছু তরি-তরকারী লাগাবার মতো জায়গা বাড়তি থাকে, তাহলে মহার্ঘ আনাজগুলো সেখানে ফলিয়ে তারা খরচ কমাবার সুযোগ পেত।

যাক গে, ওসব বড় বড় মাথাদের মাথাব্যথার ব্যাপার, তাঁরা আবার নতুন করে মাথা ঘামিয়ে আরো বেশি অপচয়ের কি আয়োজন করেন দেখি! এঁরা যে কিছুতেই মানেন না। আমাদের দেশের মানুষের আর বিদেশের মানুষের প্রয়োজন এক ছাঁচে গড়ে ওঠে নি। এঁরা সেই বিদেশী ছাঁচে তৈরী উন্নয়ন বানিয়ে আমাদের দেশের মানুষ-গুলোকে সেই ছাঁচ মাফিক হওয়ার ফরমাস দিলে তার ফল কিছুতেই শুভ হতে পারে না।

আজ আবার প্রধানমন্ত্রী বায়পুরে বক্তৃতা দিয়েছেন, 'ভাত খাওয়া কমাও, বেশি ভাত খেলে মানুষ অলস হয়ে পড়ে।' জানি না ভাত বেশি খেলে তার জন্যে মাথাও মোটা হয়ে যায় কি না। ফলমূল, আনাজপাতি বেশি করে খাওয়া অভ্যেস করলে, শরীর মজবুত থাকবে, আর খাদ্য সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু আক্রা হয়ে হয়েও চালের যা দাম দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে অন্যান্য আনাজপাতির দাম কতো গুণ বেড়েছে সে হিসেব কে রাখে? তুলনায় অন্যান্য খাদ্য-খাবারের যা দাম বেড়েছে তাতে এদেশের মানুষ চাল আর আটার ওপরই বেশি নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। ক্ষুধার সামনে অন্য কোন সৎপরামর্শ টেঁকে না একথা যদি ভুলে যান নেহরুজী তাহলে তাঁর

বাণপ্রস্থ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আচ্ছা তুমিই বলো ভগবান, মাছ সস্তা হয়েও তিন টাকার কমে নামেনি, আলু, পটল, বেগুনে সব কিছুরই সেই দশা—তা হলে মানুষ খাবে কি! ফল ত গেরস্থবাড়িতে ঢুকতে ভয় পায়—যা দাম!

নেহরুজী শুধু দেশের লোকদের আহার্যের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েই থামেন নি, ডাক্তারদের পরামর্শ দিয়েছেন—'গ্রামে গিয়ে দেশসেবা করো। শহর তোমাদের জায়গা নয়।' 'পাশ করার পর দু-তিন বছর দেশে গাঁয়ে কাজ করার পর তবে কোনো ডাক্তার শহরে এসে চিকিৎসা করার অধিকার পাবে' এরকম আইন বানানোর কথাও তিনি ভাবছেন। তোমার মনে আছে কি না জানি না ভগবান, এর আগে একবার লিখেছি যে, আমাদের দেশের মানুষের সবচেয়ে বড় অসুখের মূলে রয়েছে পুষ্টির অভাব। সেই অভাবটা যাতে আগে দূর হয় সেদিকে নজর দেওয়া জরুরী। অবিশ্যি দেশে-গাঁয়ে ডাক্তারের অভাব খুবই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে নেহেরুর এই কথা ফেলে দেবার মতো নয়। দেশে-গাঁয়ে যে চিকিৎসা-কেন্দ্র গঠিত হবে তাতে স্থানীয় লোকেদের দেওয়া চাঁদাই হবে মূলধন, অর্থাৎ কোনো একজন মানুষের মালিকানা তাতে থাকবে না। আর শহরে-শহরে বড় হাসপাতাল থাকবে, সেখানে আধুনিকতম চিকিৎসার যন্ত্রপাতির বন্দোবস্ত রাখা হবে। দরকার হলে গ্রামের ডাক্তাররা কঠিন-কঠিন রোগীদের এই সব হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে পাঠাতে পারবেন।...কথাগুলো শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু কবে সেই দিন আসবে?

দু-তিন দিন থেকে আকাশ মুখভার করে ছিল। আজই সকাল থেকে টিপ-টিপ, ঝিপ-ঝিপ বৃষ্টি নেমেছে। ছেলেমেয়েদের সবারই স্কুল খুলেছে তবু আজ ওদের বাড়িতেই আটকে রাখলেন উনি। একে ত সবারই সর্দি কাশি হয়েছে। এর ওপর আবার জলে ভিজলে জ্বরজারি না হয়ে যায় না।

কিন্তু আমাকে ভিজে ভিজে একবার রান্নাঘর আর একবার দালান, শোবার ঘরের টানাপোড়েন করতেই হচ্ছে। আজ যদি কাশীতে থাকতাম তাহলে এরা সবাই কেমন জব্দ হতো, ভাবো দেখি।

এই বৃষ্টির মধ্যে ছানাওয়ালা বেরিয়েছে —'ছানা চাই মা! ছানা নেবেন মা!'

দু-তিন দিন আগে পার্কের ওধার দিয়ে ফিরছি, লোকটা, 'মা-মা বলে ডেকে দাঁড় করাল, কোলে একটি বছর তিনেকের বাচ্চা। ওর কাঁধে ছানার বাঁক নেই দেখে প্রথমে চিনতেই পারি নি। পরে অবিশ্যি বুঝলাম। ওই ধারে কাছে বস্তিতে সে থাকে। ওদের বস্তির পাশে একটা ছাতিম গাছ আছে, ফুলে ফুলে গাছটা ছেয়ে গেছে—ছাতিম ফুলের গন্ধে বাতাস মৌ-মৌ করছে। মনে মনে সেই মুহূর্তে ছানাওয়ালার ভাগ্যকে ঈর্ষা না করে পারি নি। ভেবেছি, ওদের অনেক-অনেক অভাব যেমন রয়েছে তেমনি কিছু কিছু সম্পদও রয়েছে—যা আমাদের নেই! ছানাওয়ালার হাঁক শুনে সেই দিনের ছাতিমের গন্ধভরা বাতাস এক ঝলকে যেন আমাকে উন্মনা করে দিল।

—'ছানা দিই মা!'

—আজ মাসের শেষ দিনে কি হাতে পয়সা থাকে? আজ থাক।

—'তার জন্যে কি আছে। পয়সা পরে দেবেন'

ফিরিয়ে দিতে মন সরল না। যদিও জানি যে, পয়সার খুব দরকার আছে বলেই এই শীত-শীতে বৃষ্টিতে ছানার বাঁক ঘাড়ে ঘুরছে লোকটা, ওর কাছে ধারে ছানা কেনা উচিত নয়—তবু ফেরাতে পারলাম না। লোকটার মুখে হাসি লেগেই রইল। আমার মনটা কিন্তু খুব ভারি হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, ওর মনের প্রসারতার কাছে হঠাৎ আমি কেমন খাটো হয়ে গেলাম। কেন এমন হয় বল তো ভগবান!

সকালবেলা ওঁকে একা ঘরে হাসতে দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা আর একটু হলেই পড়ে যেত। সেদিকে নজর রেখে বললাম—হ্যাঁ গো, কি হয়েছে তোমার বলো তো?

—'অঃ! দাও-দাও চা দাও তাড়াতাড়ি।'

—কিন্তু একা-একা হাসির কি হল?

—'তাহলে শোন বলি, গোটা দেশটা পাগল হয়ে গেলে কেমন হয় বলো তো!'

—খামোখা পাগল হতে যাবে কোন্ দুঃখে!

—'এই দ্যাখো একটা খবর। কলকাতায় লুম্বিনি পার্কে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে জানো তো? তা সেখানকার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে, তাদের দাবি-দাওয়া না মেনে নিলে আগামী ডিসেম্বরের ন তারিখ থেকে তারা ধর্মঘট করবে। জানো, সেখানে যারা চাকরি করে, তাদের মধ্যে যারা ম্যাট্রিক পাশ তারা মাসে মাইনে পায় পঁচিশ টাকা। আর যারা ম্যাট্রিক পাশ নয় তাদের মাসিক বেতন কুড়ি টাকা। দারোয়ান আর ঝাড়ুদারদের মাইনে হলো পঁয়ত্রিশ আর ত্রিশ টাকা—একেবারে শুকো মাইনে। আর ডাক্তারদের মাসোহারা সাধারণতঃ একশ টাকা। বুঝে দ্যাখো একবার—এই অবস্থায় তারা বলছে ধর্মঘট করবে। আমার কি বিশ্বাস জানো, এদের পাগল হতে বাকি কিছু নেই—মাসে এই আয় নিয়ে কোনো

মানুষ পাগল না হয়ে বাঁচতে পারে কি? আসলে এটা আমার হাসি নয়, জানো বাসবী! একটা পুরনো গল্প মনে পড়ে গেল।'

—তোমার গল্প শুনতে গেলে আমার উনুন কামাই যাবে, মাসের শেষে কয়লার হিসেব—

—'রাখো। সব সময় হিসেব আর হিসেব। গল্পটা তোমায় শুনতেই হবে—'

নাছোড়বান্দা লোককে নিয়ে কি করা যায় বলো!

উনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন 'এক দেশে এক রাজা ছিল। সেই রাজ্যে একটা কুয়ো ছিল যার জল এক ঘটি খেলেই মানুষ পাগল হয়ে যায়। তাই সে কুয়োর জল খাওয়া বেআইনী করে রেখে ছিলেন রাজা। একবার দেশে অনাবৃষ্টি হল। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। সব শুকিয়ে খট্‌খটে। প্রজারা প্রাণের দায়ে রাজার কাছে দরবার করল —'মহারাজ নিরুপায় হয়ে আমরা এবার ওই কুয়োর জল খাব।' রাজা বিপন্ন হলেন, তাঁর চোখ ছলো-ছলো। বললেন 'না, সে হয় না। ও জল তোমরা খেয়ো না, তাহলে পাগল হয়ে যাবে।'

প্রজারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রাজার হুকুম মানতে পারল না। ভাবল মরে যাওয়ার চেয়ে পাগল হওয়া ঢের ভালো। খেলো একে একে সবাই সেই জল খেলো। তারপর? তারপর যা হবার তাই হল। রাজ্যসুদ্ধ সব্বাই পাগল হয়ে ধেই ধেই উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগল। গোটা রাজ্যে একটিও সুস্থ মানুষ রইল না, রাজা-রাণী ছাড়া। প্রজাদের সেই অবস্থা দেখে রাজা বিমর্ষ হয়ে ভাবলেন 'এতগুলো পাগলকে নিয়ে রাজ্য চালাতে গেলে ত এমনিই পাগল হয়ে যাবো। তার চেয়ে—।' তিনিও শেষে সেই জল খেলেন পাগল হবার জন্যে।...তার সঙ্গে অবিশ্যি এ গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে একটা কথা ভাবো বাসবী এই হাসপাতালের জন্যে সরকার বছরে তিরিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন, কর্পোরেশনও টাকা দেয়, তা ছাড়া রোগীরাও বিনামূল্যে থাকে না—পাগলের তত্ত্বাবধান করা কাজটা সাধারণ আর

পাঁচটা কাজের মতো সহজ নয়, অথচ এর জন্যে ওই বেতন! বাকী টাকাগুলো কি হয়, কে জানে!'

—এতদিন ধরে ওখানকার কর্মচারীরা কি করে চালিয়েছে?

—'খুব কম লোকই ওখানে বেশিদিন থাকতে পারে। অন্য কোথাও কাজ পেলেই চলে যায়। আরও তাজ্জব ব্যাপার, এই অবস্থাতেও আটজন লোককে বরখাস্ত করা হয়েছে! ভাবো একবার!'

কদিন ধরে ইঁদুরের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেছি। ওঁকে বলি যে ইঁদুর মারার ওষুধ কিনে এনো—তা উনি কিছুতেই সেটা মনে করে আনেন না!

আজও আপিস থেকে ফিরলেন একখানা পত্রিকা হাতে করে। দেখে হাড়পিত্তি জ্বলে উঠল, বললাম নিজের নেশার জিনিসগুলি ত আনতে ভুল হয় না! যতো ভুল এই সংসারের দরকারী জিনিসে। যেন এটা আমার একার সংসার।

এমন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন যে আর কথাই কইলাম না। মুখ ভার, মন ভার—এই ভার-ভার ভাব নিয়ে ওঁর সামনেই আর যাবো না। কি আমার এত গরজ? বইপত্তর কেটে একাকার করছে, নণ্টুর একটা প্যাণ্ট কেটে দিয়েছে। সামনে শীত আসছে, গরম জামা-কাপড় কাটবে। কাটুক গে, আমার কি। আমি রিপু করতে পারব না।

খেতে বসে বললেন—'পারশে মাছ ঝাল দিয়ে করেছ দেখছি, বেশ হয়েছে!'

জানি এটা বরফ গলাবার অস্ত্র। কিন্তু আমি অত সহজে কাবু হবার মেয়ে নই। বললাম—এই মাছই ত ওবেলাও হয়েছিল। কই তখন ত কিছু বলো নি?

—'আহা ওবেলা বুঝি টের পাই কি খাচ্ছি? যাক্, শোনো তোমার ইঁদুর মারার ওষুধের কথাটা বলি! আজ সত্যি কিনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হীরেনদা বারণ করলেন। ওই ওষুধ খেয়ে ইঁদুর যদি খাদ্য খাবারে

মুখ দেয় তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কেন না, ও-সব ওষুধে আর্সেনিক দেওয়া থাকে। তার চেয়ে উনি একটা সহজ পন্থা বললেন 'সেটা পরখ করো ত আজ। খানিকটা আটা, চিনি আর সিমেণ্ট এক সঙ্গে মিশিয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে দাও। চিনি থাকার দরুণ ওটা খাবে ইঁদুরে। তার পরই জলতেষ্টা পাবে। আর জল খেলেই রক্ষে নেই—সিমেণ্ট থাকার ফলে, পেটের ভেতরে সবটা জমে যাবে—তখন আর দেখতে হবে না।'

খুব একচোট হেসে বললাম—এ-সব আজগুবী ফরমূলা কোথায় পেলেন তিনি?

—'না, না, হাসির কথা নয়। সত্যি মরবে ইঁদুর।'

—কিন্তু সিমেণ্ট এখন পাই কোথায় আমি!

ওঁর ওপর ভরসা করলেই এই রকম এক-একটা উদ্ভট ফরমাস চাপিয়ে দেন। ছিল একটা ইঁদুর-ধরা কল, কিন্তু তা দিয়ে কাজ চলে না। উনি হাতে করে প্রাণী হত্যা সইতে পারেন না। আর আমি? একটা আরশুলা যদি শুঁড় নাড়ে তাহলেই সেখান থেকে পালাই কেমন ভয় ভয় করে।

শেষ পর্যন্ত ওই সিমেণ্ট কংক্রীটের ওষুধটাই বানাতে হবে যা বুঝতে পারছি। মনের দুঃখে বললাম - এমনিতে ত নিজের কখনো বাড়ি হবে না, ইঁদুরের পেট কংক্রীট করেই সে সাধ মেটাই।

মাইনের কথা যদি ওঠে তাহলে অবিশ্যি লুম্বিনি পার্কের কর্মচারীদের পরেই এসে পড়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা। আমাদের ভারত সরকারের খোদ শিক্ষামন্ত্রীমশাই নিজ মুখে স্বীকার করেছেন যে 'দেশের কোন কোন রাজ্যে শিক্ষকেরা পিওনের কাজ লইয়া পদোন্নতি চাহেন। কারণ, পিওনদের বেতন শিক্ষকদের অপেক্ষা বেশী।' অথচ এই সঙ্গে তিনি এও ঘোষণা করেছেন যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তামাম দেশের প্রত্যেকটি লোককে শিক্ষিত করে ফেলা হবে এ্যায়সা

পরিকল্পনা ফাঁদা হয়েছে। অবিশ্যি শিক্ষামন্ত্রীমশাই বলেছেন যে, যাতে সরকারী কর্মচারীদের সমতুল্য বেতন শিক্ষকরা পান তার বন্দোবস্তও করে ফেলা হবে।

ওপর মহলের শিক্ষকদের অবশ্য ইউ. জি. সি-র কৃপায় কপাল কিছু ফিরেছে। এখন প্রাথমিক শিক্ষকদের দিকে যে নজর পড়েছে এটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে বই কি!

পর পর কদিন ধরে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের দুর্ঘটনার বহর দেখে হাত-পা সবারই পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। মেয়ে দুটো স্কুলে পড়ে— সকালে বেরিয়ে যায়, বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত মাথার মধ্যে একটা অশুভ চিন্তা ঘুরপাক খায়। উনি আপিসে যান, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেরেন ততক্ষণ অবধি (তা সে সন্ধ্যেই হোক আর রাত নটা-দশটাই হোক) অলুক্ষণে 'কু' গায় মনটা। যতোই ভাবি যে, এত লোক যাচ্ছে-আসছে তাদের ত কই মাথাব্যথা পড়ে না, যতো দুর্ভাগ্যের ভাবনা কি আমারই একার! বোধহয় তা নয়! যাদের ছেলেমেয়ে স্কুলে-কলেজে পড়ে, যাদের স্বামী-ভাই-বাবা-কাকা আফিসে চাকরী করে তাদের সবারই নিশ্চয়ই এই রকম মনের অবস্থা হয়— মুখ ফুটে কেউ কাউকে বলে না, তাই জানাজানি হয় না।

দুর্ভাবনার দোষ কি বলো ভগবান? এ বছরের প্রথম ছমাসে শত-করা ২৫৪টি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে স্টেটবাস অর্থাৎ কিনা মোট ৫৫০টি বাসের প্রত্যেকটি বাস গড় পড়তা দুটোর বেশী দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

যদি বলা হয় যে, পথের তুলনায় গাড়ি অতিমাত্রায় বেশী হয়ে গেছে তাই এত দুর্ঘটনা তাহলে অবিশ্যি সত্যের অপলাপ হবে। স্টেট-বাসের চালকেরা মোটেই সাবধানে গাড়ি চালান না। তা যদি চালাতেন তাহলে উল্টো দিকের ফুটপাতে উঠে নিরীহ পথিককে চাকার তলায় ফেলা সম্ভব হত না। তাঁরা প্রায়ই 'রং' সাইড দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেন এবং উল্টোদিক থেকে যে সব গাড়ির

আসার কথা তাদের রীতিমত বিপন্ন করেন। এ ছাড়া হঠাৎ ব্রেক কষে অনেক সময় গাড়ির যাত্রীদের ঝাঁকানী-টোক্কর দিতেও স্টেট-বাসের ড্রাইভারদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। কেন? তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, পুলিশ বেশীর ভাগ সময় স্টেটবাসের ড্রাইভারদের বেআইনী চলাচলকে উপেক্ষার চোখে দেখে যথোচিত শাস্তির হাত থেকে রেহাই দিয়ে থাকেন, কেন না উভয়েই সরকারের নেমক খেয়ে থাকেন। কতকটা ভাই-ভাই ভাব।

কিন্তু এভাবে আর কতো সইবে মানুষ। মাঝে-মাঝে জনসাধারণ ক্ষেপে গিয়ে এই সব এক্সিডেন্টের বদলা নেয় অন্য নিরপরাধ স্টেট বাসের উপর (যেমন সেদিন হ্যারিসন রোডে বাগুওয়ালার ছেলেকে চাপা দেওয়ার পর স্থানীয় লোকেরা অন্য বাসকে রুখে দিয়েছিল, তেমনি আর কি)।

স্টেটবাসের চালক, কনডাক্টার সবাই প্রায় বাংলাদেশের লোক, তাঁরা যদি নিজের আত্মীয়-পরিজনের কথা ভাবেন, তাঁরা যদি মনে রাখেন যে যারা এইসব দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে তারা তাঁদেরই আত্মীয়-স্বজন, তাহলে বোধহয় একটু হাত সামলে গাড়ি চালাতে পারবেন। তুমি কেন তাদের এই শুভবুদ্ধিটুকু দাও-না ভগবান?

আজকাল উনি বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই ফুলকপি আনছেন, দাম নাকি সস্তা। অবিশ্যি এমন কিছু সস্তা নয় তবে উনি আনলে আর আমার সংসারের হিসেব থেকে খরচ হয় না, সেইজন্যেই আপত্তি করি নে। তাছাড়া সময়ের ফুলকপি, কমলালেবু, আম, ইলিশ মাছ এককালে উনি খুব আনতেন। আজকাল ত সে সব অভ্যেস আশ্রয় নিয়েছে স্মৃতিতে—ওই যেদিন হঠাৎ কিছু আনেন সেদিন যেন পুরনো ছবিটা ঝালিয়ে ফিরে পাই।

কপি এনেই ফরমাস করলেন, 'কাল সকালে গলদা চিংড়ি আনা যাবে। নণ্টুবাবুর আপত্তি নেই ত? চিংড়িতে কপিতে যা জমবে!'

নণ্টুকে একবার নাচিয়ে দিতে পারলেই উনি নিশ্চিন্ত। জানেন যে গলদা চিংড়ির নামে আমি চটে যাই তাই এই কায়দা। ওঁকে কতদিন বলেছি, গেরস্থ ঘরে বাগদা পর্যন্ত চলে। গলদার ত মাথা সার, আর দাঁড়াগুলোর ওজনই কি কম। ওতে পড়তা আসে না। কিন্তু সে কথা কে শোনে!

ভাগ্যে নণ্টু তখন দাদাভাইয়ের সঙ্গে কার্তিক পূজোর মতলবে ব্যস্ত ছিল তাই রক্ষে। শুনতে পায় নি। ব্যস্তভাবে হাত জোড় করে ওঁকে বললাম—দোহাই এখন আর নাচিয়ো না তাহলে আমি আর সামলাতে পারব না।

আজ মাসের দ্বিতীয় শনিবার, ওঁর ছুটি আছে, কাজের অতো তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে আমাদের মনটা ভারি হয়েই ছিল। উনি বল্‌লেন— 'গল্প শোনো!' আমরা সবাই বসলাম। উান শুরু করলেন—'আমার বন্ধুটির নাম সুকুমার রায়।'

বোল্টু বলল—'যিনি আবোল তাবোল লিখেছেন?'

উনি মাথা নাড়লেন—'না, তিনি ত বেঁচে নেই। এই সুকুমার রায় জীবিত। তিনি বলছেন, আমরা তখন কিণ্ডারগার্ডেন স্কুলে পড়ি। সুব্রতর মা তাকে সঙ্গে এনে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। ওর চেয়ে বয়সে বড় বলে প্রথম দিন থেকেই সুব্রতর দায়িত্ব যেন নিজে থেকেই আমি নিয়ে ফেললাম। তা সেই প্রথম দিনেই সুব্রত স্কুলের বেড়ালের পিছু পিছু ধাওয়া করে স্কুলময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল। এক সময় যখন বেড়ালটা তার পায়ের নাগালের মধ্যে এসে পড়ল, যখন সে অনায়াসে বেড়ালটাকে পা দিয়ে বলের মত কিক্ করতে পারত তখন কিন্তু সে পা তুলল না, লাথিও মারল না। সেই প্রথম দিনের সুব্রত। কিন্তু বড় হয়েও প্রকৃতিতে কিছু মাত্র পাল্টায় নি। কখনো সে কোনো মানুষকে আঘাত করে নি—সে ধাওয়া করত, হয়তো পরাস্ত করি করি অবস্থা পর্যন্ত এগিয়ে যেত, কিন্তু কখনো তার শালীনতা-শোভনতার চেতনা ডিঙ্গিয়ে সে কাউকে আঘাত করে নি। সে খুব হাসত—হাসি তামাশায় সে প্রাণোচ্ছাস ছিল। শেষকালে সে হাসতে হাসতেই বিদায় নিয়েছে।'

এতো হাসি একটা মানুষ কোথায় পায়। এ কাহিনী শুনে কান্না এড়াবার জন্যে চলে এলাম এ ঘরে। আচ্ছা ভগবান, এতো কষ্ট কেন হচ্ছে? সুব্রতই কি সব হাসি নিংড়ে নিয়ে চলে গেলেন। আচ্ছা, এখন তাঁর মা, স্ত্রী, ছেলে সঞ্জীবের মনের কি অবস্থা? তাঁদের তুমি সান্ত্বনার শান্তি দেবে কি?

বেলার সঙ্গে বেশ কিছুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাই আজ দুপুরে ওর বাড়ি এলাম। ওর ঘরে একটি বউ বসে রয়েছে, মুখ চিনি এখানেই এর আগে দেখেচি। আমাকে দেখে বউটি মোটই খুশি হয় নি। তার মুখের চেহারাতেই লেখা আছে। বেলাকে বলল—'শোনো বেলুদি একবারটি।'

মিনিট পাঁচেক পরে বেলা ফিরল থম্‌থমে মুখে।

—কি হল ?

—'আর বলো না দিদি। মানুষ গরীব হয়, মূর্খ হয়, তা বলে এতখানি বোকা হতে যাবে কেন ?'

—আরে কি হয়েছে বলই না।

—'হবে আবার কি ? মেয়েমানুষের ঘোড়া রোগ হলে সে কি আ· বাঁচে ! উনি রেস খেলেন জানো ?'

—কে ? ওই বৌটা ?

—'হ্যাঁ গো ! ইদিকে ত দিন চলে না। মাঝে সাঝে দু-চার টাকা ধার ত লেগেই আছে। তা সে আমি কিছু মনে করি নে, অভাবে পড়লে সবাই নেয়, আমিও নিই। কিন্তু ওর কোন্ দেওর নাকি কবে রেসের পয়সায় কলকাতাতে বাড়ি তুলেছিল—তাই বলে তুই গয়না বন্ধক দিয়ে ঘটি-বাটি বেচে জুয়ো খেলবি ? আমি বাবা ওসব পাপের বালাই বরদাস্ত করব না—সাফ কথা।'

বেলা খুবই চটেছে।

এই নিয়ে ওর সঙ্গে কথা হতে উনি বললেন—'এর জন্যে মানুষের দারিদ্র্যও অনেকখানি দায়ী। যখন সিধে রাস্তায় তেমন আয় হবার আশা থাকে না, অথচ একটু সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকার স্বপ্ন দেখা সে ছাড়তে পারে না তখন লটারীর টিকিট কেনে, তাসের জুয়ো খেলে। রেসের মাঠের আশপাশে গিয়ে বুকীর শরণ নিয়ে রেস খেলে। এ বছরের হিসেবে এই কলকাতায় রেস্‌সুড়ের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় নাকি শতকরা চল্লিশ হারে বেড়েছে। একদিনের হিসেবে দেখা গেছে যে, গত বছরে ওই দিনে বারো হাজার লোক মাঠে গিয়েছিল আর এ বছরে গেছে সতেরো হাজার। অবিশ্যি অভাব ঘোচাবার জন্যে রেস খেলাটা ডাহা ভুল। ক-জনই বা টাকা পায় ?'

এসব কথা ওই বৌটাকে কে বোঝাতে পারবে। বেলা যে ওকে টাকা দেয় নি বুদ্ধি করে—ভালোই করেছে।

দোষ কার? হাইকোর্টের রায় অবশ্য ন্যায় বিচারের নিরীখ দিয়ে দেখিয়েছেন, আইন যারা মানে নি দোষ তাদেরই। না, আদালত আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, পৌরসভার চিঠিপত্রের জবাব যথাযথ দেওয়ার সাধারণ ভদ্রতাটুকুও পুলিশের কর্তব্য ছিল-- সেই কর্তব্যে অবহেলা আদৌ সমীচীন হয় নি। কর্পোরেশন আইনরক্ষার জন্য কলকাতার পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, আর পুলিশ সাহায্য করে নি-- এই হল সার কথা!

গোলমালটার গোড়ার কথা এই: একডালিয়া আর রাসবিহারী এভেন্যুর মোড়ে একদা দেখা গেল কয়েকজন লোক বিজ্ঞাপন বিলোচ্ছে —ওই মোড় একটি 'হকার্স কর্ণার' করবার সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে। ব্যস, তারপর মোড়ের ফুটপাতে বাজার বসে গেল। দেখতে দেখতে স্টলের খদ্দের আর মালপত্রে জনসাধারণের চলাচল ফুটপাথে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল। ওখানকার এক বাড়ীর মালিক বিপন্ন হয়ে কর্পোরেশনের দরবারে হাজির হলেন—দোকানপাটের উপদ্রবে তাঁর বাড়ীতে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তা জুড়ে এই বিপণি-উপদ্রবটা কর্পোরেশন যেন অবিলম্বে বন্ধ করেন। কর্পোরেশনের কর্তারা তখন পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখে সাহায্য চাইলেন! জবাব নেই। বাড়ীর মালিক নিজেও পুলিশের কাছে দরবার করলেন। সাড়া পাওয়া গেল না। বাড়ীর মালিক আশা করেছিলেন যে, কর্পোরেশন নিজেই হয়তো উদ্যোগী হয়ে এই বে-আইনী দোকান-পাট সরানোর জন্য আদালতের সহায়তা গ্রহণ করবেন। কর্পোরেশন তা করে নি। অগত্যা বাড়ীর মালিক-মশাই হাইকোর্টে মামলা রুজু করলেন, সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে।

সেই মামলার রায় দেবার সময় মাননীয় বিচারপতি যে সব মন্তব্য করেছেন সেগুলি আমরা জানি তবু নতুন করে কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে যে, এগুলো জেনেও যেন ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। আমার স্বামী

রায়ের একটা অংশ পড়ে শোনালেন—'The present condition of footpaths flanking public streets in Calcutta and its suburbs is nothing short of scandalous. All kinds of obstructions—hawkers, itinerant beggars, stray cattle, rubbish heaps and everything conceivable on earth is allowed to crowd footpaths and footways meant for the convenience of pedestrian traffic. It is almost forgotten that members of the public using the footpaths have a legal right of unobstructed user thereof and that there is a legal liability on the part of the Municipal and the police authorities to see that this right is maintained.'

আসল কথাটা হল আমরা প্রতিনিয়ত অসুবিধাকে মেনে নিয়ে অশান্তিকে এড়িয়ে যাবার জন্য নিজেদের ক্ষুণ্ণ অধিকারকে ভাগ্যের লেজুড় হিসাবে মেনে নিয়ে খাপ-খাওয়াবার ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছি। আর সেই সুযোগটা পুরোদস্তুর অন্যেরা গ্রহণ করছে। ফুটপাথে দোকান-বাজার আজকাল কলকাতার দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে জনসাধারণকে গাড়ী চাপা পড়ার আশঙ্কা অগ্রাহ্য করেই পথের ওপর দিয়ে চলাচল করতে হয়। আর কলকাতার দুর্ঘটনা এই জন্যে কতো বেড়ে চলেছে সে হিসাব কে রাখে!

পুলিশের তরফ থেকে সোজা কৈফিয়ৎ, এই সব স্টল বা হকারদের বিরুদ্ধে আইনের খবরদারী প্রয়োগ করতে গেলে গোলমাল হতে পারে—অশান্তির ভয়ে শান্তি বজায় রাখার জন্যই নাকি পুলিশ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু চিঠিপত্রের জবাব দেওয়ার মতো অভব্যতার স্বপক্ষে কি যুক্তি দর্শাচ্ছেন পুলিশের কর্তারা? না, না, এটা ভব্যতা বা ভদ্রতার কথা নয়—আইনে আছে যে, পথঘাটের বাধাবিপত্তি অপসারণের ব্যাপারে কর্পোরেশনকে সাহায্য করতে কলকাতার পুলিশ বাধ্য। আদালত পুলিশকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অধিকার আর অনধিকারের কথা যখন উঠল তখন কালকের একটা

ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। শ্যামবাজারের মোড়ে তেত্রিশ নম্বর বাস থেকে নামবো, গাড়ীখানা তখনো স্টপেজে থামে নি। আমার পিছনে আরও এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সামনে একজন অল্পবয়সী ছোকরা হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে—। আমরা নামবার আগেই বাসে ওঠার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ছোকরাটি রড্ ধরে পথ রুখে দাঁড়িয়ে বলল—'আগে নামতে দিন, তারপর উঠবেন!'

ওদিকে উঠে-পড়া একজন রীতিমত ধমক দিচ্ছে—'ছাড়ুন, আমরা আগে ঢুকব।'

ছোকরাটি শক্ত-হাতে রড ধরে পথ আগলে বলল—'আগে মেয়েদের নামতে দিন। নেমে দাঁড়ান!'

—'ছাড়ুন বলছি!'

দু তরফে নরম-গরম লড়াই।

আমাদের পাশেই কণ্ডাক্টার পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন তাকে তামাশা দেখবার জন্যে নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

অবশেষে কিন্তু চোখ-গরমের পক্ষে আইন-ভাঙার দিকেই কণ্ডাক্টার রায় দিল, বলল—'ছেড়ে দিন না মশাই!'

যিনি উঠে-পড়া দলের ক্যাপ্টেন তিনি আমাদের ঠেলে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভিতরে ঢুকলেন। যেন আমরা তাঁর পথ আগ্‌লে খুব অন্যায় করেছি। ভাগ্যে নামবার আগে, বাসখানা ছেড়ে দেয় নি এই বাঁচোয়া।

তোমার কাছে এই ন্যায়-অন্যায় মেয়েলি নালিশ করতে আদৌ ইচ্ছে নেই। আমরা মেয়েরা আর আগের আমলের মেয়ে নই, পুরুষেরাও আগেকার মতো, সভ্যতাবিশিষ্ট মানুষ নয়—তবে কোথায় বাধে জানো, হাজার রাগ হলেও পুরুষদের মতো অতোটা অভদ্র বা নির্লজ্জ হতে পারি না। যতদিন সেটা বাকি আছে ততোদিনই যা কষ্ট। তার মানে আমাদের পরের যুগের মেয়েরা তাদের যুগের পুরুষদের দেখাদেখি নির্লজ্জ হয়ে উঠবে। তখন ঘর ঘুচবে, বাইরেও অশান্তির চরম হবে।

মেয়েদের লজ্জার কথা বলতে সেদিনের একটা ঘটনার কথা মনে

পড়ে গেল। বেলা ওর ননদকে নিয়ে বেড়াতে এল—পশ্চিমে তার শ্বশুরবাড়ী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, কথাবার্তায় বেশ আস্থুরে-বাস্থুরে। কি কথায় বেলা বলল—'বাসবী দি, দাও না তোমার কর্তাকে বলে সদারঙ্গ কনফারেন্সের একটা পাস জোগাড় করে! টুনিকে একদিন গান শোনাই।'

টুনি ওর ননদ, পাসের কথায় প্রথমে হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর জোড়হাতে বলল—'না, না, পাসের ফেরে আমি আর যেতে চাই নে বৌদি!'

আমি কিছুই বুঝি নি, হাঁ করে একবার এর মুখের দিকে তাকাই আর একবার ওর দিকে!

শেষে টুনি বলল—'দেখুন ভাই, তাহলে খুলেই বলি—এমনি পাশে ত কতোবার সিনেমা, থিয়েটারে গিয়েছি! কিন্তু রেলে চড়তে গেলে বরাবর টিকিট কেটেই যেতে হয় জানি। এবার যখন কলকাতায় আসব আমার জ্যাঠাশ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে। তিনি আগে রেলে চাকরী করতেন, বুড়ো মানুষ, সরল মানুষও বটে। স্টেশনে এসে ওঁর চেনা একজনের সঙ্গে দেখা, সে ভদ্রলোকও কলকাতায় আসছেন। সে ভদ্রলোকের ফ্যামিলি পাস আছে—বৌ-ছেলেকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। ব্যস, জ্যাঠাশ্বশুর মশাই পেয়ে বসলেন, রেলের লোকেদের এই এক বদভ্যেস, ফাঁকি দিতে পারলে তারা রেলকে পয়সা দিতে নারাজ। ঠিক হল, আমি আর আমার ছেলে সেই ভদ্রলোকের পাসে দিব্যি চলে আসব। আমি কি জানি যে পাসে আসা মানে সত্যি-সত্যি দখলে চলে যাওয়া! ভদ্রলোক আমার খোকাকে আগেই বলে দিলেন, তুমি আমাকে বাবা বলবে, বুঝলে!

'কথাটা কানে খচ্ করে বাধল।'

'খোকনকে আড়ালে চুপিচুপি বললাম—কিছু বলতে হবে না, ওঁকে তুমি ডেকো না।'

'তারপর গাড়ীতে আমরা সব পাশাপাশিই বসেছি। তেমনি

ভিড়ও বাপু। কিন্তু ঘুম ত ভিড় মানে না! ঘুমিয়ে পড়েছি বসে বসেই। এক সময় আচম্কা ঘুম ঘুচে গেল। চেয়ে দেখি আমার জামার উপর এ কার হাত? সোজা হয়ে উঠে বসলাম। পাসের খাতিরে ত আর এসব আস্কারা দেওয়া যায় না। গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল, রাগও হল। জ্যাঠাশ্বশুর মশাইয়ের নাক ডাকছে। তা ছাড়া এসব কথা কি মুখ ফুটে বলা যায়! তবে সেই রাতেই সংকল্প করেছি, জীবনে আর পাসের ফাঁসে নাক গলাচ্ছি নি বাবা!'

বেলা বলল—'থাম দেখি! ছুনিয়ার সবাই ত আর রেলের লোক নয়। জানিস্ আমাদের পাড়াতে রায় মশাই ছিলেন, তাঁর বৌ তখন আসানসোলে চাকরী করে। রায় মশাই করতেন কি, ফি-হপ্তাই যেতেন বৌয়ের কাছে, তার জন্যে খরচ হত মাত্তর দু টাকা।'

—কেমন করে?

—'আরে, দু-টাকায় দুদিনের জন্যে একটা রেলের কর্মচারীর কোট ভাড়া করতেন। তা শেষকালে অবিশ্যি থোক কুড়ি টাকায় নাকি আস্ত কোটখানাই কিনেই নিয়েছিলেন। হপ্তায় দু টাকা, মানে মাসে আট টাকা করে খরচ, অনেক! তার চেয়ে এ কতো সস্তায় হয়ে গেল।'

—যাঃ বাজে কথা!

—'সত্যি-মিথ্যে জানি নে ভাই, রায় মশাইয়ের মুখেই শুনেছি একথা!'

ওরা চা খেয়ে বিকেলে উঠল। এবার একটু সংসারের কাজ করি।

৩৫

ওঁর সঙ্গে সেদিন বিকালে একটু বেরুবার ভাগ্য জুটে গেল। ছোট্ট একটু কাজও ছিল, রমার জন্যে সোয়েটারের উল কেনা। পুরনো সোয়েটারটা ছোট হয়ে গেছে—অবিশ্যি ক্ষমাও এক বছরে দ্যাখ-না-দ্যাখ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মেয়ের ইচ্ছে একটা 'ক্লোক' কেনে। আমার তাতে খুব মত নেই, দোকানে গিয়ে উনি মেয়ের পক্ষ নিলেন —'ক্লোক কি এমন মন্দ দেখতে ?'

দেখতে মন্দ যত না-হোক দামের দিক দিয়ে অনেক বেশি। তাই আমি আপত্তি করলাম ফ্রকের সঙ্গে ও জিনিস মোটেই মানবে না।

উনি হাসলেন—এ পোষাকটা যে দেশ থেকে এসেছে শুনলে অবাক হয়ে যাবে তুমি, সে দেশের মেয়েরা শাড়ী পরে না, ফ্রকই তাদের অবশ্য পাঠ্য !

এখানে পাঠ্য বলতে যে পরিধেয় বোঝাচ্ছে তা আমি জানি, বাঁকা কথা বলবার সময় উনি এ ধরণের উক্তি হামেশাই করেন। দোকানে অন্য লোকের সামনে এভাবে আমার অজ্ঞতাকে কটাক্ষ করায় মনে মনে দুঃখ পেলাম, মুখে শুধু বললাম —তা বেশ ত নাও তাহলে—

রমার ইচ্ছে থাকলেও ক্লোক নিল না, উনি বললেন—'থাক গে। তোমার যখন এতই আপত্তি !'

রেডিমেড সোয়েটারও পছন্দসই পাওয়া গেল না সেই দোকানে। পথে বেরিয়ে রমা বলল—'ভালো উল কিনে নাও মা, তুমি বাড়িতে তৈরী করে দেবে ফুলহাতা—সেই ভালো হবে।'

কথাটা মনে ধরল। গরম জামা একটা কেনা মানেই সে মাসে টানাটানি করে সংসার চালানো।

মেয়ের কথা শুনে উনি বললেন—'এ কদিন ইস্কুলে যাবি কি করে। সাত সকালে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ত টনসিল বাড়িয়েছিস।' রমার অবিশ্যি গরম-জামার অভাবে ঠাণ্ডা লাগার কথা নয়, আমার চাদরটা নিয়ে কদিন যাচ্ছে। না হয় আরও কটা দিন সেইভাবেই চলবে। উলই কেনা ভালো।

উলের দোকানে হঠাৎ দেখা মন্দাকিনীর সঙ্গে। প্রথমে ও-ই আমাকে চিনেছে। আমি অবাক হয়ে ওকে দেখছিলাম, হাতের ছাতাটা আগের মতোই আছে। হাসি পেল, রোদ লেগে রং ময়লা হয়ে যাবে বলে, বাড়ি থেকে বেরুলেই মন্দাকিনীর ছাতা নিয়ে বেরুনোর অভ্যেসটা এখনো রয়েছে! ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল—'জানিস আমি বিয়ে করেছি? এই তিন বছর সাত মাস এগারো দিন হল আজ।'

কথাটা বলবার সময় ওকে কেমন কেমন দেখালো। তার অবিশ্যি কারণও আছে। যাকে ও মনে মনে ভালোবাসতো, তাকে বিয়ে করতে পারে নি। তাই কুমারী হয়ে জীবন কাটাবে বলে স্কুলে চাকরী নিয়ে মফঃস্বলে চলে গিয়েছিল।

মন্দাকিনীর পাল্লায় পড়ে ওর সঙ্গে আমাদের যেতে হল, কোনো ওজরেই ও কান দিল না। ওর স্বামী কলেজের প্রফেসার এবং সেই কলেজের হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ওদের কোয়ার্টারটিও লোভনীয়। দুই কর্তায় দু-মিনিটেই বেশ আলাপ জমে উঠল। ঘর-কন্নার চেহারা দেখে, মন্দাকিনীর কথার সুরেও মনে হল, সুখেই আছে।

ভদ্রলোক বেশ সদালাপী। কিন্তু আমাদের ঘরোয়া গল্পে বাধা পড়ল, 'ভিজিটার'! বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন ভদ্রলোক। মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে যেন আমাদের কাছে পরামর্শ চাইলেন —'এখন, এ সব লোককে নিয়ে কি করি বলুন তো? তোমার বদলার

চাকরী, আজ এখানে আছো, দরকার হলে সরকার কাল তোমাকে দিল্লীতে ট্রান্সফার করতেই পারে। যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাকে এই শীতের সময় দার্জিলিংএ ট্রান্সফার করেছে। ওঁর ছেলে যেহেতু আমার হস্টেলে থেকে পড়ে, সেহেতু আমি চোর দায়ে ধরা পড়েছি। ওঁর ইচ্ছে যে, আমি সরকারের কাছে এই বলে দরবার করি যে, এখন ওঁকে ট্রান্সফার করলে ছেলের পড়ার ক্ষতি হবে—অতএব হুকুম যেন রদ করা হয়। যতো বলি যে, ছেলে ত হস্টেলেই থেকে পড়াশুনো করছে, সে বাপের কাছে বসবাস করে না—সেক্ষেত্রে আমি কি করে এ সব যুক্তি ওঠাবো? শেষে আমারই চাকরী যাক আর কি! বললাম যে দার্জিলিং-এও সরকারী কলেজ আছে, সেখানে যাঁরা অধ্যাপনা করেন, তাঁরাই বদলী হয়ে কখনো কলকাতায় কখনো কুচবিহারের কলেজে পড়াতে আসেন, কাজেই যদি তিনি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভর্তি করে দ্যান তাতেও তার পড়াশুনো হতে পারবে। না, তা নয়, ভদ্রলোক চান কলকাতায় থাকতে। ছেলের পড়ার ক্ষতি হওয়ার অছিলা ছাড়া অন্য সব রকম তদবির করে ব্যর্থ হয়ে শেষে এইটাই আঁকড়ে ধরেছেন। অনেক করে বোঝালাম; আমার মায়ের অসুখের সময় নিজে তদবির করেও আমার বদলী বন্ধ করতে পারি নি, সে কথাও বলেছি তবু তিনি ভয় দেখিয়ে গেলেন যে আবার কাল আসবেন।'

তারপর দুই আদর্শবাদীতে শুরু হয়ে গেল আত্মসমালোচনা। না, তার সঙ্গে মন্দাকিনীও যোগ দিল. ও বলল—'এ শহরের লোকের কথা আর বল না। এই যে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ফট্ করে বলে বসলেন, খবরের কাগজওয়ালাদের দোষেই জাতির সর্বনাশ হতে বসেছে! কেন? না, কর্পোরেশনের ভেতরের গলদগুলো কাগজে প্রকাশ করাতে লোকের মনে সন্দেহ হচ্ছে পৌরসভার মধ্যে অসাধুতা রয়েছে। তার ফলে নাকি সাধারণ মানুষেরা চুরি-জোচ্চুরি শিখছে। মোদ্দা, যদি চুরি-চাপাটি হয়ও তবু সেটা কাগজে প্রকাশ করা ঠিক নয়: তার চেয়ে যারা চুরি করছে. কেবলমাত্র তারাই ক্রমাগত চুরি বাড়িয়ে

চলুক, আর দেশের লোক সাধু থাকুক—তাতে যদি কলকাতা শহরে আলো-জ্বলা বন্ধ হয়ে যায়, যাক না!

মন্দাকিনীর স্বামী বললেন -'তুমি যেভাবে ফতোয়া দিচ্ছ তাতে মনে হচ্ছে আমরা সবাই চোর! তা কিন্তু ঠিক নয়।'

'না, না, সেটা আমার বলার ইচ্ছে নেই। তবে একটা কথা ঠিক যে, গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা শহরের লোকেদের মতো স্বার্থপর নয়। সেখানে মনুষ্যত্বের চিহ্ন এখনো পাওয়া যায়। এই ধরো না মেদিনীপুরের কথা, শহীদ ক্ষুদিরামের গ্রাম মোহবনীতে শ্রমদান যজ্ঞে যে সাড়া পাওয়া গিয়েছে সেরকমটা এই কলকাতা শহরের কাউন্সিলার কিম্বা নাগরিকের কাছ থেকে তুমি পাবে?'

বলেই মন্দাকিনী খবরের কাগজ মেলে ধরে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল - মোহবনী, এসুয়া, রাণীগড় প্রভৃতি কুড়িখানা গ্রামের স্বেচ্ছা-শ্রমিকগণ ঝুড়ি-কোদাল লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে বাহির হইলে চারিদিকে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং দলে দলে গ্রামবাসীরা ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। কুমারী অঞ্জলিরাণী বসু, আভারাণী বসু, পদ্মাবতী পালধি প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলাও যোগ দেন। বেলা এগারোটা পর্যন্ত কাজ চলে এবং প্রায় ½ মাইল রাস্তার সংস্কার হয়।

আমার স্বামীর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে মন্দাকিনীর স্বামী রায় দিলেন 'এ ত একটা জায়গায় মাত্র হুজুগের নমুনাও হতে পারে! সব জায়গায় ত আর হচ্ছে না।'

মন্দাকিনী হাসতে হাসতে বলল 'জানি তুমি এইরকম একটা উড়ো ফতোয়া দেবে। কিন্তু তারও জবাব আছে। তোমাদের ইংরেজী কাগজ থেকে আর একটা নজীর হাজির করছি দাঁড়াও!'

অবাক হয়ে দেখলাম, মন্দাকিনীর চলা-বলার ধরণটা। চট্ করে টেনে বার করল খবরের কাগজের একটা পৃষ্ঠা, তাতে লাল পেন্সিলের দাগ মারা। আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ও সৌজন্যের হাসি হেসে

বলল—'কিছু মনে করবেন না মিষ্টার মজুমদার, তর্কে পড়ে আলাপটা একটু কাট-কাট হয়ে যাচ্ছে।'

উনি হাত নেড়ে বললেন—'বিলক্ষণ! আপনি পড়ুন দেখি খবরটা—'

—দার্জ্জিলিং-এর খবর :

Construction of Phunchoting-Paro Road is going on in full speed. During the last 18 days 15 miles of road has been constructed. The Road is now Jeepable up to Chuka, midway between Paro and Phunchoting. It is expected that the entire 120-miles road will be completed by May 1961.

Bhutan's National Council has promulgated an order whereby all Bhutanese must give six weeks compulsory labour for Road construction. About 9000 persons are working at a time. There is a great enthusiasm among the Bhutanese some of whom willingly trekked three weeks from their homes to reach the worksite.

—'তা নয় বুঝলাম। রাস্তা তৈরী করছে ভুটানীরা, পনের মাইল পথ আঠারো দিনে তৈরী করছে, তাও নয় মানলাম। কিন্তু তাতে এ শহরের লোকেদের মনুষ্যত্বের অভাবটা কি দেখলে তুমি।'

—'তুমি ত কলেজের ছাত্র আর বই ছাড়া কিছুই দ্যাখো না। গোটা কলকাতার কতগুলো পথ তচনচ অবস্থায় মাসের পর মাস পড়ে আছে তা দেখেচ! এদিকে তোমার কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা গদী গরম করা ছাড়া আর কোন্ কম্ম করেন? যাক গে, বাসবীদের ধরে এনে আমাদের ঝগড়া দেখালাম, খানিকটা মজা পেয়ে গেল ওরা। এবার একটু চা-টা করি, তুমি গল্প করো।'

মন্দাকিনী ঘর থেকে যেতেই ওর স্বামী বললেন—'একেবারে ছেলেমানুষ, বুঝলেন! ওর কেবল বায়না। এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি। অবিশ্যি মফঃস্বলে গেলে ও অনেক কাজও করে। বুঝলেন না, ছেলেপুলে ত নেই, কাজই ওর অবলম্বন।

উনি একখানা 'খুচরা বাজারে মেট্রিক ওজন' ছাপানো কাগজ আমার হাতে দিলেন, আপিস-ফেরৎ। কাগজখানা পেয়ে যেন বেঁচে গেলাম, বললাম—কোথায় পেলে ?

জবাব না দিয়ে জামা-জুতো ছাড়লেন। তারপর নিজের প্রিয় জায়গাতে বসে কতকটা স্বগতভাবেই বললেন—'অনেক দুঃখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এ মাটির এমনই গুণ যে এখানে কমলা-লেবুর চারা পুঁতলে তাতে গোঁড়া-লেবু ফলে। এই সরকারী ইস্তাহারই তার নজীর।'

—কেন ? এ তো সুন্দর হয়েছে।

—'ছাই হয়েছে। এই ত্যাখো, আমার কাছে কাগজটা আনো, ভুলটুকু চোখে আঙুলদাগা করি।'

তারপর শুরু হল ওঁর মাষ্টারী : বাজারে দু-রকমের বাটখারা ব্যবহার হবে : ঢালাই লোহার আর পিতলের। ছোট ছোট ওজনের বেলায় পিতলের বাটখারার দরকার। কেন না, ঢালাই লোহার বাটখারায় অত সূক্ষ্ম ওজনের মাপ তৈরী করা যাবে না। গোলমালটা সেই পিতলের বাটখারার ব্যাপারে। সরকার দেখাচ্ছেন :

পিতল

কিলোগ্রাম	গ্রাম	গ্রাম
	৫০০	৫
	২০০	২
	১০০	১

কিন্তু মাঝখানে আরও একটি শ্রেণীর বাটখারা তৈরীর প্রয়োজন আছে, সেটা দশককে ভেঙে ভেঙে ওজন করার জন্য। সেই শ্রেণীর বাটখারা তৈরীও হচ্ছে, ব্যবহারও হবে তা—কিন্তু ইস্তাহারে সেটা ছাপা হয় নি—অথচ কতো লাখ এই ভুল ইস্তাহার ছাপা হয়েছে কে জানে। ওটা হওয়া উচিত ছিল এই রকম ঃ

পিতল

কিলোগ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম
১	৫০০	৫০	৫
	২০০	২০	২
	১০০	১০	১

ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগলেও শেষে বুঝলাম। এবং জানলাম যে, এই ইস্তাহার এখন বিলি করা নিয়ে সরকার বেশ ফাঁপরেই পড়েছেন। অথচ উদ্দেশ্যটার মূলে ভালোই ছিল। তবে কি বুঝব যে, যাঁদের ওপর এসব কাজের ভার পড়েছে তাঁরা অনুপযুক্ত ?

আজ তোমার কাছে গোটা দুই খবর পাঠাচ্ছি, এ থেকেই বুঝতে পারবে যে আইনের চোখে যারা রক্ষক বলে পরিচিত তারা কতোখানি ভক্ষণের আওতায় এসে পড়েছে। খবরগুলো একদিনের বা একটা বিশেষ কোনো অঞ্চলের হলে হয়তো ততো দুর্ভাবনা হতো না, কিন্তু এর গুরুত্ব অন্যত্র।

১. ভদ্রেশ্বরের ওপর দিয়ে, না, শুধুমাত্র ভদ্রেশ্বর কেন বাংলাদেশের যে কোনও ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে মালবাহী ট্রাকগুলো যখন উল্কার বেগে ধেয়ে চলে তখন পথচারীদের প্রাণ নিয়ে বাঁচা বহু ভাগ্যের ফল, একথা মানতেই হয়। কলকাতা না হয় সহর, কিন্তু তা বাদে বিস্তীর্ণ বাংলার মফঃস্বলের ভেতর দিয়ে এই ট্রাঙ্ক রোডগুলি চলে গেছে। এবং হামেশা দেখা যায় দুর্ঘটনাও ঘটছে। এই সেদিন ভদ্রেশ্বরের গোরাচাঁদ ঘোষ নামে একটি স্কুলের ছেলে ট্রাকের তলায় পড়ে মরল, তারও কদিন

আগে একজন বয়স্ক লোকও মরেছে। তার ফলে ও-অঞ্চলের মানুষ ক্ষেপে গিয়েছে: স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, জি টি রোড প্রায় মগের মুল্লুকে পরিণত হইয়াছে, যত জোরে খুশী লরী চালাও যাহাকে খুশী চাপা দাও--বলিবার বা দেখিবার কেহ নাই।'

শ্রীমান গোরাচাঁদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া ভদ্রেশ্বরের এতদিনের অসন্তোষ বুঝি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। শনিবারে বালকের মৃতদেহ লইয়া মানুষের মিছিল বাহির হইয়াছে; ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলা লরী-গুলিকে আটক রাখিয়া নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করা হইয়াছে। পরের দিন ভদ্রেশ্বর পৌরসভার এক বিশেষ অধিবেশনে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। আগামী রবিবার একটি জনসভা হইবার কথা আছে।

পুলিশও অবশ্য বসিয়া নাই। এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ডজনখানেক লোককে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

॥ ২ ॥ কলিকাতা—২।১২।৬০ : পুলিশ কমিশনার উপানন্দ মুখার্জির নিকট এই মর্মে সংবাদ আসে যে, সোনাগাছি এলাকায় অবাধে বে-আইনী মদ বিক্রয় এবং আরো নানাপ্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ চলিতেছে। অভিযোগ আসে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পুলিশ এই সমস্ত অপরাধ দমনে শিথিলতা দেখাইতেছেন।...গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার বুধবার (মদ্যহীন দিবস) রাত্রে উক্ত এলাকায় যাইয়া দেখিতে পান যে, কতগুলি দোকান হইতে অবাধে মদ বিক্রয় হইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতি সত্বেও ইহা চলিতেছে।...

অবশ্য এক্ষেত্রে একজন পুলিশ অফিসারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

এই খবরগুলো আমার মাথায় পোকার মত কামড়াচ্ছে। এই সঙ্গে সৎ এবং সাহসী পুলিশ কর্মচারীদের দুঃখজনক মৃত্যু বা বলা যায় অপ-মৃত্যুগুলিও মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মুরারি ঘোষালের কথা, যিনি এই কিছুদিন আগে বে-আইনী মদ চোলাই ধরতে গিয়ে প্রাণ দিলেন।

মনে পড়ছে আসানসোলের সাব ইন্‌স্পেক্‌টর মতিলাল সরকারের কথা —যাঁর মৃত্যুর রহস্য আজ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হল না।

অর্থাৎ অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ যদি কেবলমাত্র চাকরী বজায় রাখবার জন্য, শুধুমাত্র সংসার প্রতিপালনের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কেরাণী-গিরির বদলে পুলিশের চাকরী করেন তাহলে আইন বাঁচে না, শাসন চলে না, অপরাধীর দণ্ড বিধান ঘটে না। তাতে হয়ত নিজের প্রাণ বাঁচতে পারে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটুকু অটুট থাকতে পারে। অন্যথায় অর্থাৎ কিনা পুলিশের দায়িত্ব ষোল আনা পালন করতে গেলে তার জন্য প্রাণ সংশয় ঘটতেও পারে। তা বলে প্রাণের মায়াতে অথবা অর্থের লোভে যদি কোনো পুলিশ কর্মচারী অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলায়, কিম্বা কোনো সাধারণ লোক যদি পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ আনে তাহলে সাধারণ বা সামান্য মানুষটিকে অমানুষিকভাবে দমন করলে সমাজের চোখে এবং আইনের চোখে সে ব্যক্তি কি আদর্শ স্থাপন করবে ?

*　　*　　*　　*

এবার এখনো তেমন চেপে শীত পড়ে নি, তা না পড়ুক, কমলালেবু কিন্তু কড়া শীতের মতোই সস্তা হয়েছে। এরই মধ্যে আমি বাড়ীর দরজায় লেবু কিনেছি টাকায় চৌদ্দটা করে, না একেবারে ছোট নয় মাঝারি। ওঁকে বড়াই করে বলতে গেলাম, একটু হেসে টিপ্পনী কাটলেন—'ওতো নাগপুরী।'

—তাতে কি হয়েছে ! দার্জিলিং-এর লেবু পাচ্ছি কোথায় ?

'—আহা অমন কথা ব'ল না। সরকারী খবরে বেরিয়েছে এবছরে একা দার্জিলিংয়েই সাড়ে সতের লক্ষ টাকার কমলালেবু চালানের মতো ফলন হয়েছে।'

—থামো, সে ছবিও ত কাগজে দেখেছি। কিন্তু কলকাতার বাজারে সে লেবু যখন এরোপ্লেন থেকে নামবে তখন যে কে সেই দশাই ত দাঁড়াবে। চারটে, ছটার বেশী পাবো না। ওই যে তোমাদের

কোল্ড স্টোরেজ নামক খাঁচা কল হয়েছে, তার মধ্যে লেবুগুলো ঠাণ্ডা মেজাজে ঘুমোবে, গরমকালে বাজারে বেরিয়ে আট আনা, দশ আনায় এক-একটি লেবু বিক্রী হবে। থাক বাবা, আমার নাগপুরীই বেঁচে থাক!

'—তা যা বলেছ। দিনকাল যে রকম পড়েছে তাতে কাগজের খবর থেকে মানুষের হালচাল বোঝা ভার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

ওঁর কথার সহজ সরল অর্থ করলে ঠকতে হয়, তাই সময় না দিয়ে একটু তলিয়ে বোঝাব জন্য বললাম—কেন, এ কথা কেন?

'—আর এই দেখ না, বোম্বাই সহরের লোকেরা সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা ভিক্ষে দেয়, সারা বছরে! ভাবো একবার ব্যাপারটা! এক-আধ পয়সা নয়, লাখ লাখ টাকা! ওখানকার মোট ভিখিরির সংখ্যা হ'ল পনের হাজার।'

—আহা, এমন আর কি বেশী পড়ল? মাথা পিছু বছরে আড়াইশ টাকাও নয়। তাহলে মাসে তোমার পঁচিশ টাকাও হয় না।

'—তেমনি আবার এক-এক ভিখিরি ফ্যামিলিতে চার-পাঁচ-ছয়জন মেম্বারও ত আছে!'

—তুমি এতও বকতে পারো! এক-একটা ফিল্ম ষ্টার কত রোজগার করে সেখানে, একবার সে হিসেবটা করো। আমাদের এখানকার পটলকুমার, কিম্বা উচ্ছে সুন্দরীদের মতো তাদের অবস্থা নয়।

'—তাই ত চান্স পেলেই এখান থেকে সব বম্বেতে চলে যাচ্ছে।'

—তোমার বোম্বাই বাক্‌তম্বি রেখে একবার পঞ্চু মিস্ত্রীরিকে খোঁজ করো দেখি, ঘরে তিনখানা চেয়ার—তার একটার পায়া নড়ছে, একটার হাতল ভাঙ্গা! সেদিন বিয়েব নেমন্তন্ন করতে এলেন রমেনবাবুর বোন, যা লজ্জায় পড়ে গেলাম, বেচারী মোটা মানুষ - হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

উনি বললেন—'তোমার সব সময় পার্সনাল খুটখাটি নিয়ে মাথা ঘামানো অভ্যেস। ওই জন্যেই বলেছি মেয়েছেলে। এদিকে যে

ভূপালে তের হাজার টন গম গায়েব হয়ে গেল, সে খবর কে রাখে ?

—ভূপাল-নেপাল নিয়ে আমি বসে থাকলে তোমাদের সংসার কে দেখবে ।

'—তা বলে, ন'মাসে সরকারী তৎপরতায় তের হাজার টন গম উইতে চেটে চমরে দেবে ?'

সরকারী তৎপরতা বলতে মনে পড়ে গেল, আজ ক'দিনই রেশনের দোকান থেকে লোক ফিরে আসছে—এ হপ্তার রেশন এখনো হাতে পাই নি। আজ সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে না জানালে আর রেশনই পাওয়া যাবে না। কি ব্যাপার ? না, ওই দোকান থেকে নাকি ব্ল্যাক-মার্কেটিং হয়েছিল রেশনের বরাদ্দ জিনিস,—ধরা পড়েছে। এখন রোজ-রোজই মামলার দিন পড়ছে—তাই দোকানও প্রায়ই বন্ধ থাকছে, আর আমরা রেশন পাচ্ছি না। তাড়া দিয়ে ওঁকেই পাঠালাম থলে আর কার্ড দিয়ে দোকানে।

* * * *

বিয়ের নেমন্তন্নর পালা আবার সুরু হয়েছে।

বালিগঞ্জের বড়লোক পাড়ার বিয়ে, লজ্জা করলেও উপায় নেই—যেতেই হ'ল। রমেনবাবুর ভাইঝির বিয়ে, বেচারী এক-গা গয়না আর কনে চন্নন পরে সোফার উপর বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় চোখ বুজে পড়েছিল। একশো দুই জ্বর উঠেছিল, এখন একে নেমেছে। আহা, এমন দিনে— ! খুব কষ্ট হচ্ছিল ওকে দেখে।

বিয়ে বসল রাত দশটার পর। আমাদের ও-পাড়ার মত উলুর ধুম নেই। চেঁচামেচি, হাঁক-ডাক, হৈ-হুল্লোড় নেই। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়া। তেতালার বারান্দায় শাঁখ বাজল, ছাদনাতলায় শুরু হ'ল অনুষ্ঠান।

ওদিকে একজন মাঝ বয়সী মহিলা, ওঁকে আমি চিনি—বিয়ে করেন নি, এদিকে লেখাপড়াতেও পণ্ডিত—অনেকগুলি বই লিখেছেন।

সমীহ করি ওঁকে। কিন্তু উনি যখন, ছোট্ট একটি মেয়েকে বললেন,—'যা, বরকর্তার কাছে কনকাঞ্জলির টাকা আদায় করতে হবে।' তখন অবাক হয়ে গেলাম। বিয়ের রাতে কনকাঞ্জলি? সে আবার কি রকমের প্রথা! কনকাঞ্জলির কথা জীবনে আমি ভুলবো না। ওরকম নিষ্ঠুর প্রথা আজও কেন চলিত আছে জানি না। মেয়ে তার বাবাকে একটি টাকা আর কিছু ধান দিয়ে এতাবৎকালের ভরণ-পোষণের ঋণ শোধ করে চলে যায় শ্বশুর বাড়ি! এর চেয়ে মর্মস্পর্শী প্রথা আর কিছু হয় না।

ছোট মেয়ে এসব ত বোঝে না! সে ছুটল কনকাঞ্জলির টাকা আদায়ের কাজে। আসলে ওটা হাত বাঁধার টাকা। এর পর আছে কাল সকালে শয্যাতুলুনী। এসব ত অতো লেখাপড়া জানা মহিলার জানা নেই। কালে কালে হয়তো লেখাপড়ার পাতার চাপে পড়ে আমাদের আচার-আচরণ সবই অর্থহীন কিম্বা সার্থকতা হারিয়ে ফেলবে।

পণপ্রথা উঠে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন ধরে অনেক মাতামাতি হয়েও আইন এখনো পাশ হ'ল না। একবার লোকসভা থেকে সংসদে পৌঁছলো বিল, এখন আবার শাস্তি বিধান ব্যাপারে মতানৈক্য হওয়ার ফলে যুক্ত অধিবেশনের জন্য আইন পাশ মুলতবী রইল।

আসলে যৌতুকের নামে যে উৎপীড়ন চলে তাতে স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে মেয়ের বাপ হাজার হাজার টাকা দিয়ে পাত্র কেনেন। না, কেনা মানে ত সম্পত্তির মতো কিছু একটা পাওয়া! এ ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, কন্যা দান করা হয় এবং (দানের মর্যাদাই বলো আর ঘুষই বলো) হাজার হাজার টাকা গয়না, কাপড়-জামা উপহার দেওয়া হয়। এ প্রথা আইন করে তুলে না দিলে আমরা সভ্যতার দাবী করতে পারি নে। যাঁরা এই আইনের সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থায় আপত্তি করছেন তাঁরা দেশের লোককে চেনেন নি। শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে, আইন হওয়া আর না হওয়া একই কথা। উৎপীড়ন চলতেই থাকবে।

এ পাড়ার চিন্নুর দিদি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবেন। বছর

কয়েক আগে বেচারী বিধবা হয়ে প্রথমে মুষড়ে পড়েছিলেন। নীলু কাকীমার পরামর্শে লেখাপড়া শুরু করলেন। নীলু কাকীমাও নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আই-এ পর্যন্ত পাশ করেছেন। চিনুর দিদির টেষ্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কেমন পরীক্ষা দিচ্ছেন খবর নেবার জন্যে আজ দুপুরে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

বাংলা পরীক্ষাটা খারাপ হয় নি। প্রশ্নপত্র দেখালেন। ভদ্রমহিলা বেশ পড়াশুনো করেন। একটা প্রশ্ন এসেছে 'যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই সুখ নেই—সর্বদা জয়ও হয় না।'—উক্তিটি কাহার? প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—এটা কার কথা?

দিদি বললেন, 'গান্ধারীর কথা, ওই প্রশ্নটার জবাব খুব ভাল লিখে ফেলেছি। কিন্তু কি কিপ্টে ওরা দ্যাখো, মাত্তর আট নম্বর আছে। ডাহা লোকসান। আমি আমার কুরুক্ষেত্র থেকে সোজা দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কথায় এসে পড়লাম। বুঝলে ভাই, সেদিনের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে— !'

—কি খবর দিদি?

'আরে বাবা, সে সাংঘাতিক কাণ্ড! তোমার মনে আছে কি, ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে আমেরিকানরা এ্যাটমবোমা ফেলেছিল?'

—তা আর মনে না থেকে পারে? অতবড় অমানুষিক কাণ্ড—

'হ্যাঁ! সেই বোমাতে হিরোশিমার সব শেষ হয়ে গিয়েছিল! তা সবাই জানে। একজন মার্কিণী পাইলট, নাম তার ইথারলি—সেই লোকটাই উড়োজাহাজ নিয়ে গিয়েছিল,—দুটো এ্যাটম্ বোমা কোন্খানে কি ভাবে ফেলতে হবে সেটা ইথারলিই দেখিয়ে দিয়েছিল। ওই বোমার দরুণ যে লাখ লাখ মানুষ মরেছে হাজার হাজার বাড়ি ঘর পুড়ে শেষ হয়ে গেছে—এই খবর যখন শুনল লোকটা তখন থেকে তার

মাথা গেল বিগড়ে। সর্বনাশের জন্য সে-ই দায়ী, এই চিন্তাটা শেষ পর্যন্ত তাকে পাগল করে দিল। তাকে পাগলা গারদে না রেখে উপায় রইল না। মাঝে মাঝে যখন ছাড়া পায় সে চুরি করে! চুরি করে ধরাও পড়ে। পুলিশের কাছে সে বলে কি জান? বলে যে,—আমি কেন চুরি করতে যাব! আমার সংসারে ত কোনো অভাব নেই।' সরকার থেকে মাসে মাসে আমাকে ২৩৭ ডলার (তার মানে হাজার টাকারও কিছু বেশি) মাসোহারা দেওয়া হচ্ছে। চুরি আমি করি নি। আসলে সে যে চুরি করে সেটা সে নিজেই টের পায় না। ১৯৪৭-এ ইথারলিকে ডিষ্টিংগুইশড ফ্লাইং ক্রশ-এর সম্মানসূচক খেতাব দিয়েছিল মার্কিণ সরকার। আর ১৯৫৬-তে এই লোকটাই টেক্সাসের ডাকঘর-গুলোয় ঢুকে চুরি করে করে বেড়াতে লাগল। মাথাখারাপ বলে তাকে প্রতিবারই খালাস দেওয়া হয়েছিল। বুঝে ভাখো' যুদ্ধের কি মহিমা—যারা হারল তাদের দুরবস্থার চরম ত হ'লই। কিন্তু যারা বিজয়ী হ'ল তাদেরও এমন কিছু লাভ হল কি?'

চিনু ওর ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, দুধ খাওয়াতে। ও বলল 'তা ঠিক। কিন্তু সেই লোকটার কি হল দিদি?'

'কার? ইথারলির!'

'হ্যাঁ!'

'পাগলাগারদ থেকে সে পালিয়েছে। তার পরই ত খবরটা কাগজে দিয়েছে, নইলে আর আমি জানবো কোথা থেকে। যাক গে আমার ভাই বড্ড লোকসান হয়ে গেল। তাটের মধ্যে ত আর আটই দেবে না, অথচ খুব খেটে লিখেছি আমি।'

চিনুর ছেলেটা কোল থেকে নেমেই বায়না ধরল 'আমায় মুখ দাও! মুখ দাও ও মাছি!'

দিদি তাড়াতাড়ি একখানা ছোট্ট আয়না এনে দিলেন 'এই নাও বাপী!'

আয়না নিয়ে ছেলেটা একমনে নিজের মুখখানা দেখল, চুমো খেল

রার রার! তারপর আমাদের দিকে হাসি হাসি চোখ তুলে বলল—'আদল্ কল্লুম!'

—কাকে?

'মুখকে!'

—কার মুখ?

'আমাল!'

ওর কথার বাঁধুনী দেখে না হেসে পারি নে!

আচ্ছা ভগবান যারা যুদ্ধ করে, যারা যুদ্ধ করায় তাদের কি এইসব মুখের কথা মনে পড়ে না! এতবড় পৃথিবীতে সবারই ত ঠাঁই হবার কথা, তবে কেন যুদ্ধ?

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে সরকারী বন্দোবস্তে পঁচাত্তর টাকায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচনাবলী কিনতে পাওয়া যাবে। খুব আনন্দ হয়েছিল খবরটা দেখে। ওঁকে বললাম—আমাদেরও একটা সেট কিনতে হবে। মাসে মাসে পনের টাকা কিস্তিতে, এমন সুযোগ আর ত পাওয়া যাবে না!

উনি বললেন, 'সুযোগটা আমাদের কপালে দুর্যোগ হতে বেশী সময় লাগে না। নিয়মাবলীটা দেখেচ? প্রথমে রচনাবলীর কর্তার নামে চিঠি দিতে হবে, তার মধ্যে নিজের নাম-ঠিকানা খাম ভরে' দিতে হবে। তারপর তাঁরা ছাপানো ফর্ম পাঠাবেন। সেই ফর্মে তোমার বাবার নাম, স্বামীর নাম, জন্ম সন তারিখ এই সব কৈফিয়ৎ বোঝাই ক'রে, সঙ্গে একটি পনের টাকার পোস্টাল অর্ডার বা কলকাতার কোনো ব্যাঙ্কের ওপর ড্রাফ্‌ট দিয়ে রেজেস্ট্রি করা। তোমার আবেদন মঞ্জুর হ'লে পরে মাসে মাসে পনের টাকা পাঠাও! যখন তোমার কাছে চিঠি আসবে যে, তোমার বই অমুক সরবরাহকারীকে পাঠানো হয়েছে, তখন তুমি সেই চিঠি নিয়ে চলে যাও সরবরাহকারীর দরবারে—বই

আনো ! দফায় দফায় কিছু কিছু ক'রে বই আনো ছ'মাস ধরে ! যেন দুনিয়াতে কারুর আর কোনও কাজ নেই ।'

— অত হাঙ্গামা না ক'রে সরাসরি বই-এর দোকানে দোকানে বই দিলেই ত হ'ত ।

'তাতে ক'রে অন্যায় মূল্যে বই বিক্রীর সম্ভাবনা ছিল !'

—এ ভারি অন্যায় ! বইওয়ালারা অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশী সৎ এরকম মনে করা অত্যন্ত আপত্তিকর। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা হিসেবে পঁচাত্তর টাকা দামটা খুব কম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের অবস্থার তুলনায় পঁচাত্তর টাকাটা অনেক টাকা ! এতে হবে কি জানো ? যারা সত্যিকারের আগ্রহশীল, তাদের চেয়ে বেশী সুযোগ পাবেন তাঁরা যাঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তি রয়েছে। সরকারী বন্দোবস্তের ভেতরে ফ্যাঁক্ড়ার শতেক ফিরিস্তি। সত্যি !

উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, 'এ ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রকাশক-সভা সরকারের শিক্ষা দপ্তরে চিঠিও লিখেছিলেন। আমি জানি। কেন না, প্রত্যেক বইওয়ালারই কিছু কিছু বাঁধা খদ্দের আছে, তাদের তাগাদায় পড়ে বইওয়ালারা প্রকাশক সভার কাছে দরবার করে, লাভের জন্য তত নয় যতটা খরিদ্দার বজায় রাখার জন্য---! প্রকাশক-সভা সরকারকে যে চিঠি দিয়েছে তার নাকি জবাবটুকুও দেওয়া দরকার মনে করেন নি সরকার। বোঝো, এঁদের হাতে রবীন্দ্রনাথের শত-বার্ষিকী পালনের পবিত্র দায়িত্ব-!'

আজ সোমবার সকালে খবরের কাগজ খুলেই দেখি যে, গত কাল সন্ধ্যায় উল্টোডাঙ্গা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একখানা ট্রেণের পিছনে ধাক্কা মেরেছে আর একখানা ট্রেণ, তাতে আটাশজন লোক জখম হয়েছে। তার মধ্যে দশজন গুরুতর ভাবে আহত। আশ্চর্য ব্যাপার ! দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেণকেও এরা রেহাই দেয় না ! এর বেশী আর কি বলব ভগবান !

বেলার শ্বশুরের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। বয়স ত খুব বেশি হয় নি ভদ্রলোকের। বেলার বর বেচারী খুব চিন্তায় পড়েছে। কাল আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। যাওয়া মানে, রাতের কাজকর্ম চুকিয়ে রাত দশটার পর। যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করছিলেন তিনি। আমার স্বামীকে দেখে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'বাবা, গেলেই হয়। কাল থেকে ঘুম হচ্ছে না। আর এই বায়ু! বায়ুর উপদ্রবে জ্বলে মরছি— এ যা অসহ্য যন্ত্রণা তার চেয়ে মৃত্যু ভালো!'

সন্ধ্যের পর থেকে যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে। ডাক্তার' যিনি দেখছিলেন তিনি হঠাৎ বাইরে চলে গিয়েছেন। পাড়ার যিনি ভালো ডাক্তার তিনিও বেরিয়ে গেছেন। এই খবর নিয়ে ফিরলেন বেলার

রাত এগারোটার পর ডাক্তার এলেন, দেখেশুনে প্রেসকৃপশন লিখে দিয়ে বলে গেলেন, 'ইমিডিয়েট রিলিফের জন্যে যে ইনজেক্‌শনটা রইল সেটা আজ রাতেই দেওয়া হয় যেন!'

ডাক্তার ত চলে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু বেলার স্বামী এবং আমার উনিও গেলেন।

গেলেন ত গেলেনই। মনে মনে ভেবে মরি, রাত বারোটা বেজে গেল। ওদিকে ছেলেমেয়েগুলো একা রয়েছে। এদিকে রোগীর কাত্‌রাণী।

ওঁরা ফিরলেন সাড়ে বারোটার সময়। শ্যামবাজারে একটাও ওষুধের দোকান খোলা নেই। সেই শোভাবাজারে যদি বা একটা দোকান খোলা পাওয়া গেল ত ওষুধ মিলল না। আবার ঘোরো— ঘুরতে ঘুরতে আর একটা দোকান পাওয়া গেল খোলা, সেখান থেকে ইনজেক্‌শনটা ভাগ্যে পাওয়া গেছে। আজকাল নাকি যেসব ওষুধের বিক্রী কম সেগুলো সবাই রাখে না—কারণ, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ইনজেক্‌শন বিক্রী না হলে পাইকাররা অবিক্রীত ওষুধ ফেরত নেয় না,

দোকানদারের লোকসান হয় তাতে—অতএব চালু ওষুধগুলোই তারা স্টকে রাখে।

কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মানুষের জীবনের কথা আমরা বুঝি, আজকাল হিসেবের মধ্যে ধরার কথা ভুলে বসে আছি। এই কলকাতা শহর! এশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর কলকাতায় রাতে ওষুধের দোকান খোলা থাকে না!

উনি বাড়ি ফিরতে ফিরতে বললেন, 'হ্যাগো, আমাদের দেশের অবস্থাটা দিন দিন উন্নতির চেয়ে অবনতির দিকেই চলেছে।'

—কিন্তু কি উপায় বলো। দোকানদারের ত লাভলোকসানের কথা ভাবতে হবে!

'হ্যাঁ, সে কথা যেমন ঠিক, তেমনি মানুষের জীবনের মূল্যটাও ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! তা যদি না ভাবো তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়ে কি লাভ দর্শাচ্ছে, বলো! আমার ত মনে হয় এ শহরের প্রত্যেক অঞ্চলে এমন ওষুধের দোকান অন্ততঃ একটা ক'রে থাকা উচিত যেখানে সব রকমের ওষুধ-ইনজেক্‌শন পাওয়া যাবে! সে দোকান যদি 'প্রাইভেট' ব্যক্তির দ্বারা চালালে লোকসানের ভয় থাকে তাহলে সমবায় প্রথায় চলুক! কর্পোরেশন বা সরকার থেকে যদি এরকম উদ্যোগ হয় তাহলেই লোকসানটা কারুর গায়ে লাগে না। আর সত্যি কথা, বুকে হাত দিয়ে হলফ ক'রে কোনো ওষুধ-ওয়ালা বলতে পারবে না যে মোটের মাথায় সবটা জড়িয়ে কারবারে তার লাভ হচ্ছে না। লোভ বুঝলে! ষোল আনার ওপর আঠারো আনা লাভের লোভেই মানুষ আসলের বদলে নকল ওষুধ চালাতে চায় যাদের অতটা দুঃসাহস নেই তারা কম চালু ওষুধ স্টকে না রেখে মুনাফার অঙ্ক মোটামুটিভাবে বজায় রাখতে চায়। বেশ ত তার দরকার নেই—এদেশের উন্নয়ন নিয়ে যখন এত মাথা ঘামানো হচ্ছে, যখন দিকে দিকে সমবায় কারবারের ছড়াছড়ি যাচ্ছে তখন গোটা চার-পাঁচ 'ডে এ্যাণ্ড নাইট সার্ভিসের' ডাক্তারখানা খুলে দিক সরকার।'

আমরা যখন পাড়ায় পৌছলাম তখন পাহারাওয়ালাটা দেখি টহল দিচ্ছে। বাড়ির সামনাসামনি দেখা হল ডিফেন্স পার্টির ছেলেদের সঙ্গে।

ওঁর সঙ্গে আবার বেরুতে হয়েছিল, আবার বিয়ের নেমন্তন্ন—তবে রক্ষে এই যে, বড়লোকের বাড়ি নয়, একখানা বই উপহার দিয়েই লৌকিকতা বজায় রাখা গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাই নি। ফিরতি পথে চোখ দুটো জ্বালা করছে, ধোঁয়া আর কুয়াশায় মিশে বাতাস এমন ভারী হয়েছে যে, বিশ হাত দূরের মানুষকে ঠাহর করা যায় না। একটা চৌমাথার মোড়ে আমাদের বাসখানা থামল। উনি বললেন—'চলো, একবার ঝুমুরদের বাড়িটা ঘুরে যাই, রাত ত বেশি হয় নি।'

এসব ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতে আমার ভরসা হয় না। আপত্তি করলে পরে বাড়ি ফিরে বকুনী খেতে হবে। উনি স্রেফ বলে বসবেন—'অতগুলো লোকের সামনে আমাকে অপমান করতে তোমার বাধলো না?'

অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে ওঁর পিছু পিছু নামলাম। একটু চোখ বুলিয়ে আন্দাজ হ'ল এটা বিবেকানন্দ রোড আর চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর মোড়। ঝুমুরদের বাড়িটা রাস্তার ওপারে গলির ভেতর,:হঠাৎ সেখানে এই অসময়ে কি জন্যে যাচ্ছি? প্রশ্নটা মনে উঠলেও মুখ ফুটে বলি নে—সামনে তাকিয়ে রাস্তার ওপারটা নজরে আবছা লাগছে। এসব জায়গায় পথ পেরুতে দিনের বেলাতেই বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, তা এখন ত' রাত। তবে ভরসা এই যে, উনি সঙ্গে রয়েছেন।

একটু এগিয়ে দেখলাম, একটি লোক হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, তার পাশে পাশে একটি পুলিশ তাকে আগলে নিয়ে চলেছে। এতকাল পুলিশ দেখছি কিন্তু এমন আনন্দ কখনো হয় নি পুলিশের কাজ দেখে।

ঝুমুরদের বাড়ির প্রায় অর্ধেক মানুষ বাড়ি নেই, থিয়েটার দেখতে গেছে। তবে ওঁর বন্ধু ঝুমুরের কাকা, তিনি চোখে চশমা এঁটে পড়াশুনো করছিলেন।

ওঁকে দেখে দরাজ গলায় বললেন, 'এসো এসো সরকারের প্রতিনিধি এসো। আহা আজ আমার বড় দুর্ভাগ্য যে, তোমার মুখ দেখতে হ'ল!'

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি কতকটা মাপ-চাওয়া ভঙ্গীতে বললেন, 'বাসবী বৌঠান কিছু মনে করবেন না! আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। মানে, সরকারী লোকের ঘর করতে হয় আপনাকে এ কি কম আফসোসের কথা!'

ভদ্রলোকের কথার ধরনই এই। সব সময় হেঁয়ালীর-ঢঙে কথা বলেন।

উনি বললেন দ্যাখো, 'এবার মিলিয়ে পেলে ত?'

—কি?

'আরে, অনীতা। তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে, পবতো বহ্নিমান। তোমার নেতাজী বিয়ে করেছিলেন। তার মানে '

আমার স্বামী তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিলেন 'অর্থাৎ আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোনই প্রভেদ নাই? তোমাদের এক বিশ্রী কুসংস্কার আছে, মহাপুরুষ হতে গেলে তাকে আমরণ ব্রহ্মচারী থাকতে হবে—আর বিয়ে করলেই মানুষ সাধারণ হয়ে গেল! নন্‌সেন্স। আমাদের দেশের পুরনো ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবে, ঋষিদের আশ্রমেও মেয়েদের স্থান ছিল। আমরা মানুষকে তার কীর্তি দিয়ে বিচার করবো। সুভাষচন্দ্র বিয়ে না করলে, আজ তাঁর মেয়ে অনীতা এদেশে আসতো না। সে না এলে, দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবী যে জীবিত রয়েছেন সে কথা দেশের লোক টেরও পেত না।'

ওই আর এক আশ্চর্য মানুষ বাসন্তী দেবী, দেশ স্বাধীন হবার পর ওঁকে গভর্ণরের পদ দিতে চেয়েছিল কংগ্রেস, তা উনি নেন্ নি।'

আমি এতক্ষণ ওঁদের কথা শুনছিলাম, ঝুমুর এসে আমায় ডাকল। মনমরা মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। বললাম—কি করছ ?

'আবার সামনের বছরের জন্যে তৈরী হচ্ছি।'

এবার ওর এম-এ দেবার কথা ছিল। ড্রপ করেছে। ইচ্ছে ক'রে পরীক্ষা দেয় নি তা নয়—পড়াশুনো করবার সময়ও বা কতটুকু পায় বেচারী। সকালে একটা স্কুলে চাকরী করে। দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করে। বাড়িতে ঘরকন্নার কাজও কিছু করতে হয়। আর যেটুকু অবসর পায় তাও কাজে লাগাতে পারে না, তিনখানা ত মোট ঘর, লোকজন আসাযাওয়া লেগেই রয়েছে। তবু এর মধ্যেই পড়াশুনো যেটুকু পারে করে। যে ছেলেটির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা, সে এখন বিলেতে পড়ছে। ঝুমুরের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এম-এ পাশ মেয়ে ছাড়া বৌ করবেন না। যেন আপিসের চাকরী!

দু-চার কথার পর ঝুমুর বলল 'আপনিও কি বম্বে যাবেন নাকি কাকীমা ?'

—কেন ? হঠাৎ বম্বে যাবো কিনা জিগ্যেস করছ কেন ?

হাসল ঝুমুর। 'কাকামণির কাছে এখন যারা আসছেন সবাই ত সাহিত্য সম্মেলনের যাত্রী! জানেন কাকীমা, আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল যাই, কিন্তু কপাল মন্দ, কাকাবাবু বললেন এবার খুব ভিড় হচ্ছে।'

—সাহিত্য সম্মেলনে এত কিসের ভিড় হতে পারে ?

'—মানে, কাকাবাবু ত এত বছর সম্মেলন করছেন, তা উনি নিজে সাহিত্যের কতটুকু সেবা করেছেন সে আপনারা সবাই জানেন। এক পিঠের ট্রেণ ভাড়ায় আসা-যাওয়া হয়, সস্তায় থাকা-খাওয়া—মানে, সাহিত্যের নামে ভ্রমণের এমন সুযোগ সহজে জোটে না। আমি একবার গিয়ে দেখেছি, সম্মেলনের অধিবেশনে প্রায় অর্ধেক ডেলিগেট

গরহাজির—! অবিশ্যি এবারের কথা আলাদা। বিদেশ থেকে সব নামকরা সাহিত্যিক আসছেন, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর উদ্বোধন হচ্ছে! তা আপনি যাচ্ছেন না?'

'—তোমাদের মত কি আমি চল বললেই চলতে পারি? সুপ্রভাতের খবরটবর পাও? কেমন আছে?'

ভাবী স্বামীর নামে ঝুমুর লজ্জা পেল। সামলে নিয়ে বলল 'হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি, খবর ভালো।'

হঠাৎ ওঁর ডাক শুনে চমকে উঠলাম। ঝুমুরের কাকা ওঁর পিছু পিছু এ ঘরে এলেন, তাঁর কথায় বক্তৃতার আবেগ, তিনি বলছেন—'যা-ই বলো, তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী সব জেনেশুনে এতদিন বেরুবাড়ীর সমস্যাটা বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে চেপে গিয়েছিলেন। এখন বেকায়দায় পড়ে উল্টো সুরে গাইলে চলবে কেন! দিন দিন যা দাঁড়াচ্ছে তাতে বাঙালীর সর্বনাশ করবে এই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসী আঁতাত।'

আমার স্বামীকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে, তিনি শুধু বললেন—'তা তুমি কি করতে বলো?'

'—বলি যে, এখনো সময় থাকতে সরকারী চাকরী ছাড়ো। যেমন ছেড়েছেন জে, এন, ব্যানার্জি। হাঁ বুকের পাটা আছে লোকটার, স্পষ্ট বলে দিয়েছে সরকারী চাকরী করতে গেলে বিবেক-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে—অতএব আমি ইস্তফা দিলাম। চাকরী শুধু তোমাকেই ছাড়তে বলছি না, বিধান রায় থেকে শুরু করে তাবৎ বাঙালীর এখন সোনার শেকল সম শোভার মোহ ছেড়ে চলে আসা উচিত। তা তুমি রাগই করো আর যাই করো এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। আর তা যদি না পারা যায়, তাহলে চলো আমরা আস্ত বাংলাদেশকেই পাকিস্থানের হাতে তুলে দিই—ল্যাঠা চুকে যাক। বাংলাদেশ গোটা-গুটিভাবে পাকিস্থানে গেলে আর উদ্বাস্তু সমস্যার ঝ্যাপা থাকে না।'

ঝুমুর বলল, 'কাকামণি, দশটা বেজে গেছে!'

ভদ্রলোক হঠাৎ চুপসে গেলেন—'এ্যাঃ বলিস কি? আমার সাড়ে ন'টার জল। দশটার পর তুমি খবর দিচ্ছ; কেন এতক্ষণ কি ঘুমুচ্ছিলে!'

আমরা এই অবসরে পথে নেমে পড়েছি। ঝুমুরের কাকা এক বিচিত্র মানুষ। মুখে তাঁর ছোট কথা কখনো শুনতে পাবে না, কিন্তু নিজের নিয়মের পান থেকে চুণ খসলেই অনর্থ বাধিয়ে তুলতে ওঁর জুড়ি নেই। ওঁর জল খাওয়া, পান খাওয়া, ঘুমোনো, হাইতোলা সব কিছুরই বাঁধা সময় আছে। এই সাড়ে নটার জলের জন্যে এখন ঝুমুর বেচারীর কি নাকাল হতে হবে কে জানে?

শীতের বেলা এত চট্ ক'রে ফুরিয়ে যায় যে, হাত অবসরের কোনো ফুরসুৎ মেলা শক্ত। তাই ওঁর জন্যে ক্রেপ-উলের যে সোয়েটারটা ধরেছি সেটা এগোতে চাচ্ছে না। আজ ইতুপূজোর দৌলতে টানা-সাব্‌টা খিচুড়ি ক'রে রান্নার ব্যাপারটা শর্ট-কাটে সেরে খানিকটা সময় বার ক'রে নিয়েছি বোনার জন্যে। যেমন করে পারি আজ ওঁর গায়ে সোয়েটারটা চড়িয়ে দেবো!

একটানা কাঁটা ঘুরিয়ে কাজ করেই বোধ হয় মাথাটা ধরল। তা ধরুক,—কাজটা ত তুলে ফেলেছি। ওঁকে টের পেতে না দিলেই হ'ল যে মাথা ধরেছে।

কর্তা বাড়ি ফিরলেন থম্‌থমে মুখ নিয়ে, কথাই বলেন না! নণ্টু-বোণ্টু বাপের কাছে যখন বলল—'এবারের টেস্টে পি, রায়কে বসিয়ে দিয়েছেন।' তখন ধমক দিলেন—'তোমাদের পড়াশুনো নেই!'

চায়ের পর বললাম—গ্যাখো তো সোয়েটারটা ঠিক হ'ল কি না?

অবাক হলেন। গায়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—'কেমন দেখাচ্ছে?'

আমি বললাম বা রে, আমি কি করে বলব? তুমি বলো—

'পোশাকের বেলায় পর-রুচি। আমি ত দেখব না, তোমাদের চোখে দ্রষ্টব্য হবো।'

—কেন আয়নার সামনে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে।

'আহা, তুমি আমার বিয়ে-করা বৌ হয়ে আয়নার কাজটুকুও করতে পারবে না! আর পশ্চ-পশ্চ এলেন রায়, মানবেন্দ্র রায়ের জীবনকালে বরাবর পাশে থেকে সব কাজে সহায়তা করেছেন। তারও পরে, এম, এন, রায় মারা যাবার পরেও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন, তা ছাড়া রায়ের অসমাপ্ত কাজগুলো যতখানি পারেন করছিলেন, আর বিশ্ব-তুনিয়াতে সারা জীবন ধরে এম-এন-রায় যতো লিখেছেন-বলেছেন সেগুলো গ্রন্থনার কাজে ব্রতী হয়ে দেরাতুনের এক কোণে সাধনার কাল কাটাচ্ছিলেন।'

এই পর্যন্ত বললেন উনি যেন আমাকে নয়, নিজেকেই। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'জানো কাল রাত্রে এলেন রায়কে খুন করেছে। কে করল, কেন করল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

—এলেন রায়কে খুন? এ যে ভাবতে পারা যায় না। হ্যাঁ গো—

উনি সোয়েটার খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন—'এ এমন একটা যুগ যার দিশে-বিশে হদিশ করা অসম্ভব। আজ তুপুরে আপিসে বসেই খবর পেলাম, একজন এসেছিলেন এলেনের প্রথম জীবন সম্পর্কে খোঁজ নিতে! তা আমাদের ওখানে কেউ বলতে পারল না। আমরা ওঁকে পাইকপাড়ার ঘরোয়া আসরে দেখেছি! দেখে ভালো লেগেছে।'

—সে ত আমিও দেখেছি। আমাদের মতো শাড়ী পরতেন। তবে বাংলা বলতে পারতেন না ব'লে আলাপ তেমন হয় নি। শ্রদ্ধা হয়েছে চেহারা দেখে।

'কাজ! এলেন ছিলেন কাজের মানুষ। বড় মানুষী একটুও ছিল না। আর এদেশের সঙ্গে নিজেকে এমন মানিয়ে নিয়েছিলেন যে, বিদেশী বলে ওকে দূরে সরিয়ে রাখার দরকারই হ'ত না। খবরটা পেয়ে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার শুনলাম কাউন্সিলের ভেতরে বুড়ো বুড়ো লোকগুলো মারামারি করেছে। যারা মারপিট করেছে তাদের মধ্যে জানো, তুজন দস্তুরমতো মিনিস্টারও রয়েছেন। এতদিন কর্পোরেশনের সভ্যদের অসভ্যতা করতে দেখা

গিয়েছে, কিন্তু যাকে পার্লামেন্টের মতো মর্যাদা দেয় দেশের লোক সেই, সেই লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ন্যায়দণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে হাতাহাতি ঘুঁষোঘুষি ক'রে ন্যায়ের এত বড় অবমাননা— এ যে ধারণাই করা যায় না। যাঁরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পবিত্র দায়িত্ব বহন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব'লে বিশ্বাস, তাঁরাই শেষে বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত দেখাচ্ছেন —দেশের দশা কি দাঁড়াবে এরপর ?'

—কেন, এরকমটা হচ্ছে ?

'কেন ? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে ! আজকের গোলমাল অবিশ্যি বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিল নিয়ে। যা দেখছি, এর পর সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু হয়ে যাবে। ওদিকে হকারদের মিছিল বেরিয়েছে। তাদের উৎখাত করলে তারা কোথায় যাবে, কি উপায়ে তাদের সংসার চলবে ? এ প্রশ্নের মীমাংসা করুক সরকার আগে—তারপর ত উচ্ছেদ ? বিকল্প ব্যবস্থা না কোরে এভাবে এতগুলো মানুষের ভরসায় ঘা মারা এ তো স্বদেশী সরকারের যোগ্য কাজ নয় ! আসলে সমস্যা একটা নয় অনেক—আর তার সমাধানের কোনো শর্টকাট নেই। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু—সবগুলো সমস্যার সমষ্টি হ'ল আজকের খণ্ডিত বাংলা। কেন্দ্রের গদী থেকে এতগুলো সমস্যাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই আটচল্লিশটা জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরপ্রদেশের আধিপত্যময় কেন্দ্রীয় সরকার কোণঠাসা বাংলার দশা বুঝবে না। আরো টুকরো ক'রে বাংলার মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করতে তাই তার দ্বিধা নেই—আর আমরা এখানে গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি একটু তলিয়ে দেখচি না কোন্ ভূত আমাদের ঘাড়ে ভর করেছে।' রেডিয়োতে খবর বলার গলাবাজিতে ওঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল।

* * * *

আজ শনিবার ১৭ই ডিসেম্বর, খবরের কাগজে লিখছে, আগামী কাল কলকাতায় 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র সেন মশাই-এর সভাপতিত্বে পরিবার পরিকল্পনা দিবস পালনের অনুষ্ঠান

হবে। হাসি পাচ্ছে খবরটা দেখে, মনে পড়ছে বাংলা প্রবাদগুলো—'না বিইয়ে কানাই-এর মা' 'আঁটকুড়ির পো' এসব তাহলে বাজে গেঁয়ো কথা নয়!

আর উনি বললেন 'জানো, বাংলা দেশের মন্ত্রীদের কাউন্সিলে মারামারি করার খবর আমেরিকাতে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। নইলে প্রেসিডেন্ট কেনেডি একজন নিগ্রোকে ক্যাবিনেট র‍্যাঙ্কে বহাল করতে চাইলেন আর নিগ্রো ভদ্রলোক তাতে রাজী হ'লেন না! নির্ঘাত ওই উইলিয়াম ডসল নামক চুয়াত্তর বছরের নিগ্রো ধরে নিয়েছেন যে, ওঁদের ওখানেও মারামারির ঢেউ লাগবে।'

অবাক হয়ে বললাম—তোমার যেমন কথা! আমেরিকা খামোকা—বাংলাদেশের অনুকরণ করতে যাবে কেন?

'—আরে তা বুঝি জানো না, ওদেশের মেয়েরা আজকাল শাড়ী পরছে শখ ক'রে, বলে যে আরো শাড়ী চালান গেলে ভালো হয়। তাহলে শাড়ীর মতো সব কিছুই ত যেতে পারে!'

কলকাতায় বড়দিন আর আসে না, এলেও সে থাকে ফিরিঙ্গি পাড়াতে। তবে বড়দিনের ছুটি এখনো একটা দিন পাওয়া যায়, মানে বাড়ীতে স্বামীদের হাজির থাকতে দেখা যায়—এইটুকুই কি কম লাভ! এখন ত আমাদের কাছে নগদ লাভ-লোকসানের হিসেবে এসে দাঁড়িয়েছে। ইহকাল আর পরকাল বলে আলাদা আর কিছু আছে ব'লে টেরই পাচ্ছি নে। ভগবান, তুমি মানুষকে সত্যিই ভুলে গেছ। তোমার জায়গা এখন বেদখল। এখন আমাদের কাছে ঠাকুর দেবতার বদলে ঠাঁই নিয়েছে রুপোলী পর্দার চিত্র তারকারা—আকাশের তারা এখন মাটিতে নেমেছে। শুধু মাটিতেই নয়, তারা এখন ঘরে ঘরে ঘোরা-ফেরা করছে। যেদিকে তাকাই উঠতি বয়সের মেয়েরা এক-এক-জন তারকার নকল নমুনা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা ঘর থেকে বাইরেটা বেশী পছন্দ করে। বাইরের টানে ওরা সাহিত্য সম্মেলন

করবার জন্য বোম্বাই দৌড়াচ্ছে। সেখানে গেলে স্বর্গের সামিল রাজ্যে হাজির হওয়া যায়—সেখান থেকে বোম্বাই ফ্যাশান এনে কলকাতার 'গাঁইয়া'দের তাক লাগানো যাবে। আমি চোখ বুঁজে টের পাচ্ছি, সামনের মাসে নতুন বছর পড়তে না পড়তে আমাদের আশ-পাশে নার্গিস, নিম্মিরা ছেলেদের মাথা বিগ্ড়ে দিতে শুরু করবে। আমার মেয়েরাও একদিন বড় হবে, রোজই একটু একটু করে আমাদের লক্ষ্যের অগোচরে (চোখের সামনে থেকেও) বড় হচ্ছে। ক্ষমাকে নিয়ে ততো ভাবনা নেই। মুস্কিল হবে রমাকে নিয়ে, ওর মনটা বড় চঞ্চল।

দ্যাখো কাণ্ড, একেই বলে মেয়েছেলের মন। ভেবেছিলাম যে, বড়দিনের কথা নিয়ে তোমায় কিছু বলব, কিন্তু খেই হারিয়ে বসে আছি। অবিশ্যি বড়লোকেরই 'বড়দিন', আমাদের কাছে কোনো 'বড়' কিছু আসে না। ছোটদের ভাবনা ছোট ছোট। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের মানুষের ত ছোট ছাড়া বেড়ে ওঠার সুযোগই ঘুচে যাচ্ছে দিনে দিনে। দেশ স্বাধীন হ'ল ত বাংলাদেশের আয়তন ছোট হ'ল, অন্য রাজ্যের লোকেরা কেউ বা আমাদের মেরে তাড়াচ্ছে, কেউ বা পশ্চিমবাংলাকে কেটে-ছেঁটে ছোট ক'রে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগছে।

আমাদের আবার বড়দিন, আমাদের আবার বৃহৎ স্বপন।

বছর প্রায় ঘুরতে চলল, বাতাসে শীতের কামড় বেশ জোর ধরেছে, টালা পার্কে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে—সে আলোর রোশনাই দেখে কে বলবে যে বাংলাদেশের আজ চরম দুর্দিন! কেউ কি মনে রেখেছে যে, গত মঙ্গলবারে পশ্চিমবাংলার বেরুবাড়ী পাকিস্থানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়ে গেছে! আজ শুক্রবার, তিন দিন আগের কথা ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। মিছামিছি নেহেরুজী গোলমালের ভয়ে শান্তিনিকেতনের সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগ দিলেন না। ভয় পাওয়ার কি ছিল? কেন না হরতালের দিনে একমাত্র-রাজনীতি-করিয়ে নেতা মাথা ছাড়া বাকী সব জনসাধারণ

ছুটির দিনের তামাসা লুটছে। ছুটির চেয়ে মজাদার হরতাল—রাস্তায় ক্রিকেট খেলা চলে, ক্যারম তাস সব কিছুই অবাধে রাজপথ অধিকার করে। এই ত প্রতিবাদের চেহারা। সেদিন সকালে আমাদের পাড়ায় জিগির দিয়ে গেল একদল লোক, তারা বলল,—'বেরুবাড়ী খয়রাত করা চলবে না, চলবে না।' আর তার পরই বলল, 'কম্যুনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ'। আসল কথা এই সুযোগে পার্টির নাম সংকীর্তন করা। সেই কাজটুকু হাসিল করা চাই। আগামী নির্বাচনী যুদ্ধকাল আসন্ন—এখন নাম প্রচারের ব্রতে তৎপর না হলে…?

যাক গে, আমার ওসব বড় বড় ব্যাপারে নাক গলানোর দরকার কি! তবে গতিক যা দেখছি তাতে শুধু টালা পার্কেই নয় সারা দেশেই সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, আলোর মালা জ্বালানো হয়েছে, সেই ব্যাণ্ডের বাজনায় দেশের কেউ কারুর কথা শুনতে পাচ্ছে না,—সার্কাস দেখাচ্ছেন নেহেরুজী! তাঁর পাশে আরও বাচ্চা-বাচ্চা খেলোয়াড় পন্থানুসরণ করছেন নেতার। রেবা রক্ষিতের চেয়ে বিধানবাবুর কসরৎ কিছু কম নয়। তুমি সেই সার্কাস দেখবে ভগবান? চলে এস।

তোমাকে ডাকছি এইজন্যে যে, একবার হাতের কাছে পেলে আমার এই এক বছরের জমানো সবগুলো চিঠি শুনিয়ে তবে রেহাই দিতাম। কিন্তু জানি, তুমিও নেহেরুর মতো কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দিতে নারাজ।

যা কিছু সৎ, যা কিছু মহৎ সব—সব আমাদের নাগাল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই যে রবীন্দ্র শত বার্ষিকীর বিরাট পরিকল্পনা, তাও বুঝি গরীবের ছেলের অন্নপ্রাশনের মতো কৃশকর্মে পর্যবসিত হয়ে বসে। টাকা নেই। তিরিশ লাখের জায়গায় মাত্র তিন লাখ টাকা বিশ্বভারতীর সম্বল—কি দিয়ে কি হবে কে জানে? অথচ দ্যাখো এলিজাবেথের ভারত-দর্শন বাবদ কলকাতার পথঘাট মেরামত, লোহার রেলিং বসানো এ সব বাবদে কতো টাকা খরচ হচ্ছে। বাইরের লোকের কাছে নাম কেনার হ্যাংলামো আজও আমাদের গেল না। ওপরে চেকন-চাকন ভেতরে খড়ের গোঁজা! এই গোঁজা মিলে গোটা দেশের সরকারী,

বে-সরকারী সবাই উন্মত্ত। হাইকোর্টের রায় বেরুলো, ফুটপাতে হকারদের বসবার হক নেই। অতএব হকারদের হটাও। কিন্তু সে বেচারীরা যায় কোথায়। কেন, দণ্ডকারণ্যে। দণ্ডকারণ্যে তাদের পাঠানো অবিশ্যি খুব যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। কিন্তু তারা তা যাবে না। যদি বা তারা যেত, যেতে দেবে না বামপন্থী রাজনীতিরা,—দরকার পড়লে উদ্বাস্তুদের ২।১ টাকা বকশিস দিলেই মিছিলে সামিল হবার জন্য হাজির পাওয়া যায়। উদ্বাস্তুরা চলে গেলে পরে বিরোধী দলের লোক দেখানো আন্দোলন জনসমাবেশ ঘটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে যে! অতএব দণ্ডকারণ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য! অথচ এইটুকু কাটা-ছেঁড়া বাংলা দেশে কত কাল গুতোগুঁতি করে সবাই আধমরা হয়ে বাঁচবে কে জানে!

আর ভাবতে পারিনে।

অবিশ্যি আমার ভাবনারই বা কি দাম! সেইজন্য বারবার তোমার দরবারে আর্জি করেছি, তুমি দ্যাখো, তুমি শুভ-বুদ্ধির উদ্বোধন করো ভগবান। তা তুমি গরীব মেয়েমানুষদের কথায় কান দিতে নারাজ! বেশ তবে তাই হোক। তোমাকে এর আগেও একবার চিঠি লেখা বন্ধ করেছিলাম—কিন্তু থাকতে পারি নি, ভুলে ভেবেছিলাম যে তুমি আছো। বার বার আর ভুল করব না, তোমাকে আজ এই শেষ চিঠি লিখতে বসেছি।

শেষ চিঠি বা সবচেয়ে বড় উপহার তোমার জন্য ভগবান! সেদিন একটি লোককে লোহার রড চুরির অপরাধে আদালতে পুলিশ যখন হাজির করল তখন সে অম্লান বদনে স্বীকার করল—হ্যাঁ সে চুরি করেছে এবং জেলে যাবার জন্যই সে ইচ্ছে করে চুরি করেছে। কেন? না সে এর আগেও জেল খেটেছে। মুক্তি পেয়ে জেলের বাইরে এসে সে দেখল—দাগী আসামীকে কেউ কাজ দিতে নারাজ। এদিকে শীতে মাথা গোঁজার মতো ঠাঁইটুকুও তার নেই। শরীর আগে থেকেই জখম ছিল। রোগগ্রস্ত দেহ, অনাহার, আশ্রয়সম্বল শূন্য অবস্থায় মুক্তির চেয়ে জেলখানার আরাম তার কাছে অনেক বেশী কাম্য। তাছাড়া জেল-

থানার ডাক্তারবাবু তাকে জেলে গেলে চিকিৎসা ক'রে সারিয়ে তুলবেন ভরসা দিয়েছেন! অতএব জেলে ঢোকার সহজ উপায় হিসেবে লোকটি চুরি করেছে। ভগবান তুমি বুঝি ভাবছো যে এটা আমার বানানো কাহিনী? মোটেই তা নয়। আমিও ছোটবেলায় 'লা'মিজারেবল-এর পুরোহিত ও চোরের কাহিনীকে বানানো গল্প বলে ভুল করেছিলাম। সেখানে অবিশ্যি সেই দয়ালু পুরোহিত চোরকে বাতিদানটা উপহার দিয়েছেন ব'লে পুলিসের সামনে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। সে মিথ্যা সত্যের চেয়েও মহৎ। একটি মানুষকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই মিথ্যে বলতে ধর্মযাজকের মুখে আটকায়নি। কিন্তু এখানে এই অভিশপ্ত বাংলাদেশে অপরাধী হয় মানুষ, কেন না সৎ পথে থাকলে তার ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ, দুর্দশা - তাই বুঝি সততাকে বর্জন করে অসত্যের দিকে বেগে ধেয়ে চলে বাঁচবার জন্য, প্রাণে বাঁচবার কি বিচিত্র পন্থা? তোমাকে হাজার হাজার বার নমস্কার করি ভগবান—আর তোমায় ডেকে বিড়ম্বিত করব না। সময়ের তার বিবেকের কামড়ে নিজেকে এবং তোমাকে জর্জরিত করা এখানেই শেষ হোক!